ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে

উপরি-উক্ত তিন ধরনের রচনার সংখ্যা ইংরাজীতে প্রচুর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অ্যানি বেশান্ত, মহেন্দ্রপ্রতাপ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা ছাড়াও জাতীয় নেতাদের সম্পর্কিত রচনাবলীর অভাব নেই, যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে যোগেশ-চন্দ্র বাগল, জ্ঞানচন্দ্র রায় (সুরেন্দ্রনাথ), উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ (হিউম), শ্রীপ্রকাশ (অ্যানি বেশান্ত), টি. ভি. পারবাতে, টি. কে. সাহানি, জে. এস. হোয়েল্যান্ড (গোখলে), এইচ. পি. মোদি (ফিরোজ শা মেটা), আর. পি. মাসানি (দাদাভাই নৌরজি), ভি. এস. যোশী (ফাড়কে), ধনঞ্জয় কীর (সাভারকর), ডি. ভি. তাহ্মানকর, ডি. পি. কারমারকর, ভি. জি. ভাট, ডি. ভি. আথালিয়ে, রামগোপাল (তিলক), পি. সি. রায়, রাজেন সেন (চিত্তরঞ্জন), লুই ফিসার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সি. শংকরণ নায়ার, প্যারেলাল, পট্টভি সীতারামায়া, ডি. জি. টেণ্ডুলকর (গান্ধী), এইচ. এন. ব্রেলসফোর্ড, ডি. এফ. কারাকা, ফ্রাংক মোরায়েস, মাইকেল ব্রেচার (নেহরু), হিউ টয়, জে. জি. ওশাওয়া, এস. এ. আয়ার, শাহনওয়াজ খান, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত. দিলীপকুমার রায় (সুভাষ), হেক্টর বলিথো (জিন্না) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আকরগ্রন্থ হিসাবে এই সকল আত্মজীবনী ও জীবনী-মূলক রচনার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে প্রথম ক্ষেত্রে লেখকেরা নিজেরা শ্রদ্ধেয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা নিজ কর্মের সাফাই গাইবার আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের সম্পর্কে অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও বক্রোক্তি করেছেন, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের অভাব দেখা গেছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ, মণ্টাগু, জন মোর্লে প্রমুখ বিদেশী শাসক ও কূটনীতিবিদদের রচনাসমূহ সম্পর্কেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

ইংরাজ প্রশাসকদের মধ্যে অনেকে এবং ভারতীয় নেতা ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন বিভিন্ন ঘটনাচক্রের ব্যাখ্যা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করেছেন, এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের নানা দিক তাঁদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রতিফলিত হয়েছে, আবার কেউ কেউ সচেতনভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ অথবা কোন বিশেষ পর্যায়ের ইতিহাস রচনা কার্যে ব্রতী হয়েছেন, যেমন ওয়াই. সি. চিন্তামণি সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতির উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখেছেন, ভীমরাও আম্বেদকর ও খলিকুজ্জমান চৌধুরীর রচনায় পাকিস্তানের উদ্ভবের নেপথ্য ইতিহাস ধরা পড়েছে, সুভাষচন্দ্রের 'ভারতীয়

সংগ্রাম' গ্রন্থে তাঁর সমসাময়িক অপরাপর নেতাদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়া-কলাপের মূল্যায়নের পরিচয় পাওয়া গেছে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কয়েকটি গ্রন্থে বিদেশ থেকে দেখা ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে, লালা লাজপত রায়, আগা খান, নরিম্যান প্রভৃতির রচনাতেও সমসাময়িক ঘটনাবলী ব্যাখ্যাত হয়েছে, ভি. পি. মেননের 'ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর' গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে নেতাদের নেপথ্য কার্য-কলাপের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, চার্লস টেগার্ট, ও'ডোয়ার, এটলী প্রভৃতির রচনায় তাঁদের সমকালীন ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষিত হয়েছে।

আকরগ্রন্থ হিসাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দলিল ও রিপোর্টসমূহ, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সপ্রু কমিটির রিপোর্ট, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, সিডিশন কমিটির রিপোর্ট (রাউলাট রিপোর্ট, যা কার্যত ভারতীয় বিপ্লববাদের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ) মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট, হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্পর্কিত কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, আইন অমান্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট, সিসিল কে প্রণীত এখনও অপ্রকাশিত কমিউনিস্ট কার্য-কলাপ সংক্রান্ত রিপোর্ট, ভারতীয় স্টাটুটরি কমিশনের রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান লীগ প্রেরিত ডেলিগেশনের রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠকসমূহের রিপোর্ট, বিয়াল্লিশের আন্দোলন সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, নেতাজী তদন্ত কমিটি রিপোর্ট, প্রভৃতি। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক পত্রাবলী, যা ১৯৪২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল, কমিণ্টার্ণ সংক্রান্ত দলিলপত্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সম্প্রতি যেগুলির সাইক্লো-স্টাইল কপি প্রকাশিত হচ্ছে, ভারতীয় নেতৃবর্গ রচিত পত্রাবলী (সম্প্রতি প্রকাশিত প্যাটেলের পত্রাবলী এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য), প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ।

সংবিধান সম্পর্কিত দলিলপত্র সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন পি. মুখার্জী, এবং তারপর ১৯২২ সালে আর্থার বেরিয়াডেল কীথ, ১৯৫৭ সালে সার মরিস গাওয়ার এবং এ. আপ্পাডোরাই, ১৯৬১ সালে এ. সি. ব্যানার্জী। গভর্ণর-জেনারেলদের শাসনকাল এবং তাঁদের আমলের সাংবিধানিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মেরসে (১৯৪৯), ফিলিপ (১৯৫৩), মেসন (১৯৫৩), কুলকার্ণি (১৯৬১) প্রমুখেরা, তাছাড়া সি. ওয়াই. চিন্তামণি, রেগিনাল্ড কুপল্যাণ্ড, ভি. পি. মেনন, পি. এস. শিবস্বামী প্রভৃতির রচনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন শাসনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তনসমূহের ইতিহাস পাওয়া

যায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উপর হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, এইচ. ডব্লিউ. নেভিনসন, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কল্পনা বিষুই, সি. জে. ও'ডোনেল, ব্যামফাইল্‌ড ফুলার প্রভৃতির রচনা বিশেষ আলোকপাত করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস লিখেছেন সি. এফ. এণ্ডরুজ ও গিরিজা মুখার্জী, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এইচ. পি. ঘোষ, পি. সি. ঘোষ, বিমানবিহারী মজুমদার ও পট্টভি সীতারামায়া। এঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অ্যানি বেশান্ত (১৯১৫), কে. ওয়াই. নরীম্যান (১৯৩৩), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাতেও কংগ্রেস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। মাদ্রাজের নটেশন কোম্পানী কংগ্রেস সভাপতিদের ভাষণসমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। লর্ড মিণ্টোর গুরুত্বপূর্ণ শাসনকালে জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কে লিখেছেন এস. পি. ওয়াস্তি। এছাড়া মোর্লে ও লেডী মিণ্টোর স্মৃতিকথা এবং লালা লজপত রায়ের ভাষণসমূহ, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে, ওই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায়টির অমূল্য দলিল। মুসলিম রাজনীতির উপর এম. নোমান (১৯৪১), আহমদ খান (১৯৪২), রহমৎ আলি চৌধুরী (১৯৪৬), ভীমরাও আম্বেদকর (১৯৪৬), সাইমণ্ডস রিচার্ড (১৯৫০), শচীন সেন (১৯৫৫), রামগোপাল (১৯৫৯), আই. এইচ. কুরেশি (১৯৬১), পি. মুন (১৯৬১), খলিকুজ্জামান চৌধুরী (১৯৬১), কে. কে. আজিজ (১৯৬৩), জিয়াউল হাসান ফারুকী (১৯৬৩) ও এম. এস. জৈন (১৯৬৫) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি লিখেছেন।

রাউলাট রিপোর্ট ছাড়াও ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসের অনেক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে রণধীর সিং (১৯৪৫) এবং কল্যাণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গদর পার্টির ইতিহাসে, প্যাসিফিক হিস্টোরিকাল রিভিউতে প্রকাশিত জি. টি. ব্রাউনের প্রবন্ধে (১৯৪৮), গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫), বিমানবিহারী মজুমদার (১৯৬৬), যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৬) ও কালীচরণ ঘোষের (১৯৬৫) গ্রন্থসমূহে, এবং তদুপরি পূর্বোল্লিখিত বাংলা রচনাসমূহে। হোমারুল আন্দোলনের জন্য তিলক ও অ্যানি বেশান্তের রচনাবলী, মণ্টফোর্ড সংস্কার প্রসঙ্গে মদনমোহন মালব্যের রচনা, জালিয়ানওয়ালাবাগের উপর বি. জি. হোর্ণিমান, ভি. এন. দত্ত, রাজারাম প্রমুখের রচনাসমূহ বিশেষ মূল্যবান। গান্ধীজীবনীর সকল লেখকই অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ধরা পড়েছে হাচিংশন লেস্টার, ডেভিড ড্রুহে, ওভারস্ট্রীট ও উইণ্ডমিলার, এম. আর. মাসানি, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মুজফ্‌ফর আহমদ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায়,

হিন্দু মহাসভার ইতিহাস লিখেছেন ইন্দুপ্রকাশ ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর, ভারতীয় লিবারেল পার্টির ইতিহাস লিখেছেন বি. ডি. শুক্লা, আগস্ট বিপ্লব ও ভারত ছাড় আন্দোলনের উপর লিখেছেন জে. এম. দেব, তারাশংকর চক্রবর্তী, চমনলাল, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আর. এস. বিদ্যার্থি, গোবিন্দ সহায়, অম্বাপ্রসাদ প্রমুখেরা, সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর লিখেছেন এস. এ. আয়ার, উত্তমচাঁদ, এ. সি. চ্যাটার্জী, জন কোনেল, এস. এ. দাস, কে. বি. সুব্বাইয়া, হিউ টয়, ভুলাভাই দেশাই, কে. কে. ঘোষ, শাহনওয়াজ খান, অটো সারেক প্রভৃতি, বৃটিশ রাজত্বের শেষ পর্যায়ের উপর লিখেছেন হোরেস আলেকজাণ্ডার, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল এডওয়ার্ডস, ই. ডব্লিউ. আর. লুম্বি, এফ. মনসুর, ভি. পি. মেনন, পেণ্ডেরেল মুন, লিওনার্ড মোজলে প্রভৃতি। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে ১৯২৮-২৯এ প্রকাশিত স্টেটস কমিটির রিপোর্ট ছাড়াও কে. এন. হাকসার (১৯৪১) ও এডওয়ার্ড টমাসের (১৯৪৩) গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তির ইতিহাস লিখেছেন ভি. পি. মেনন (১৯৫৬)।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও দীর্ঘদিনের, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত আর. জি. প্রধানের 'স্বরাজের জন্য ভারতের সংগ্রাম' এবং ১৯৪৬-এ প্রথম প্রকাশিত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংগ্রাম' যে প্রচেষ্টার বিশেষ নিদর্শন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার প্রেরণা এসেছে ১৯৪০-এ প্রকাশিত রজনীপাম দত্তের 'আজকের ভারত' গ্রন্থ থেকে, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে ভারতীয় গণচেতনার বিকাশের ইতিহাস যার চেয়ে ভালভাবে আর কোন গ্রন্থে এখনও পর্যন্ত প্রদর্শিত হয় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে আরও হয়েছে, যেমন নন্দলাল চ্যাটার্জীর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' (১৯৫৮)। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর বিহার, উত্তরপ্রদেশ মধ্য-প্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার স্ব স্ব রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও হয়েছিল। ভারত সরকার সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের উপর অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করে ডঃ তারাচাঁদের উপর ওই কাজ ন্যস্ত করেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ডঃ মজুমদারের যাবতীয় পত্রালাপ এবং ওই সংক্রান্ত দলিলপত্র, ডঃ মজুমদার তাঁর তিন খণ্ডে রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসের (১৯৬২-৬৩) প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ওই তিন খণ্ডের বিষয়বস্তু পুনরায় প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজ প্রকাশিত 'ভারতীয় জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থমালার দশম ও একাদশ খণ্ডে।

এতগুলি রচনা নিঃসন্দেহে অনেক অভাব পূরণ করেছে তথাপি, আমার ধারণা, এমন একটি বই-এর প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায়, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরবে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ঘটনাগুলি ঠিক যেভাবে ঘটেছিল, শুধু সেইটুকুই প্রদর্শন করার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে, এবং সেগুলি থেকে সিদ্ধান্ত টানার দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যে সকল গ্রন্থাবলীর সাহায্যে নেওয়া হয়েছে সেগুলির উল্লেখ পাদটীকাসমূহে করা হয়েছে, তবে সর্বাধিক সাহায্য পাওয়া গেছে ডঃ মজুমদারের রচনাসমূহ থেকে। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্সের শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস এবং ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে দ্রুতগতিতে এবং নির্ভুলভাবে গ্রন্থটির প্রকাশ করেছেন, এবং সেই হিসাবে তাঁরা সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাক্তন লোকসভা সদস্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়। সকলের উদ্দেশ্যেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৯ই আগস্ট ১৯৭২

সূচীপত্র

প্রথম শতবর্ষ : বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের যুগ

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ কার্যত বাংলাদেশে সর্বক্ষমতার অধিকারী হলেও, এদেশে যে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা বুঝতে আরও বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। কেননা প্রশাসনের ক্ষেত্রে তখনও নবাবকেন্দ্রিক পুরাতন কাঠামোটাই বর্তমান ছিল, এবং সাধারণ লোকের চোখে মীর জাফর সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় এসেছেন, এর চেয়ে আর কিছু বেশি চোখে পড়েনি। এই পরাধীনতা এসেছিল বৃহত্তর জনসাধারণের অজ্ঞাতে, যার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। গর্ব করার মত অনেক ঐতিহ্য ভারতবর্ষের থাকলেও, সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে মাঝে মাঝে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটলেও, বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনধারা, গ্রামনির্ভর সমাজব্যবস্থা, সুপ্রাচীন কাল থেকে মুঘল যুগের শেষাশেষি পর্যন্ত একইভাবে বর্তমান ছিল। প্রাক্-ইংরাজ যুগে দেশে নগরের ঘাটতি ছিলনা, ১৭৫৭র একটি রিপোর্টে ক্লাইভ স্বয়ং মুর্শিদাবাদ শহরটিকে লণ্ডনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের শহরগুলির ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এখানে সেরকম কোন ফ্রী-সিটি গড়ে ওঠেনি, এবং পরিণামে কোন শিল্পবিপ্লবও হয়নি, কেননা নগরগুলি এখানে উৎপাদন-কেন্দ্র হবার পরিবর্তে বিলাসী অভিজাতদের বাসস্থান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ভূমিনির্ভর অর্থনীতির উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল নগরগুলির তখনই মৃত্যু হয়েছে যখনই সেই উদ্বৃত্তের উৎস যে কোন কারণেই হোক রুদ্ধ হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত গ্রামনির্ভর হবার দরুণ, সমাজজীবন তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল। ভারতীয় যন্ত্রবিদ্যা যে আদিম অবস্থায় ছিল তা নয়, কিন্তু তা ছিল কার্যত অপ্রগতিশীল, একটা অচলায়তন ভূমিনির্ভর সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ। তাই গ্রাম শিল্পগুলির উপরেই ইংরাজ শাসকশক্তির আঘাত সর্বপ্রথম আসে। বাংলার তাঁতশিল্পকে কিভাবে ইংরাজেরা ধ্বংস করেছিল সেটুকু মনে রাখলেই এখানে পর্যাপ্ত হবে। এদেশের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার মধ্যেই ইংরাজ পেয়েছিল সুদূরপ্রসারী সাফল্যের সন্ধান। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং স্থানীয় বিরোধসমূহের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে, তারা যে শক্তির অধিকারী হয়েছিল, তা তারা নিয়োগ করেছিল অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে। ইংরাজ শাসনকে এই কারণে সাধারণ মানুষ তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যখন তাদের পেটে টান ধরেছিল।১

ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে, অবশ্য সেই প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিটা যে সব সময়ই খুব সুস্পষ্ট ও ব্যক্ত হবে তার কোন মানে নেই। তা ছাড়া মূল শত্রুকে চিনতেও সময় লাগে, সর্বোপরি তার সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনোভাবও একরকম হয়না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অনেক তথ্য সহযোগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ইংরাজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচে-ছিল। তাঁর মতে এদেশে ইংরাজ শাসনের অর্থই ছিল হিন্দুর কাছে ছশো বছরের মুসলিম পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি, তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি, সম্পত্তি রক্ষা ও স্বাধীন ধর্মাচরণের গ্যারাণ্টি।২ ডঃ মজুমদার যে ধরনের প্রমাণপত্র দিয়েছেন তা থেকে এটাই কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে এই জাতীয় মনোভাব মূলত যে সকল হিন্দুর ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল, বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ছিল সংখ্যালঘু অংশ। এটা ছিল বিশেষ-ভাবে সম্পত্তিবান ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথা। অধিকাংশ হিন্দুই ছিল কৃষিজীবী ও কায়িক শ্রমনির্ভর, যাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে দরিদ্র মুসল-মানদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির কোন পার্থক্যই ছিল না, এবং সেই হিসাবে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা চালিত হয় নি। দ্বিতীয়ত, ডঃ মজুমদারের এই বক্তব্য মেনে নিয়েও যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশের হিন্দুরা যদি চিরকালই মুসলিম রাজশক্তিকে অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও তাদের স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিকূল মনে করে থাকে, হিন্দু মারাঠাদের প্রতিও তাদের মনোভাব নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল ছিল না, এবং এই কথাটা ডঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে স্বীকারও করেছেন।৩ যে মারাঠারা ভারতবর্ষে অখণ্ড হিন্দু রাজত্বের শ্লোগান দিয়েছিল, তাদের অত্যাচার যে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের হিন্দুদেরও বিন্দুমাত্র রেহাই দেয়নি, বরং তা বহু-ক্ষেত্রে যে মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং মারাঠারা মুসলমানদের চেয়েও অধিকতর ঘৃণার পাত্র হয়েছিল, তা স্যার যদুনাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ডঃ মজুমদারের নিজের ভাষাতেই বলতে হয়, "বাঙালীর নিকট মারাঠারা শুধুমাত্র

১। Mukherjee H N, *India's Struggle for Freedom* (1962), 19-20; Shelvankar K S, *The Problem of India* (1940), 116 ff: Dutt R P, *India Today* (1940), *passim*.

২। Majumdar R C., *History of the Freedom Movement of India* (1962), I, 30-47.

৩। *ibid*. 51

ইংরাজদের মত বিদেশীই ছিলনা, তারা ছিল ঘৃণ্য বিদেশী, যা ইংরাজরাও ছিল না। যে অত্যাচার মারাঠারা বাঙালীদের উপর করেছিল, যা প্রায় জীবন্ত স্মৃতির মধ্যে ছিল, সে রকম অত্যাচার ইতিপূর্বে ভারতের এক অংশের লোক অপর অংশের উপর করেনি। মারাঠাদের প্রতি বাঙালীর ঘৃণার পরিচয় এমন কি ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যেও পাওয়া যায়।" বস্তুত বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতি শাসকশ্রেণীর অত্যাচারটাকে সম্প্রদায়ের সঙ্গে না মেশালেই ভাল হয়। মুসলমান আমলে দরিদ্র মুসলমানদের অবস্থা যে তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের চেয়ে ভাল ছিল এরও কোন প্রমাণ নেই।

সে যাই হোক, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীর সাফল্যের অব্যবহিত পর থেকেই এদেশের ইংরাজশক্তিকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিকূলতার ধরন কি রকম ছিল তা আমরা ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রতি বছরেই অনুষ্ঠিত ইংরাজবিরোধী কার্যকলাপসমূহকে খোলা চোখে দেখলেই বুঝতে পারব। হলওয়েলের মতে ১৭৫৮ সালেই মীর জাফরের পুত্র মীরণ এবং রাজবল্লভ ডাচদের সঙ্গে ইংরাজবিরোধী একটি চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন, এবং মীর জাফরও এই চক্রান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল যে ডাচেরা বাটাভিয়া থেকে বাহিনী পাঠাবে, এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হবে। বাংলাদেশের চুঁচুড়ায় ডাচদের একটি ঘাঁটি ছিল। তবে এ চক্রান্তটা কোনদিন আদৌ করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মীর জাফরের পরবর্তী কার্যকলাপের মধ্যেও তার ইঙ্গিত নেই। তাঁর নিজের সৈন্যদলের মধ্যে বেতনের অভাবে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, মুঘল রাজপুত্র ও সম্রাট শাহ আলমের আক্রমণও তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।৪ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে ইংরাজদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন তাঁর আর কোন গতি ছিল না। ১৭৫৮র শেষের দিকেই শাহ আলম বিহার আক্রমণ করেছিলেন এবং ১৭৫৯-এর মার্চে তিনি পাটনার নিকটবর্তী ফুলওয়ারিতে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ইংরাজ বিতাড়ন ছিল না, মীর জাফরকে হটিয়ে বাংলার মসনদে নিজের মনোমত ব্যক্তিকে বসিয়ে হৃত মুঘলগৌরবকে বাংলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর মতলব ছিল, এবং সেই কারণে তিনি ক্লাইভের সাহায্যও চেয়েছিলেন।৫ কিন্তু ইংরাজরা মীর জাফরের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল, এবং অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে শাহ আলম কিছুকালের জন্য সরে পড়েছিলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মীর জাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীর

৪। Sarkar J. N., *Fall of the Mughal Empire*, II, xxv.
৫। Vansittart H., *Narratives of the Transactions in Bengal*, I, 51

কাশিমকে বাংলার নবাবী প্রদান করে। এই পরিবর্তনের বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জমিদারদের বিদ্রোহ, যে ক্ষেত্রে ইংরাজরা মীর জাফরের বিশৃংখল সৈন্য-বাহিনীর উপর ভরসা করতে পারেনি। বস্তুত ১৭৬০ সালে বিভিন্ন জমিদারদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের ফলে এখানে ইংরাজদের অস্তিত্ব অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে মেদিনীপুরের রামরাম সিংহের বিদ্রোহ এবং তারপর ঢাকার বিদ্রোহ, যার উদ্দেশ্য ছিল আলিবর্দি কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত সরফরাজ খানের এক পুত্রকে সিংহাসনে বসানো, দমন করা হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা, রামগড়ের রাজা ও খড়গপুরের রাজাও ওই সময়ে ইংরাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দেই বর্ধমানের মহারাজা ও বীরভূমের রাজার মধ্যে ইংরাজ হটানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। মারাঠা সেনাপতি শিউ ভট্ট তাঁর অনুচরসহ এতে সামিল হয়েছিলেন, এবং একদা ইংরাজদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহারাজ নন্দকুমারও সম্ভবত এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। এই সংঘবদ্ধ জমিদারদের আমন্ত্রণে মুঘল সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। বিহার থেকে তিনি বিষ্ণুপুরে আসেন ১৭৬০-এর মার্চে, এবং সেখানে শিউ ভট্ট তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তিনি দামোদর নদ অতিক্রমও করেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে অনুকূল নয় বুঝে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। ওই বছরের শেষের দিকে বীরভূমের রাজা ও বর্ধমানের মহারাজা পরাস্ত হন। ওই একই সময়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদিম হোসেন খাঁ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁর পিছনে মীরণ ও মেজর কাইলাউড ধাওয়া করেছিলেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হওয়াতে শেষ পর্যন্ত আর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।৬

পাশাপাশি বৃহত্তর জনসাধারণও খুব একটা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলনা, তাদের ভিতর থেকেও ইংরাজবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করতে হয়, যে বিদ্রোহসমূহের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, এবং তা দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব ভারতে অত্যন্ত সক্রিয় অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল।৭ এই বিদ্রোহের স্রোত পূর্ব থেকে ধীরে ধীরে

৬। Long J, *Selections from the Unpublished Records of the Government of Bengal*, Nos 496-97, 537 558.

৭। O'Malley L S S, *Bengal, Bihar and Orissa under British Rule* (1925), 210-12; সন্ন্যাসী বিদ্রোহের জন্য এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত Long's *Selections* এবং Hunter's *Annals of Rural Bengal*.

পশ্চিমামুখী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা হারিয়ে যায়। আমরা আগে দেখেছি যে মীর জাফরকে সরিয়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীর কাশিমকে বাংলার মসনদ দেওয়া হয়। কিন্তু মীর কাশিম দীর্ঘকাল ইংরাজদের তাঁবে থাকতে রাজি ছিলেন না। শুল্কনীতি নিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ খুব তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে তিনি খোলাখুলিভাবেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পর পর কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন, এবং মুঙ্গের ও পাটনা নগরদ্বয় ইংরাজদের হাতে আসে। মীর কাশিমের এই সক্রিয় ইংরাজবিরোধিতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথমত, মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ ছিল সুপরিকল্পিত, যার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজদের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তিলাভ, এবং সেই উদ্দেশ্যে মীর কাশিম তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে তুলনামূলকভাবে আধুনিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে-ছিলেন। এ ছাড়া, শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে কূটনৈতিক মৈত্রী স্থাপন খুবই সময়োচিত হয়েছিল। আন্তরিকভাবে যদি তিন শক্তি একত্রে লড়াই করত, তাহলে বকসারের যুদ্ধে (১৭৬৪) ইংরাজদের পরাজয় মোটেই অসম্ভব হত না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। বকসারের যুদ্ধের পূর্বে সুজাউদ্দৌল্লা আকস্মিকভাবে মীর কাশিমকে বন্দী করেন এবং তাঁকে উত্তপ্ত লৌহকটাহে উপবিষ্ট করিয়ে তাঁর ধনসম্পদের হদিশ জেনে নিয়ে সেগুলি হস্তগত করেন। এর পর বকসার যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ নিতান্তই লোক দেখানো ব্যাপার ছিল, বকসার যুদ্ধের পর তিনি এবং শাহ আলম উভয়েই ইংরাজদের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন, তিনি মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কোরা এবং এলাহাবাদ ছাড়া তাঁর সমগ্র খাজ্যই ফিরে পান, আর শাহ আলম ১৮৬৫র ১২ই আগস্ট তারিখে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা করের ভিত্তিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সমর্পণ করেন।

ধলভূমের রাজা তাঁর এলাকার মধ্যে ইংরাজদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়ে-ছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করায় তাঁর ভাগ্নে জগন্নাথ ঢাল ধলভূমের রাজা হন, কিন্তু ইনিও খোলাখুলিভাবে ইংরাজদের বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন মর্গান কিছু করতে অপারগ হন। জগন্নাথ ঢাল ঘাটশিলা ও বরাভূম অঞ্চলের চুয়ার জাতিকে নিজ পক্ষে আনেন।৮ তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লেফটন্যাণ্ট নুন

৮। বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিদ্রোহাত্মক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য S. B. Chaudhuri-র *Civil Disturbances during the British Rule in India* (1955) দ্রষ্টব্য।

পরাজিত হন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে চুয়াররা বৃটিশ এলাকাসমূহে রীতিমত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, এবং এরপরেও দীর্ঘকাল ধরে বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল, যা আমরা কিছু পরেই দেখতে পাব। এগুলিকে নিছক আঞ্চলিক ঘটনা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ দেশের বৃহত্তর জনসমাজকে দারিদ্রের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে ১৭৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ নামেমাত্র মুঘল শাসনের শেষ বছরে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮১৮,০০০ পাউণ্ড, কিন্তু ১৭৬৫-৬৬ সালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানির প্রথম বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১,৪৭০,০০০ পাউণ্ডে, আর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বছরে তা লাফ দিয়ে ৩,০৯১,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই আকস্মিক রাজস্ব বৃদ্ধির রহস্যটি ফ্রান্সিস বুকানন বা হ্যারল্ড ম্যানের মত তৎকালীন ইংরাজ সমীক্ষকদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি।১ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় যে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, যাতে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক শেষ হয়ে গিয়েছিল, তার ফলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের কোন ক্ষতি হয়নি, সে অবস্থার মধ্যেও তারা দ্বিগুণ উপার্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ক্লাইভ হাউস অফ কমন্সে সগর্বে বলেছিলেন, কোম্পানী এমন এক সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছে, যা ফ্রান্স ও রুশিয়া বাদ দিয়ে ইউরোপের যে কোন রাষ্ট্রের চেয়ে বৃহৎ। কিন্তু সেই বছরেই, অর্থাৎ ১৭৭২ সালেই, রংপুর জেলায় যে ডাকাতবাহিনী হামলা করেছিল, সরকারী রেকর্ডে তাদের সংখ্যা ৫০,০০০ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই সংখ্যাটির মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও, একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষ একটি উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল, যেটাকে নিছক ডাকাতি বলে উড়িয়ে দিলে বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখা হবে। বস্তুত বছরের পর বছর কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ স্ফীত থেকে স্ফীততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়েছিল। ওই ১৭৭২-এর শেষের দিকে সন্ন্যাসীরা রংপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটায়। ক্যাপ্টেন টমাস তাদের হাতে নিহত হন। এরপর তারা বগুড়া ও মৈমনসিংহ জেলাদ্বয় দখল করে এবং জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করতে আরম্ভ করে। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ডঃ মজুমদার 'ধর্মীয়

বর্তমান অধ্যায়ে পাদটীকার জন্য যেখানে কোন সংখ্যা চিহ্ন দেওয়া নেই সেই সকল অংশ এই গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

১। Dutt R P, *India Today*, 203 ff

উত্তেজনার' তালিকাভুক্ত যে করেছেন কেন জানি না, যদিও তিনি নিজেই লিখেছেন যে এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল নিরন্ন কৃষক, উৎখাতপ্রাপ্ত জমিদার এবং বাতিল হয়ে যাওয়া সৈনিকেরা।১০

১৭৭৩ সালে চুয়ারদের সহায়তায় পূর্বোক্ত ধলভূমের জগন্নাথ ঢাল পার্শ্ববর্তী ইংরাজ অধিকৃত এলাকাসমূহে হামলা চালিয়ে যান, ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজেরা তাঁর সঙ্গে একটি রফায় আসে, কিন্তু চুয়ারদের বিদ্রোহ এর পরেও বারে বারে হয়েছে। ১৭৭৩-এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হন, এবং পুনরায় ১৭৭৬-এ মেজর রেনেল এদের হাতে গুরুতরভাবে আহত হন।

১৭৭৮-৭৯ সালে মহীশূরের হায়দর আলির উদ্যোগে মারাঠা শক্তি-সমূহ ও হায়দ্রাবাদের নিজামকে নিয়ে একটি বৃটিশবিরোধী মহাজোট গড়ে তোলা হয়, এবং স্থির হয় যে প্রত্যেকে একযোগে নিজ নিজ শক্তির কেন্দ্র থেকে ইংরাজদের আক্রমণ করবেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি যা সফল হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বদলে যেত, ওয়ারেন হেস্টিংসের কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। এই সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বারানসীর চৈত সিং-এর ঘটনাটিকে দেখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ওয়ারেন হেস্টিংস চৈত সিং-কে বেআইনীভাবে উচ্ছেদ করেছিলেন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। বিনা যুদ্ধে অবশ্য চৈত সিং তাঁর দখল ছাড়েন নি, এবং তাঁর বাহিনী যে বৃটিশ শক্তিকে বিপন্ন করতে পেরেছিল, ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই তা অবগত আছেন। এই চৈত সিং-এর উচ্ছেদের ঘটনা স্থানীয় ব্যাপার থাকেনি, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তা ইংরাজ-বিরোধী বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। অযোধ্যার বৃটিশ রেসিডেণ্ট ন্যাথা-নিয়েল মিডলটন কলকাতা কাউন্সিলকে ১৭ই অক্টোবর ১৭৮১তে লিখে-ছিলেন যে ঘর্ঘরা নদীর পূর্বতীরস্থ সমস্ত এলাকাগুলিতেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, অযোধ্যার বেগমরা খোলাখুলিভাবেই চৈত সিংকে সমর্থন করেছিলেন, ফৈজাবাদ শহরটিকে মনে হচ্ছিল যেন তা অযোধ্যার নবাবের অধীনে নয়, চৈত সিং-এরই অধীনে। অযোধ্যার নবাব এবং তাঁর আত্মীয়রা সম্ভবত গোপনে চৈত সিংকে সাহায্য করেছিলেন। কর্ণেল হান্নের মতে এই ঘটনাগুলি একটি পূর্বপরিকল্পিত ইংরাজবিরোধী চক্রান্তেরই ফল-শ্রুতি, নতুবা বিভিন্ন প্রান্তে একই সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক ঘটনাসমূহ ঘটতে পারত না। চৈত সিং মহাদজী সিন্ধিয়ার আশ্রয় পেয়েছিলেন, যার ফলে

১০। *History of the Freedom Movement of India*, I, 136

সিন্ধিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবেন বলে ওয়ারেন হেস্টিংস শাসানি দিয়েছিলেন। মারাঠা শক্তির কাছে চৈত সিং-এর আশ্রয়লাভ ঘটনায় মনে হয় যে চৈত সিং ইংরাজবিরোধী মহাজোট সম্পর্কে রীতিমতই ওয়াকিবহাল ছিলেন।১১

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যশোহরে তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী রাজস্ব বহনকারী একটি দলকে আক্রমণ করেছিল। ওই বছরেই রংপুরে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল, যা কুখ্যাত দেবী সিং-এর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে টিনেভেলি জেলার পন্‌জালন-কুরিচির পোলিগাররা ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ওই একই সময় গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের খাসিরা বিদ্রোহী হয়। সিলেটে রাধারামের নেতৃত্বে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এক প্রচণ্ড ধরনের বিদ্রোহ হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লাউর অঞ্চলের খাসিরা এবং অপরাপর উপজাতিরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। তারা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আক্রমণ চালায় এবং তিনশোরও বেশি লোককে হত্যা করে। গঙ্গা সিং নামক জনৈক খাসি প্রধান ইসামতির বাজার ও থানা লুণ্ঠন করে, এবং ১৭৮৯র জুন মাসে পাণ্ডুয়া নামক একটি স্থানে ইংরাজ বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে তথাকথিত একটি দস্যুবাহিনী ব্যাপক লুণ্ঠনকার্য চালায়, এবং তার দুবছর পরে, সেখানে প্রচণ্ড ধরনের কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।১২

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধির ফলে মালাবার অঞ্চল ইংরাজদের তাঁবে চলে এলেও ওই অঞ্চলের স্থানীয় রাজারা খোলাখুলি-ভাবেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।১৩ ওই বছরেই কোট্টায়াম বংশের কেরল বর্মা রাজা একটি দুর্ধর্ষ অভ্যুত্থান ঘটান, এবং তাঁর সঙ্গে কোহোটের রাজা যুক্ত হন। এর ফলে ইংরাজরা তাদের সঙ্গে রফায় আসতে বাধ্য হয়। ভিজিয়ানাগ্রামের রাজা বিজয়রাম রাউজের প্রতি ইংরাজরা নির্দেশ দিয়েছিল যে তিনি যেন তাঁর সৈন্যবাহিনী বাতিল করেন, সামন্তদের উপর প্রভাব তুলে নেন এবং অধিকতর পরিমাণে কর প্রদান করেন। সেই নির্দেশ অস্বীকার করে তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের

১১। Thornton E., *History of the British Empire in India*, II, 193, 296-308.

১২। Chaudhuri, *op. cit.*

১৩। মালাবার অঞ্চলের বিদ্রোহসমূহের জন্য W. Logan সম্পাদিত *Malabar* দ্রষ্টব্য। এছাড়া K Rajayyan রচিত Kerala Varma and Malabar Rebellion (*Journal of Indian History*, XLVII, 549 ff) প্রবন্ধটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পরাজিত ও নিহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্র নারায়ণ রাউজ ইংরাজদের সঙ্গে শত্রুতা চালিয়ে যান এবং বহু সহস্র লোক তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ওই একই বছরে গঞ্জাম জেলার কিমেদির জমিদারের খাজনা বাকি পড়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সেই উপলক্ষে সারা অঞ্চল বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। যদিও এই বিদ্রোহ ইংরাজরা দমন করেছিল, তথাপি ওই এলাকায় সংঘর্ষ আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার আসামে খাসি বিদ্রোহ ঘটেছিল। কিন্তু বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আরও একটি ইংরাজবিরোধী মহাজোটের সৃষ্টি যার শরিক ছিলেন কাবুলের জমান শাহ, মহীশূরের টিপু সুলতান, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌল্লা এবং রোহিলা সর্দার গোলাম মোহম্মদ।১৪ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের চারটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হচ্ছে চুয়ার বিদ্রোহ। পূর্বেকার চুয়ার বিদ্রোহগুলির কথা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এবারের বিদ্রোহে তারা সমগ্র মেদিনীপুর জেলাটিরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছিল। প্রতিদিনই হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছিল। ১৪ই মার্চ তারিখে তারা দুটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং এর পরেও তারা প্রচুর সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিল। ১৭৯৯-এর দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে সিলেটে আগা মোহম্মদ রেজার বিদ্রোহ। এই ব্যক্তি নিজেকে দ্বাদশতম ইমাম বলে দাবি করতেন এবং বলতেন যে বৃটিশ বণিকদের হাত থেকে ভারতকে উদ্ধার করার জন্য তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। তিনি ১২০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে একটি থানা দখল করেছিলেন। তাঁকে অবশ্য ইংরাজেরা খুব সহজেই পরাভূত করে। ১৭৯৯-এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হচ্ছে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু, এবং চতুর্থটি হচ্ছে ওয়াজির আলির বিদ্রোহ।

অর্থের বিনিময়ে ইংরাজরা ওয়াজির আলিকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পিতৃব্য সাদৎ আলিকে সিংহাসনে বসায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ওয়াজির আলি বারানসীর নিকট বাস করতে থাকেন, এবং এর শোধ নেবার জন্য বৃটিশবিরোধী চক্রান্তে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হন। তাঁর সঙ্গে দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং টিপু সুলতানের যোগাযোগ হয়েছিল। এ ছাড়া মোল্লা মোহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে কাবুলের জমান শাহের নিকট দূত করে পাঠান। তিনি অযোধ্যাবাসীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন।

১৪। Cunningham, *History of the Sikhs* (1904), 177 n

তাঁর দলবল ১৭৯৯-এর ১৪ই জানুয়ারী বারানসীর ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিঃ চেরীকে নিহত করে। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড ওয়েলেসলি সে বছরেরই ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াজির আলিকে কলকাতায় নির্বাসিত করার আদেশ দেন। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ওয়াজির আলিকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে এলে নগরবাসীগণ তাদের প্রতিরোধ করে। ওয়াজির আলি আজমগড় দিয়ে নেপাল চলে যান, এবং কিছুকাল পরেই বিপুল বিক্রমে গোরখপুর আক্রমণ করেন। মেজর জেনারেল আরস্কাইন লিখেছিলেন, ওয়াজিরের অনুচরবর্গ সর্বত্রই ইংরাজদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। শুধু বারানসী নয়, গাজিপুর ও আজমগড়েও ইংরাজবিরোধী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ভটৌনের রাজা, সারনাথের জগৎ সিং প্রভৃতি ওয়াজিরের সমর্থক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওয়াজির ব্যর্থ হন, কিন্তু তাঁকে ঘিরে যে ঘটনাচক্র তা নিঃসন্দেহে ইংরাজবিরোধী সর্বভারতীয় চক্রান্তের তীব্রতা ও ব্যাপ্তির পরিচায়ক।১৫

১৮০০ সালে পৌঁছে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে তখনও চুয়াররা বৃটিশ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৮০০ সালে চুয়ারদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বরাভূমের রাজার ভাই মাধব সিং। তাদের অপরাপর নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঝুরিয়ার জমিদার রাজা মোহন সিং, এবং লক্ষ্মণ সিং যিনি দুলমা পাহাড়ে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরাজরা সাবেকি হিন্দু-বংশের একজনকে মহীশূরের সিংহাসনে বসায়, এই উদ্দেশ্যে যে হিন্দু-প্রধান মহীশূর এর ফলে শান্ত থাকবে। কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি, মহীশূরের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ইংরাজবিরোধী হাঙ্গামা হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বেদনোরের জমিদার ধুন্দিয়ার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ইংরাজদের রীতিমত বেগ দিয়েছিল যদিও শেষ পর্যন্ত ধুন্দিয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আর্থার ওয়েলসলির নিকট পরাজিত ও নিহত হন।১৬ ১৮০০-১৮০১ সালে গঞ্জাম জেলার বহু জমিদার গুমসুরের জমিদার স্ত্রীকর ভঞ্জের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে করবৃদ্ধির প্রতিবাদে মালাবার অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীরা এডাচেন্না কুনগানের নেতৃত্বে ওয়েনাদ জেলার পানামারম দুর্গ দখল করে। ১৮০৩ সালে সারা প্রদেশে এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে। কর্ণাট অঞ্চলের পোলিগাররা

১৫। Basu P., *Oudh and the East India Company*, VIII : Chaudhuri, *Op. Cit*, 76 ; Mill J., *History of British India*, VI, 135-36

১৬। Thornton, *op. cit*, III, 93 ff

১৮০৩-৫-এর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পোলিগাররা ছিল স্থানীয় ধরনের সমরনায়ক যারা কতকগুলি কাজের বিনিময়ে প্রায়-স্বাধীন জমিদারী ভোগ করত। কর্ণাট অঞ্চল ইংরাজদের শাসনে এলে তারা সহিংস পথেই প্রতিরোধ করেছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত খুরদার রাজা ইংরাজদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অপরাধে তাঁর জমিদারী হারান। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক করবৃদ্ধির ফলে জমিদারদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, এবং খুরদারাজের ক্রিয়াকলাপ তারই অভিব্যক্তি। ঐ বছরেই ত্রিবাংকুর রাজ্যের নায়ারবাহিনী তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং সেই বিদ্রোহ কিছুদিনের মধ্যেই বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহে পরিণত হয়। ১৮০৪ সাল থেকেই বাংলাদেশে ফরাইদি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ফরাইদি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন শরিয়তুল্লা। গোড়ার দিকে তাঁর মতামত ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও কালক্রমে তা রাজনীতিভিত্তিক হয়ে ওঠে। তিনি ঘোষণা করেন যে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ দার-উল-হারব, যেখানে কোন প্রকৃত মুসলমান বাস করতে পারে না। তাঁর পুত্র দুধু মিয়া সংগঠনকে আরও জোরদার করেন। এই প্রসঙ্গটি আমরা পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। এই আন্দোলন পরবর্তী ওহাবী আন্দোলনের পূর্বসূরী।[১৭] ১৮০৫ সালে বুন্দেলখণ্ডে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেখানকাব দেড়শো স্থানীয় প্রধান বিদ্রোহী হয়েছিলেন। অজয়গড় এবং কালিঞ্জরের কেল্লাদাবেরা ইংরাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সুকঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের গোপাল সিং চার বছর ধরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।[১৮] পরবর্তী বছরের, অর্থাৎ ১৮০৬ সালের সবচেয়ে বড ঘটনা ছিল ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ। বিখ্যাত ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পূর্বসূরী এই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ছিল অর্থনৈতিক ও সংস্কারগত। যে সিপাহীদের দক্ষতাকে মূলধন করে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাড়বাড়ন্ত, তাদের বেতন, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়, এবং সর্বোপরি নানান অজুহাতে তাদের যুগ অর্জিত সংস্কারগুলির প্রতি রূঢ় আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এই বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীদের পিছনে ছিলেন ভেলোরে নির্বাসিত টিপু সুলতানের পরিবার, আর এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে।

১৭। ফরাইদি এবং ওহাবী আন্দোলনসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য *History and Culture of the Indian People*, IX,883 ff

১৮। Mill and Wilson, *History of British India*, VII, 12 ff, 124 ff

১৮০৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ত্রিবাংকুরের দেওয়ান ভেলু তাম্পি কোচিন ও মালাবার অঞ্চলের অপরাপর রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরাজবিরোধী একটি চক্রান্ত করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং অন্যান্য মালাবার রাজ্যসমূহের প্রধানদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ইংরাজরা মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে মালাবার অঞ্চলকে বৃটিশ প্রভাবমুক্ত করা সম্ভবপর। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কথামত অপরে চলতে রাজি হয়নি এবং তাঁর পরিকল্পনার বিষয় ইংরাজদের নিকটে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোন তরফ থেকেই সাহায্য পাননি, এমনকি যে রাজার তিনি দেওয়ান ছিলেন, তিনিও এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তথাপি ভেলু তাম্পি বীরত্বের সঙ্গে বারবার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হন, এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।[১৯] ১৮১০ সালে আবদুল রহমান নামক জনৈক ব্যক্তি সুরাটে নিজেকে ইমাম মেহ্‌দী বলে ঘোষণা করেন, এবং সুরাটের বৃটিশ প্রধানকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করার জন্য এবং তাঁকে কর দেবার জন্য ফরমান জারি করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সাহারানপুর অঞ্চলের গুজররা বিদ্রোহী হয়েছিল যদিও তা সহজে দমন করা হয়। ১৮১৪ সালে বাধিক এবং মেওয়াটি লুটেরার দল মুরসন এবং হাতরাস অঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামা চালিয়েছিল। ১৮১৫ সাল থেকে কাথিয়াবাড় অঞ্চলের রাজপুত সামন্তদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে এক চুক্তির ভিত্তিতে ইংরাজেরা এই অঞ্চলে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে, যার ফলে কাথিয়াবাড় থেকে ইংরাজদের হটিয়ে দেবার জন্য কয়েকটি চক্রান্ত হয়। এই সকলের ফলশ্রুতি হচ্ছে রাও ভর্মলের বিদ্রোহ যিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্থানীয় আরব ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি পরাজিত হলেও ওয়াগব জেলার সর্দারেরা দীর্ঘকাল ইংরাজদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।

বেরিলীতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রচন্ড রকমের কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুফতি মোহম্মদ আইওয়াজ। এই বিদ্রোহের মূল কারণ করবৃদ্ধি। ঘটনাচক্রে ওই মুফতি আহত হলে বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং কয়েকজন পদস্থ ইংরাজকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ক্যানিংহাম ও মেজর রিচার্ডস অবস্থা আয়ত্তে আনেন। বিদ্রোহীদের পক্ষে তিনশতাধিক ব্যক্তি মারা যায় এবং ইংরাজ পক্ষে একুশজন। আলিগড়ের ভূম্যধিকারীরাও এই সময়ে বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

১৯। Thornton, *Op. Cit*, IV. 119-25

এই সকল বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দয়ারামের বিদ্রোহ। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল আট হাজার এবং তাঁর দুর্গও ছিল ভরতপুরের মত দুর্ভেদ্য। ১৮১৭র ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ এই একমাস ধরে দয়ারাম প্রবলভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিলেন। ১৮১৭ সালেই উড়িষ্যার পাইকরা বিদ্রোহ করেছিল জগবন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্রের নেতৃত্বে। বিদ্রোহীরা বানপুর থানা ও সরকারী গৃহ-সমূহ ধ্বংস করে, একশোর উপর মানুষকে হত্যা করে এবং পনের হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। এদের সাফল্যে উড়িষ্যার সর্বত্রই বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। অতঃপর বিদ্রোহীরা খুরদা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই শহরের সকল গৃহ ভস্মীভূত করা হয় এবং ট্রেজারী লুণ্ঠিত হয়। অবস্থা এতই ভয়ানক হয়ে ওঠে যে সরকারী কর্ম-চারীরা ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যান, সাময়িকভাবে সেখান থেকে ইংরাজ শাসনের সকল চিহ্ন অবলুপ্ত হয়। পুরী অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮১৭ সালে, ত্রিম্বকজী দঙ্গিলা নামক পেশোয়ার এক মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে, যিনি বৃটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে প্রমাণ আছে, মারাঠা জাতি শেষবারের মত ইংরাজদের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, কিন্তু কির্কির যুদ্ধে পেশোয়া পরাজিত হন, ভোঁসলা ও হোলকারও যথাক্রমে সীতাবলদি ও মাহিদপুরে যুদ্ধে পরাজিত হন।২০

১৮১৮ সালে পেশোয়া পুনরায় কোরেগাঁও ও আস্তির যুদ্ধে পরাজিত হন ও আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ভাতাসহ কানপুরেব অন্তর্গত বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। ১৮১৮-১৯ সালে খান্দেশ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের ভীলেরা বিদ্রোহী হয়, যে বিদ্রোহের পিছনে সম্ভবত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মন্ত্রী ত্রিম্বকজীর হাত ছিল। এই বিদ্রোহ বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েক বছর চলেছিল। ১৮২০ সালে রাজস্থানের মের উপজাতি ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। ওই বছরেই সিংভূমের রাজা, যিনি তাঁর হো উপজাতীয় প্রজাদের সাহায্যে ইংরাজদেব প্রতিরোধ করে চলেছিলেন, বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮২০-২১এ উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীর সৈয়দ আহম্মদ আরবের ওহাবী মতবাদের অনুরূপ মতবাদসমূহ প্রচার করতে আরম্ভ করেন, এবং কালক্রমে তাঁর আন্দোলন রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করে যার ইতিহাস ক্রমশ প্রকাশ্য।২১

১৮২৪-এ হরিয়ানা অঞ্চলের জাঠ, মেওয়াট এবং ভট্টিরা ব্যাপকভাবে

২০। *ibid.*, 398 ff.
২১। Chaudhuri *op. cit.*, 50-51, 96-97, 112.

সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে ইংরাজরাজ খতম হয়ে গেছে। কচ্ছ সীমান্ত থেকে শুরু করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানুদেশবাসী কোলি নামক জনগোষ্ঠী ১৮২৪এ বিদ্রোহ হয়েছিল, এবং পরেও তারা বিদ্রোহী হয়েছিল। ওই বছরেই বিজাপুরের দিবাকর দীক্ষিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একদল বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে বিজাপুরের চার মাইল পূর্বে অবস্থিত সিন্দাগি লুণ্ঠন করেন এবং সেখানে একটি নিজস্ব সরকার স্থাপন করেন। ১৮২৪ এই বেলগাঁও জেলার কিট্টুরেও বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ ঘটেছিল, কেননা সেখানকার রাজা শিবলিঙ্গ রুদ্রের মৃত্যুর পর ইংরাজরা তাঁর দত্তক পুত্রের সিংহাসনের দাবি মানেননি। ১৮২৪ সাল থেকেই ঝারেজা সর্দারেরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল এবং সিন্ধুর আমীরদের সহায়তায় রাও ভর্মলকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ১৮২৪-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা বারাকপুরে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। ৪৭নং পদাতিক বাহিনী ব্রহ্মযুদ্ধে যাবার জন্য বারাকপুরে হাজির হয়েছিল। যানবাহনের অভাব ছিল প্রচণ্ড. তাদের মালপত্র বহন করার দায়িত্ব কোম্পানী নেয়নি, এবং এর জন্য যা খরচপত্রের প্রয়োজন ছিল তাও তাদের দেওয়া হয়নি। ৩০শে অক্টোবর তারিখের প্যারেডের সময় তারা প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং দাবি করে যে ডবল বাট্টা না পেলে তারা রেঙ্গুন যাবে না। তাদের এই দাবি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার পর তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে ইংরাজ সৈন্য আনিয়ে এই বিদ্রোহ চরম নৃশংসতার সঙ্গে দমন করা হয়। বহু সিপাহীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং অনেককে বন্দী করে কঠিন শ্রমশিবিরের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। উচ্চপদাধিকারী ভারতীয়দের সৈন্যবাহিনী থেকে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়। এই বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া ব্রহ্মযুদ্ধের উপরেও পড়েছিল যেখানে সিপাহীরা পর্যাপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেনি। ১৮৫৭র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের মূলে এই বিদ্রোহের স্মৃতির প্রভাব যথেষ্টই ছিল।

বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে টিপু নামক এক ব্যক্তি, যিনি পাগলাপন্থী নামক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন এবং ওই অঞ্চলে কিছু-কালের জন্য আধিপত্য করেছিলেন। আসাম উপত্যকায় পুনরায় খাসিরা ১৮২৫ সাল থেকে বিদ্রোহ শুরু করেছিল এবং চার বছর ধরে বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল। ওই বছরেরই ১৪ই অক্টোবর তারিখে আসামে একটি ছোটখাট সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। ১৮২৬ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের রামোশিসগণ বিদ্রোহ করে। এরা আগে

মারাঠা বাহিনীতে কাজ করত, কিন্তু মারাঠাশক্তি ইংরাজদের তাঁবে এসে পড়লে এরা বেকার হয়ে যায়, সর্বোপরি ১৮২৫-এর দুর্ভিক্ষ তাদের সহ্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। ১৮২৭-এ সৈয়দ আহমদ, যিনি ওহাবী ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাতকারী হিসাবে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছেন, শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু শিখরা বৃটিশের পদানত হলে, তাঁর আন্দোলন বৃটিশবিরোধী হয়ে পড়ে। ১৮২৯-এ পূর্বোক্ত বেলগাঁও-এর কিট্টুর এবং আসামের খাসিরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। ১৮৩০-এ উত্তর কোঙ্কনের তীরে অবস্থিত সবন্তবাদিতে বিদ্রোহ হয়। ওই বছরেই আসামের সাদিয়া অঞ্চলে জনৈক সিংপো প্রধান তিন সহস্র অনুচর ও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ব্যাপক ইংরাজবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটান। ১৮৩০ থেকে ভিজিয়ানাগ্রামে বীরভদ্র রাউজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘটতে শুরু করে। ১৮৩১-এ খান্দেশের ভীলরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। ১৮৩১-৩২ সালের বিখ্যাত কোল বিদ্রোহের কথা এর পরেই আসে। রাঁচী ও হাজারীবাগ জেলা, পালামৌ জেলার টৌরি পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে এই বিদ্রোহের তীব্র ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩১-৩২-এ পালকোণ্ডাতেও একটি বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। ১৮৩১-এ বাংলাদেশের চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। তিতু পূর্বোক্ত ওহাবী ধারার অনুগামী ছিলেন এবং প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত নিহত হন। ১৮৩২-এ পূর্বোক্ত কোল বিদ্রোহকে অনুসরণ করেই মানভূমের ভূমিজরা বিদ্রোহ করে।

গঞ্জাম জেলায় পূর্বকথিত স্ত্রীকর ভঞ্জের পুত্র ধনঞ্জয় ১৮৩৫-এ দুর্ধর্ষ বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও সেখানে তখন ইংরাজশক্তির অস্তিত্ব মুছে গিয়েছিল। কাপাসচোর-আকশ জাতির প্রধান তাগিরাজা ১৮৩৫-এ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ১৮৩৬-এ সবন্তবাদিতে পুনরায় বিদ্রোহ হয়েছিল। ১৮৩৮-এ দুধু মিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বহুস্থানে ইংরাজ ও জমিদারবিরোধী কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ফরাইদি আন্দোলন নামে পরিচিত এই বিদ্রোহ জমিদার ও নীলকরদের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২২] ১৮৩৮-এ শোলাপুরে বেতন না পাওয়ার জন্য একটি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল, এবং পরের বছরে প্রথম আফঘান যুদ্ধের প্রাক্কালে সিপাহীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, হিন্দুরা সিন্ধু পার হয়ে ধর্মচ্যুত হতে চায়নি, মুসল-

২২। O'Malley, *op. cit.*, 709 ff; Hunter W. W., The Indian Muselmans (1871), 45-46 99

মানেরা স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে আপত্তি জানিয়েছিল। ১৮৩৯-এ আসামের সাদিয়া অঞ্চলে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বৃটিশ পলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল হোয়াইট বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। কচ্ছ পশ্চিমঘাট অঞ্চলের যে কোলি জাতিদের বিদ্রোহের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তারা ১৮৩৯-এ পুনরায় ভাউ খারে, চিমনজি যাদব এবং নানা দরবারে নামক তিনজন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। পরবর্তীকালেও তাদের বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৮৪০-এ নরসিং দত্তাত্রেয় নামক জনৈক মারাঠী ব্রাহ্মণ ১২৫ জন আরব সৈন্যের সহায়তায় বাদামির দুর্গ দখল করেন, সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করেন এবং রাজা উপাধি গ্রহণ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের সাগর জেলায় কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহী হন। ওই বছরেই রুরকীর নিকটস্থ কুঞ্জার তালুকদার বিজয় সিং রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেন। বেতন না পাওয়ার দরুণ ১৮৪২-এ সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মালিগাঁও ও কোটায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ হয়। ১৮৪৩-এ জব্বলপুর ৬নং মাদ্রাজ ক্যাভালরি অনুরূপ কারণেই বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানসমূহের মধ্যে কোলাপুরের আন্না-সাহেবের বিদ্রোহ ও গাদকারি বিদ্রোহ এবং সুরাটের লবণ বিদ্রোহ উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৩৬ সালে প্রথম শিখযুদ্ধ, খান্দেশের ভীলদের বিদ্রোহ এবং উড়িষ্যার খন্ড উপজাতির বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। খণ্ডদের বিদ্রোহ ১৮৪৮-এর আগে দমন করা সম্ভবপর হয়নি। ১৮৪৮-এর দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধে পাঞ্জাবে পাকাপাকিভাবে বৃটিশ অধিকার কায়েম হয়। ১৮৪৯-এ আসামের নাগারা বিদ্রোহী হয়েছিল, এবং ওই বছরে ও তার পরের বছরে পাঞ্জাবের কয়েকস্থানে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। খান্দেশের সদো এবং চোপদা অঞ্চলে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবিরোধী ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। [৮]

১৮৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের ঠিক পূর্ববর্তী বছরে বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহেব ঘটনা ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্বাধিক কুফলটা সাঁওতালদের উপরেই বর্তেছিল। তারা দলে দলে ভূমিচ্যুত হয়েছিল, তাদের অজ্ঞতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতি পদে পদে প্রবঞ্চিত করা হয়েছিল। 'সাহেবলোকেরা' তাদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করেছিল। এই সমস্ত কারণেই ১৮৫৫র জুন মাসে প্রায় দশ সহস্র সাঁওতাল সিধু এবং কানু দুই ভাই-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়, এবং পরের মাস থেকেই তাদের অভিযান শুরু হয়। তারা ভাগলপুর এবং রাজমহলের মধ্যবর্তী সমস্ত রেলপথ ও ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা

কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘোষণা করে, টাঙ্গি ও বিষাক্ত তীরধনুক নিয়ে দলে দলে চারদিকে হামলা চালায়। প্রত্যেকটি ইংরাজ বাংলোয় আগুন লাগানো হয়, এবং কেউই, এমনকি ভারতীয় হলেও, তাদের বিচারে রেহাই পায়নি। প্রথমে টাঙ্গি দিয়ে পা বিচ্ছিন্ন করে তারা বলেছে চার আনা শোধ, হাত বিচ্ছিন্ন করে আট আনা শোধ, কোমর বিচ্ছিন্ন করে বারো আনা শোধ এবং সর্বশেষে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তারা ষোল আনা শোধ তুলেছিল। অসংখ্য ভীত নরনারী সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ছেড়ে বীরভূম, রাজমহল ও ভাগলপুরের মোটামুটি সুরক্ষিত স্থানগুলিতে আশ্রয় নেয়। গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা এই সাঁওতালদের দমন করা বড় সহজ হয়নি, এমনকি মেজর বারো তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ পরাজিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বহু প্রচেষ্টায় এবং প্রচণ্ড নৃশংসতার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয়।২৩

এতক্ষণ আমরা খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ না করে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে মহাবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বৃটিশবিরোধী সমস্ত কার্যকলাপের কালানুক্রমিক পরিচয় দিলাম। উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে আমরা কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, বৃটিশ শাসনকে কেউই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি, এবং যখনই যে যেখানে বিন্দুমাত্র সুযোগ পেয়েছে ইংরাজবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। এমন একটা দিনও এই শতবর্ষের মধ্যে যায়নি যেদিন কোথাও না কোথাও কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়নি। দ্বিতীয়ত আমরা দেখলাম যে এই সকল বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল, এমনও ঘটনা ঘটেছে, যেমন ওহাবী ধরনের আন্দোলনগুলি, যেগুলির মূলে প্রেরণা হিন্দুবিরোধী ছিল, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সেই সব আন্দোলনসমূহের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, যার ফলে সেই সকল আন্দোলনসমূহ গণভিত্তিক হতে পেরেছিল। ওহাবীদের সম্পর্কে হাণ্টার যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল যে তারা সকল শ্রেণীর সম্পত্তিবানের কাছেই ছিল আতঙ্কস্বরূপ, তারা শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে যেমন লড়েছে, পেশোয়ারের মুসলমান শাসনকর্তার বিরুদ্ধেও ঠিক সেই একইভাবে লড়তে কুণ্ঠিত হয়নি ১৮২৭-৩০ সালে; ১৮৩১-এ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও তারা সমান নিরপেক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদের উপর হামলা চালিয়েছিল।২৪

২৩। Datta K. K., *The Santal Insurrection of 1855-57,* 5 ff

২৪। Hunter, *loc. cit.*

তৃতীয়ত এও লক্ষ্যণীয় যে শতবর্ষব্যাপী বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানসমূহে জমিদার শ্রেণী সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল্। সর্বভারতীয়ত্ববোধ অবশ্য দেখা যায়নি, তার কারণ এদেশের ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, যা জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তুলে ধরতে অপারগ ছিল। শিল্প-নির্ভর ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই সর্বত্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবের এই স্তরে জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই ওই শ্রেণীর মধ্য থেকেই ইংরাজরা কিছু অনুগত প্রভাবশালী প্রজার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যারা সর্ব অবস্থাতেই ইংরাজদের অনুগত ও সাহায্যকারী থাকবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। প্রাক্-মহাবিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহকালীন ঘটনা-গুলিকে বিভিন্ন মহল থেকে লঘুভাবে দেখবার চেষ্টা করা হলেও, ইংরাজ শাসকশক্তি সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদ হিসাবে গ্রহণ করেনি। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক খোলাখুলিই বলেছিলেন "যদি বিস্তৃত গণবিপ্লবের হাত থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজন থাকে, আমার বলা উচিত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যা বহু ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যর্থ হলেও, অন্তত এই মহৎ সুবিধাটুকু দিয়েছে যে তা একটি ধনী ভূসম্পত্তিবান শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যাবা বৃটিশ অধিকারের স্থায়িত্বে গভীর আগ্রহী এবং যাদের প্রজা-শ্রেণীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে।"২৫ চতুর্থত, বিদ্রোহীরা শুধু আবেগের বশবর্তী হয়েই লড়াই-এ নামেনি, সমসাময়িক রাজনীতির গতিবিধির সংবাদ তারা পুরোপুরিই রাখত। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয়ের গুজবেই এখানে কয়েকস্থানে পরপর বিদ্রোহ হয়ে গেছে, যা থেকে বোঝা যায় তারা সকলেই সজাগ থাকত কখন বৃটিশ বেকায়দায় পড়ে দেখার জন্য। পঞ্চমত, এই সকল বিদ্রোহের অনেক ঘটনাকে ডাকাত ও লুঠেরার কাজ বলে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত ডাকাতবাহিনী-গুলি সম্পর্কে লর্ড মিণ্টোর উক্তিই যথেষ্ট : "তারা এমন একটি সন্ত্রাস-বাদের প্রবর্তন করেছিল যা ফরাসী সাধারণতন্ত্রী শক্তির ভিত্তি স্থাপনকারী সন্ত্রাসবাদের মতই নিখুঁত, এবং সত্য বলতে কি, তাদের সর্দারেরা ছিল সম্মানিত ব্যক্তি যারা হাকিম বা রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে অভিহিত হত, এবং সরকারের এমন কোন প্রভাব বা কর্তৃত্ব ছিল না যে জনগণের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র সাহায্য পেতে পারে।"২৬

২৫। Dutt R. P, *India Today*, 211-12.
২৬। O'Malley, *op. cit.*, 308; Mukherjee H. N, *op. cit.*, 39-40

মহাবিদ্রোহ ও অতঃপর (১৮৫৭-১৯০০)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, ইংরাজ অধিকারের এই একশো বছরে, ভারতের সর্বত্রই আগুন জ্বলেছে, সামান্য কারণেই এখানে ওখানে বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহ দেখা গেছে। একশো বছরের বৃটিশ শাসন তার সৃষ্ট কিছু অনুগত প্রজা ও ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের একাংশ ছাড়া আর কারোকে খুশি করতে পারেনি। বৃহত্তর জনসাধারণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানী সর্বক্ষেত্রেই এক-চেটিয়া কারবারের প্রবর্তন করেছিল, যে কোন মূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, স্থানীয় উৎপাদকদের দাম না দিয়ে বা যৎসামান্য দাম দিয়ে পণ্য সংগ্রহ, স্থানীয় বিক্রেতাদের জবরদস্তিমূলকভাবে মাল বিক্রয় করতে না দেওয়া, শুল্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে বিশেষ সুবিধালাভ, এবং সর্বোপরি কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, যা ছিল দস্যুতারই সমার্থক, বৃহত্তর ভারতীয় জনসাধারণকে দারিদ্রের শেষ সীমায় হাজির করেছিল।[১] কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি উৎপীড়নমূলক কৃষিনীতি নিজের স্বার্থে গ্রহণ করেছিল।[২] ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণ রায়তকে নিরাপত্তা দেয়নি। এছাড়া উচ্চহারে কর প্রবর্তন অনেক জমিদারকেও বিপন্ন করেছিল। বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও, মাদ্রাজে তা বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে যে রায়তওয়ারি প্রথা স্থাপন করা হয়েছিল, তা কৃষকের পক্ষে সর্বনাশা হয়েছিল। তাদের ঘাড়ে প্রচণ্ড করের বোঝা চেপেছিল, এবং অনাবৃষ্টিতে ফসল উৎপন্ন না হলেও তারা কর দিতে বাধ্য ছিল। বোম্বাইতেও কোম্পানীর কৃষিনীতি সাফল্যলাভ করেনি। অনুরূপভাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মহলওয়ারি প্রথা কৃষকদের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়েছিল। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের কর হিসাবে দিতে হত। কর আদায়ের পদ্ধতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও বিভীষিকামূলক। কোম্পানীর শাসন পদ্ধতিও ছিল

১। Dutt R. P., *India Today*, 111-12, 194.
২। *History and Culture of the Indian People*, IX, xiii

দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোম্পানীর আমলের গোড়ার দিকের দ্বৈত শাসন যে দেশের কি সর্বনাশ করেছিল সে কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ তাঁর একটি রচনায় কোম্পানীর শাসন সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।৩ পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বা অভিযোগ জানাবার কোন উপায় ছিল না, ভারতবাসীকে সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হত, এবং সর্বোপরি ছিল প্রচণ্ড পক্ষপাত। ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ইংরাজদের হস্তক্ষেপ বহু ক্ষেত্রেই ছিল সহ্যের অতীত।

বস্তুত এই অসহনীয় অবস্থাই অধিকাংশ ভারতবাসীকে বৃটিশবিরোধী করে তুলেছিল, শুধু বৃটিশবিরোধীই নয়, আক্রমণমুখীও বটে, যার পরিচয় আমরা বৃটিশ শাসনের প্রথম শতবর্ষে পেয়েছি। ১৮১৪ সালে মেটকাফ লিখেছিলেন : "ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা সর্বদাই শোচনীয়... যে কোন একটা ঘূর্ণিঝড়ে আমরা উড়ে যেতে পারি"। ১৮২৪ সালে তিনি লিখেছিলেন : "সারা ভারতবর্ষ সব সময়ই আমাদের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছে।"৪ ১৮৪৩ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরো ইংলণ্ডে লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষে তাঁদের টিঁকে থাকতে গেলে হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে এর ওর বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। পূর্বোক্ত কারণগুলি ছাড়াও ১৮৫৭-৫৮র মহাবিদ্রোহের পিছনে আরও কতকগুলি কারণ কাজ করেছে। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ ও সংযোজন নীতি দেশীয় নৃপতিদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অযোধ্যার সংযুক্তি এবং মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লী থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার প্রস্তাব, প্রাক্তন পেশোয়ার ভাতালোপ প্রভৃতি বিষয়, ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি কোন ব্যক্তিবিশেষের রাজ্য বা জমিদারী যাওয়াই নয়, এই সকল দেশীয় নৃপতিদের উপর বহু সহস্র মানুষের রুটি রুজির প্রশ্নও নির্ভরশীল ছিল। এঁদের আশ্রিত পোষ্যের সংখ্যা বড় কম ছিলনা, এঁদের প্রশাসন দপ্তরেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হত, এঁদের সৈন্যবাহিনীতেও বহু লোক নিযুক্ত ছিল। বৃটিশ সরকারের জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপ এই সকল মানুষদেরও ছিন্নমূল আশ্রয়হীন করেছিল। দেশীয় নৃপতিদের আশ্রিত ব্যক্তিদের উপরেও অত্যাচার বড় কম হয়নি। কভারলি জ্যাকসন,

---

৩। Raymond N , *Seir Mutaqherin* (tr.) , III, 190 ff

৪। Hunter W. W , *India of the Queen and Other Essays* (1908) , 54-55.

যিনি অযোধ্যার চীফ কমিশনার পদে ১৮৫৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন, প্রাক্তন নবাবের আশ্রিতবর্গের উপর যে সব অশোভন আচরণ করেছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সরিয়ে তাঁর স্থানে হেনরী লরেন্সকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এ থেকেই অবস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। স্মিথ যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন : "সকল শ্রেণীর অসামরিক জনসাধারণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি রাজকুমার কি জনতা, সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।" জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এমনকি ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁরা এই মহাবিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়, বিক্ষোভ তাঁদের মধ্যেও ছিল, কেননা "সর্বোচ্চ পদ যা কোন ভারতীয় আশা করতে পারত, তা ছিল প্রশাসন বিভাগে ডেপুটি কালেক্টারের পদ, এবং বিচার বিভাগে সদর আমিনের পদ।"

১৮৫৭-৫৮র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আসলে দুটি ধারা, বেসামরিক ও সামরিক। সামরিক ধারাটা হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহ বলে যাকে অভিহিত করা হয়, কিন্তু সেটাই সব নয়। অসামরিক জনগণের বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ, দুটি বিরাট ঘটনা পৃথক উৎস থেকে নির্গত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনসাধারণ যে কতদূর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শাসনভার গ্রহণের আগে ইংলণ্ডে প্রদত্ত একটি সম্বর্ধনা সভায় লর্ড ক্যানিং-এর উক্তির মধ্যে : "আমি শান্তিপূর্ণ কার্যকালের প্রত্যাশী, কিন্তু আমি ভুলতে পারছি না যে ভারতবর্ষের আকাশ, যাকে আপাতদৃষ্টিতে নির্মল বলে মনে হয়, তারই এককোণে একটি মেঘের টুকরো দেখা যেতে পারে, যা হয়ত একটা হাতের মাপের চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে হতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে, এবং পরিণামে তা বিদীর্ণ হয়ে আমাদের ধ্বংস করবে।"[৫] অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর এই আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছিল। অসামরিক জনগণের বিদ্রোহের কারণগুলি আমরা আগেই দেখেছি। সামরিক ব্যক্তিদের, অর্থাৎ সিপাহীদের, বিক্ষুব্ধ হবার কারণগুলিও অত্যন্ত সঙ্গত ছিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক ইংরাজ অফিসার লিখেছিলেন : "ভারতের প্রত্যেকটি বিদ্রোহই, তা বাংলাদেশেই হোক বা অন্যত্র হোক, মূলত আমাদের তরফ থেকেই উৎপন্ন করা হয়েছিল। সচরাচর তাদের সঙ্গে যোগাযোগের দিক থেকে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল, তাদের মনোভাবসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল, সিপাহীদের স্বাস্থ্য ও অপরাপর সুযোগ

৫। Mukherjee H. N. *op. cit.*, 49.

সুবিধার প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি, পক্ষান্তরে যেখানে ইউরোপীয় সৈন্যদের সকল বিষয়ের জন্যই পর্যাপ্ততম যত্ন নেওয়া হয়েছিল, এছাড়া তাদের ধর্মীয় মনোভাব ও সংস্কারগুলির প্রতি অবিজ্ঞজনোচিত আঘাত করা হয়েছিল, তাদের পাওনা-গন্ডা ও অধিকারসমূহের প্রতি অহেতুক হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।" ভদ্রলোকের এই বিনয়বাচক বক্তব্য থেকে এটুকু বুঝতে কোন অসুবিধাই নেই যে সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ ছিল। সার হেনরী লরেন্স খোলাখুলিই বলেছিলেন যে সৈন্য-বাহিনীতে ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিলনা, আর এটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। বাংলার লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর ফ্রেডরিখ হ্যালিডে লিখেছিলেন যে সৈন্যবাহিনী সব সময়ই বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ ছিল, এবং সামান্য সুযোগেই তারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।৬

১৮৫৭র জানুয়ারীতেই এনফিলড রাইফেল এবং গরু ও শূকরের চর্বি-মাখানো টোটার গুজব উঠেছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশের বহরমপুরে ১৯ নং নেটিভ ইনফ্যাণ্ট্রি প্যারেড করতে অস্বীকার করে এবং তার ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা যায়, যার ঢেউ ব্যারাকপুরে এসে পৌঁছায়, এবং ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে ইংরাজ অফিসারকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি ছোড়েন। সংবাদটি পল্লবিত হয়ে মীরাটে আসে ২৪শে এপ্রিল, যেদিন থার্ড ক্যাভালরির ৮৫ জন সৈন্য টোটা ছুঁতে অস্বীকার করে। তাদের কঠোর শাস্তির অনেকের ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ডের, আদেশ প্রদানের পর, রবিবার ১০ই মে তারিখের সন্ধ্যায় সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। তারপরই শুরু হয় ব্যাপক ইউরোপীয় হত্যা। অতঃপর মীরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে, এবং ১১ই মে তারিখে লালকেল্লায় পৌঁছে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে নেতৃত্ব দেবার জন্য অনুরোধ করে। কিছুটা ইতস্তত করার পর বাহাদুর শাহ রাজি হন। তাঁকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৩ই ও ১৪ই মে তারিখে যথাক্রমে ফিরোজপুর ও মুজফফরনগরে বিদ্রোহ ঘটে। আলিগড়ে তার বিস্তৃতি ঘটে ২০শে মে তারিখে, পাঞ্জাবের নওশেরা এবং হোতি মর্দানে ২১ থেকে ২৪শে তারিখে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এটাওয়া ও মৈনপুরীতে ২৩শে মে তারিখে, রুরকীতে ২৫শে মে তারিখে, এটায় ২৭শে মে তারিখে, হোদালে, মথুরায় এবং লক্ষ্ণৌয়ে ৩০শে মে তারিখে বেরিলি এবং শাজাহানপুরে ৩১শে মে তারিখে, মোরাদাবাদ এবং বদায়ুনে ১লা জুন তারিখে, আজমগড় ও সীতাপুরে ৩রা জুন তারিখে, মালাওন, মোহমদি, বারানসী এবং কানপুরে

৬। O'Malley, *op. cit*, 385-92.

৪ঠা জুন তারিখে, ঝাঁসি ও এলাহাবাদে ৬ই জুন তারিখে, ফৈজাবাদে ৭ই জুন তারিখে, দরিয়াবাদ ও ফতেপুরে ৯ই জুন তারিখে, ফতেগড়ে ২৮শে জুন তারিখে, এবং হাতরাসে ১লা জুলাই তারিখে। সর্বত্রই ব্যাপক ইংরাজ হত্যা, জেলখানাগুলি ভেঙে দেওয়া, এবং লুণ্ঠনকার্য চালানো হয়।[৭]

২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদ্রোহীরা দিল্লীতে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। কানপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নানাসাহেব, যিনি ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র। তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তাঁতিয়া টোপি। কানপুরের বাসিন্দা ইংরাজদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ৩০শে জুন তারিখে নানাসাহেব নিজেকে স্বাধীন পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ দ্রুত যমুনা নদীর দক্ষিণে প্রসার লাভ করে। বিদ্রোহীরা ঝাঁসিতে অবস্থিত দুটি বৃটিশ দুর্গ অধিকার করে (৫ই-৮ই জুন) এবং সেখানকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের হত্যা করে। ঝাঁসির বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই অতঃপর এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঝাঁসিতে বিদ্রোহের প্রসারের সংবাদে নওগঙ্গের সিপাহীদের বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৪ই জুন গোয়ালিয়র কণ্টিনজেনটের একটি অংশ বিদ্রোহী হয়ে অনেক ইউরোপীয়কে হত্যা করে। ইন্দোরে হোলকারের অধীনস্থ বাহিনী ১লা জুলাই তারিখে বিদ্রোহী হয়। ধার-এ, সেখানকার রাজার অধীনস্থ আরব ও আফগান ভাড়াটে সৈন্যরা বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহের সামিল হয়। রাজস্থানের নাসিরাবাদ এবং নিমাচে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ২৮শে মে এবং ৩রা জুন তারিখে। বাংলাদেশ, যা মূলত বিদ্রোহের পরিধির বাইরে ছিল, এ বিষয়ে একেবারেই হাত গুটিয়ে বসে ছিলনা। ১৮ই নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রামে সেনাদল বিদ্রোহ করে, এবং ২২শে নভেম্বর ঢাকায় বিদ্রোহ ঘটে। এছাড়া মাদারিগঞ্জ ও জলপাইগুড়িতেও হাঙ্গামা

৭। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের উপর অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। J W Kaye-র *History of the Sepoy War in India* (তিন খণ্ড), G B Malleson-এর *History of the Indian Mutiny* (তিন খণ্ড) এবং T R Holmes-এর *History of Indian Mutiny and of the Disturbances which accompanied it among the Civil Population* গ্রন্থত্রয়ে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন ঘটেছে। Edward Thomson-এর *The Other Side of the Medal* (1927) বিষয়টিকে অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সেনের *Eighteen Fifty Seven*, রমেশচন্দ্র মজুমদারের *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, শশিভূষণ চৌধুরীর *Civil Rebellion in the Indian Mutinies* ও প্রমোদ সেনগুপ্তের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হয়। বিহারে বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল পাটনার নিকটবর্তী দানাপুর, আরা, নোয়াদা, গয়া, রামগড় প্রভৃতি স্থানে। আরার নিকটস্থ জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কুনওয়ার সিং বিদ্রোহী হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের কোলাপুরে ৩১শে জুলাই তারিখে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। এছাড়া আমেদাবাদ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতেও বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ঘটনা ঘটে।

বস্তুতই সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভিক সাফল্য, ইংরাজদের দিল্লী ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ করে রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা এনে দিয়েছিল যে এদেশ থেকে ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদ হয়ে গেছে। কাজেই সিপাহীদের দেখাদেখি অসামরিক জনগণও প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৪ই মে তারিখেই মুজফরনগরে অসামরিক জনগণ বিদ্রোহে মেতে ওঠে এবং দেখতে দেখতে তা সাহারানপুর এবং বুলন্দসরে ছড়িয়ে পড়ে। রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বেরিলী, এবং এখানে অসামরিক জনগণের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খান বাহাদুর খান। অসামরিক বিদ্রোহের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ফরাক্কাবাদ। এখানে বিদ্রোহীরা তফজ্জল হোসেন খাঁকে নবাব বলে ঘোষণা করে এবং বহু ইংরাজ নরনারীকে হত্যা করে। ১৯শে মে তারিখে বিজনোরে মীরাটের ঘটনার কাহিনী প্রবেশ করা মাত্রই ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মোরাদাবাদ, সাজাহানপুর, বদাউন, আলিগড়, মথুরা, আগ্রা, বান্দা, হামিরপুর, ঝাঁসি ও জব্বলপুরে অসামরিক জনগণ সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী হয়েছিল। অযোধ্যায় স্থানীয় তালুকদারদের বিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্ণৌতে ৩রা মে তারিখে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল, ১৪-১৫ তারিখ নাগাদ সেখানে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ চলে আসে, আর ৩১শে মে তারিখ থেকে শুরু হয় অসামরিক জনগণের বিদ্রোহ। লক্ষ্ণৌর ঘটনা ক্রমশ সারা অযোধ্যা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অযোধ্যার বিদ্রোহে শাহগঞ্জের মান সিং নামক জনৈক তালুকদার নেতা হিসাবে নির্বাচিত হন বলে কথিত আছে। বিহারে বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কুনওয়ার সিং, যে কথা আগে বলা হয়েছে, কিন্তু শীঘ্রই তা জনগণের বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গয়া, ছোটনাগপুর, রাঁচি, ডোরাণ্ডা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের প্রসার ঘটে। সিংভূম, ছোটনাগপুর ও পালামৌ জেলার আদিবাসীরাও বিদ্রোহে সামিল হয়। সম্বলপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্র সাই। ইনি ১৮২৭ সাল থেকে বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন এবং ১৮৬২র আগে আত্মসমর্পণ করেননি। ১৮৫৭র ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে মুলতানের খরালরা আহমদ

খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। পূর্ব পাঞ্জাবে হিসার ও হানসি অঞ্চলে অসামরিক জনগণ কিছু ইংরাজ নরনারীকে হত্যা করেছিল।

বিদ্রোহীগণ দিল্লী অধিকার করে বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাহাদুর শাহ কিন্তু বিদ্রোহের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া স্থানীয় নেতাদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা দিয়েছিলেন। দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করার জন্য মীরাট থেকে বৃটিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। হিন্দুল নদীর তীরে সিপাহীরা তাদের প্রথম বাধা দেয়, কিন্তু দুদিন যুদ্ধের পর তারা পরাজিত হয়। এরপর তারা বদলি-কা-সরাই, এবং পরিশেষে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে ইংরাজদের সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু পাঞ্জাব থেকে আগত বাহিনীর সহায়তায় ইংরাজেরা বিদ্রোহীদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন ঘটে। বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে গুলি করে মারা হয়। আমরা আগেই দেখেছি, ৩০শে জুন তারিখে নানাসাহেব নিজেকে স্বাধীন পেশোয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কানপুরে প্রেরিত হয়েছিলেন হ্যাভেলক। নানা সাহেবের সৈনারা পাণ্ডু নদীর তীরে একটি সুবিধাজনক স্থানে ঘাঁটি করেছিল কিন্তু বোকামি করে নদীর সেতুটি উড়িয়ে দেয়নি। ফলে হ্যাভেলক দলবল নিয়ে নানার শক্তিকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হন, এবং কানপুরের সাত মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নিকটে নানার পাঁচ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেন (১৬ই জুলাই)। অতঃপর নানা পলায়ন করেন। ২০শে জুলাই নাইল তাঁর বাহিনী নিয়ে কানপুরে এসে পৌঁছান. এবং ২৫ তারিখে হ্যাভেলক লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে যান, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষভাবে তাঁব সৈন্যবাহিনীব মধ্যে ব্যাপক মড়ক দেখা দেওয়ায় ফিরে আসেন। ফলে লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহীদের হাতেই থেকে যায়। এদিকে কানপুরে তখনও বিদ্রোহের আগুন নেভেনি। নানা সাহেবের অনুচর তাঁতিয়া টোপি তাঁর পক্ষে চার হাজার লোক সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ১৬ই আগস্ট তারিখে তাঁতিয়া হ্যাভেলকের হাতে পরাজিত হয়ে গোয়ালিয়র চলে যান। সেখান থেকে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে তিনি ২৭শে নভেম্বর তারিখের এক যুদ্ধে ইংরাজদের হারিয়ে কানপুর শহর পুনর্দখল করেন। ইংরাজদের এই দুঃসময়ে সার কলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুরে চলে আসেন। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে পুনরায় যুদ্ধ হয়, এবং তাঁতিয়া পরাজিত হয়ে কাল্পিতে চলে যান।

এরপর ইংরাজেরা অযোধ্যা উদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, এবং ১৮৫৮র

ফেব্রুয়ারীতে কলিন ক্যাম্পবেল রীতিমত প্রস্তুত হয়েই লক্ষ্মৌ যাত্রা করেন। ইতিপূর্বেই লক্ষ্মৌর নিকটবর্তী আলমবাগে আউটরাম তাঁর ঘাঁটি রক্ষা করেছিলেন। ২১শে মার্চ তারিখে ইংরাজবাহিনী লক্ষ্মৌ দখল করে নেয়। কিন্তু লক্ষ্মৌ দখল করেই অযোধ্যার বিদ্রোহকে বাগ মানানো যায়নি। লক্ষ্মৌতে ইংরাজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মৌলভী আহমদ উল্লা, যিনি লক্ষ্মৌ-এর পতনের পরেও এখানে ওখানে ইংরাজদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করে চলছিলেন, এবং নিজে হিন্দুস্থানের বাদশা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন (৫ই জুন)। ইতিপূর্বে মে মাসের ৬ তারিখে ক্যাম্পবেল বেরিলীর খান বাহাদুর খানকে পরাস্ত করে রোহিলখণ্ডে বৃটিশ প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর অযোধ্যার তালুকদার ও অপরাপর বিদ্রোহী শক্তিগুলিকে দমন করা হয়। মধ্যভারতে অভিযান চালানো হয়েছিল দুদিক থেকে। সার হিউ রোজের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সেহোর এবং মোউ থেকে ঝাঁসি হয়ে কাল্পির দিকে যাত্রা করেছিল, অপরদিকে হোয়াইটলকের নেতৃত্বে আর একটি বাহিনী জব্বলপুর থেকে বুন্দেলখণ্ড হয়ে বান্দা অভিমুখে পাড়ি দিয়েছিল। হিউ রোজ ঝাঁসি দুর্গ ও শহর আক্রমণ করেন ২২শে মার্চ, কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই তা প্রতিরোধ করে চলেন। ৩১শে মার্চ তারিখে তাঁতিয়া টোপি ঝাঁসির সন্নিকটে উপস্থিত হন, কিন্তু হিউ রোজ সুকৌশলে তাঁকে পরাজিত করেন, এবং তাঁতিয়া পুনরায় কাল্পিতে পালিয়ে যান। ১৮৫৮র ৬ই এপ্রিলের মধ্যে ঝাঁসির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তার দুদিন আগে ৪ঠা এপ্রিল রাত্রে রাণী লক্ষ্মীবাই কিছু অনুচরসহ দুর্গ পরিত্যাগ করে কাল্পিতে তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হন। ইতিমধ্যে হোয়াইটলক কর্তৃক পরাজিত হয়ে বান্দার নবাবও কাল্পিতে চলে আসেন। নানা সাহেবের ভাগ্নে রাও সাহেবও কাল্পিতে ছিলেন। ২২শে মে তারিখে এঁদের সম্মিলিত বাহিনী হিউ রোজ কর্তৃক পরাজিত হয়, এবং রাণী, রাও সাহেব ও তাঁতিয়া গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী গোপালপুরে মিলিত হয়ে গোয়ালিয়র আক্রমণ করে সিন্ধিয়ার বাহিনীকে হস্তগত করবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরা এই কাজে সাফল্যলাভ করেন এবং এই সংবাদ পেয়ে হিউ রোজ ৬ই জুন কাল্পি পরিত্যাগ করে ১৬ই জুন গোয়ালিয়রের মোরোর ক্যাণ্টনমেণ্টে উপস্থিত হন। ওদিকে স্মিথ গোয়ালিয়রের চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কোটা-কে সেরাই নামক স্থানে হাজির হন। ওই দিনই ঝাঁসির রাণী গোয়ালিয়র এবং কোটা-কে-সেরাই-এর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করেন। ১৭ই জুন তারিখে স্মিথের বাহিনীর নিকট রাণীর বাহিনী পরাজিত হয়, এবং রাণী নিজে বীরের মৃত্যু লাভ করেন, যিনি ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী

হিউ রোজের ভাষায় "বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সাহসী সামরিক নেতা।"

পরদিন ১৮ই জুন তারিখে রোজ ও স্মিথ গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করেন, এবং তাঁতিয়া প্রভৃতিরা পলায়ন করেন। ২২শে জুন তারিখে জোওরা-আলিপুরে বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট বাহিনী পরাজিত হয়। তাঁতিয়া অতঃপর চম্বল অতিক্রম করে সেরোঙ্গীর নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেন, এবং সিন্ধিয়ার একজন উৎখাতপ্রাপ্ত সামন্ত মান সিংহের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তাঁতিয়া তখনও গেরিলা কায়দায় তাঁর ইংরাজবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মান সিং লোভে পড়ে তাঁকে ধরিয়ে দেন। ১৮৫৯-এর ১৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁতিয়াকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৮৫৮র ডিসেম্বরের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশে ইংরাজদের কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারের কুনওয়ার সিং দীর্ঘকাল নানাস্থানে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৮র ৯ই মে তারিখে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লড়েছিলেন। তাঁর ভাই অমর সিং আরা দখল করতে ব্যর্থ হবার পর ১৮৫৮র নভেম্বর পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। অযোধ্যার পলাতক বিদ্রোহীরা এবং নানা সাহেব নেপালে পলায়ন করেছিলেন। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর তাঁদের আশ্রয় দিতে রাজি হননি, পক্ষান্তরে তাঁদের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, এবং এইরকম একটি যুদ্ধে শংকরপুরের বিখ্যাত বিদ্রোহী বেনীমাধব মারা যান। নানা সাহেব সম্ভবত নেপালেই থেকে গিয়েছিলেন।

ইংরাজদের বিজয় বড় সহজে হয়নি। "যদি সিন্ধিয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করে", একদা ক্যানিং লিখেছিলেন, "আমাকে কালই পাততাড়ি গুটোতে হবে।" বস্তুত এই মহাবিদ্রোহ, বিখ্যাত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মহাবিপ্লব', বৃটিশ শক্তির কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জস্বরূপ দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহকে দমানোর জন্য ভারতস্থ বৃটিশ শক্তি পর্যাপ্ত ছিলনা। খোদ ইংলণ্ড থেকে প্রভূত রসদের যোগান এসেছিল, সৈন্য এসেছিল পারস্য থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে। সংগঠন ও যান্ত্রিক উৎকর্ষই ইংরাজপক্ষকে বিজয় লাভ করিয়ে দিয়েছিল।[৮] মহাবিদ্রোহের জাতীয় চরিত্রকে এই বলে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে যে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এতে লিপ্ত হয়নি: আসাম, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই বিদ্রোহের বিশেষ কোন ব্যাপ্তি হয়নি। পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন বিপ্লবে সকলেই অংশগ্রহণ করেনা, এই সহজ সত্যটাকে এখানে ভুলে গেলে চলবে না। ডঃ মজুমদার দেখিয়েছেন

৮। Sha ma S R., *The Making of Modern India* (1951), 45-47

যে বাহাদুর শাহ, ঝাঁসির রাণী প্রভৃতিরা পাকেচক্রে বিদ্রোহে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, এবং জাতীয় বীর হিসাবে তাঁদের যে ইমেজ গড়ে তোলা হয়েছে তা শূন্যগর্ভ। এ কথাটাকে মেনে নিলেও, একটা স্থূল সত্যকে অস্বীকার করা যায়না যে একলক্ষ বর্গমাইল এলাকার মানুষ মহাবিদ্রোহে তাদের বৃটিশবিরোধী মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটিয়েছিল একান্ত সঙ্গত-ভাবেই এবং এটা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ছিল। ডঃ চৌধুরী নিঃসন্দেহে প্রতিপাদন করতে পেরেছেন যে মহাবিদ্রোহের ঘটনাবলীর একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ছিল, শুধু আমাদের এটুকু দেখার প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং জনগণের অভ্যুত্থান অভ্রান্তভাবে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, দুটি ধারার একটিকে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়না।৯

ডঃ সেন লিখেছেন যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্রগুলি মোটামুটি পশ্চিম বিহার থেকে পাঞ্জাবের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজও যে অশান্তির লক্ষণ দেখায়নি তা নয়। লক্ষ্যণীয় যে বিদ্রোহের নেতারা যেমন মৌলভী আহমদ উল্লা, ফিরোজ শাহ, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাই, রাও সাহেব, কুনওয়ার সিং প্রভৃতিরা নিজেদের এলাকাতেই যুদ্ধ করেননি, বরং এলাকার বাইরেই যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। মহাবিদ্রোহের ইংরাজ ঐতিহাসিক জি. ডব্লিউ. ফরেস্ট যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছেন যে ঐতিহাসিক ও প্রশাসকদের নিকট ভারতীয় বিদ্রোহের বহু শিক্ষার মধ্যে প্রধানতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুঁসিয়ারি হচ্ছে যে এমন একটি বিপ্লব খুবই সম্ভবপর হয়েছিল যেখানে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র, হিন্দু এবং মুসলমান, তাঁদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল।১০ যতটা জোর দিয়ে বলা হয় যে বাংলাদেশ এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ছিল না, কথাটা অত জোর দিয়ে নিশ্চয়ই বলা চলেনা, কেননা মীরাটের অনেক আগেই বহরমপুর ও ব্যারাক-পুরে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ উঠেছিল। জে. ডব্লিউ কারে, যিনি স্বজাতির পক্ষ টেনেই বিদ্রোহের ইতিহাস লিখেছিলেন, খোলাখুলিই ব্যক্ত করেছেন যে সারা বাংলাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত যদি মুর্শিদাবাদের নবাব মনসুর আলি খান উপযুক্ততম মুহূর্তে ভীরু হয়ে বসে না থাকতেন। মরা হাতী হলেও তার দাম লাখ টাকা, আর জনগণের চোখে তখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব বিশেষ মর্যাদার পাত্র ছিলেন।১১ ১৮৫৭র ২১শে মে তারিখে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "ভারতীয় প্রজাবর্গের হৃদয়ে বৃটিশ সরকারের প্রভাব কত সামান্য তারই

৯। *Civil Rebellion in the Indian Mutinies*, 274-76

১০। *ibid* 282

১১। *History of the Sepoy War in India*, I, 498-99.

বেদনার্ত প্রকাশ ঘটেছে বিগত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায়...এটা আর নিছক বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব...বেঙ্গল আর্মিতে সাম্প্রতিক বিদ্রোহসমূহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি গোড়া থেকেই দেশের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে...ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসী একজনও নেই যে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া অসুবিধাসমূহের পূর্ণ গুরুত্ব অনুভব করেনা, যেগুলি বৃটিশ শাসনের নিছক অস্তিত্বের ফলেই গড়ে উঠেছে, যেগুলি বিদেশী শাসনের অধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।"[১২]

সি. ই. বাকল্যান্ড লিখেছিলেন যে ১৮৫৭ সালে বাংলাদেশে এমন একটিও জেলা ছিলনা যেখানকার প্রশাসন প্রচণ্ডভাবে ভীত না হয়েছিল।[১৩] যাদের উপর নির্ভর করে ইংরাজেরা সে যাত্রায় পার হয়ে গিয়েছিল তারা ছিল ইংরাজ শাসনের দ্বারা সৃষ্ট কিছু অনুগত রাজা মহারাজা ও জমিদার। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধমানের মহারাজা মহাবিদ্রোহের সময় ইংরাজদের প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, যেমন তিনি করেছিলেন আরও দুবছর আগে ১৮৫৫র সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়।[১৪] ক্যানিং খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে মিত্র দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া তাঁরা হালে পানি পেতেন না, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রেওয়া, চিরকারি, রামপুর, পাতিয়ালা, কাশ্মীর প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। লরেন্স কাশ্মীরের গুলাব সিং ও তাঁর উত্তরাধিকারীর উল্লেখ করে বলেছেন যে এটা কোন অতিরঞ্জন নয় যে পাঞ্জাবে তাঁদের অস্তিত্ব মহারাজার দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিদ্রোহীদের নৃশংসতার ও নিষ্ঠুর আচরণের কথা মহাবিদ্রোহের ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বেশ ফলাও করে লিখেছেন। একদা ইংলণ্ডের স্কুলের ছেলেদের কানপুরে বিদ্রোহীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃশংস কার্যাবলীর কথা বেশ খুঁটিয়ে পড়ানো হত, কিন্তু অনুরূপ নৃশংসতা যে সেই ঘটনার পূর্বে বারানসীতে সেনাপতি নাইল করেছিলেন, সে ঘটনা বিলকুল চেপে যাওয়া হয়েছে। ১৮৫৮র ৬ই মে তারিখে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা লিখেছিল যে ইংরাজতরফের নিষ্ঠুরতা বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রতিহিংসাপরায়ণতা যে ইংরাজদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় লর্ড ক্যানিং-এর চিঠিপত্রে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে স্থানীয় ইংরাজেরা উন্মাদ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, দশজনের মধ্যে নয়জন মনে করে যে হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশ

১২। Chaudhuri, *op cit.*, 259
১৩। *Bengal under the Lieutenant Governors*, I, 68
১৪। O'Malley, *District Gazetteers*, Bankura 41, Burdwan 38, Nadia 32 ff.

লোককে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো সম্ভব এবং সেটাই করা উচিত। ক্যানিং কিছুটা নরম নীতির পক্ষপাতী ছিলেন বলে তাঁর উপর সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, এবং এ বিষয়ে তাঁকে চাপ দেওয়া হলে তিনি কিছু কাগজ-পত্র দেখিয়েছিলেন যেখানে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বীভৎস নৃশংসতার প্রমাণ ছিল। সেগুলির প্রকাশ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, "না, আমি বরং যে কোন ধরনের নিন্দাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব, কিন্তু সেগুলিকে প্রকাশ করব না, কেননা তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে আমার দেশবাসীর লজ্জায় মাথা হেঁট হবে।"১৫

১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের সময় বিভিন্ন স্থানে ওহাবীরাও বিদ্রোহীদের সামিল হয়েছিল। এটা বিশেষভাবে ঘটেছিল পাটনা অঞ্চলে। ১৮৪৭ সালে পাঞ্জাব থেকে ওহাবীরা বহিষ্কৃত হবার পর তাদের অন্যতম প্রধান নেতা এনায়েত আলি সোয়াট এবং সিট্টানার শাসকশক্তির সাহায্যে আম্‌বের বৃটিশভক্ত শাসক জাহান্দাদ খানকে আক্রমণ করেন ১৮৫৩ সালে, কিন্তু ইংরাজদের সহায়তায় সে আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়। অতঃপর ইনায়েত নারিঙ্গী নামক একটি বৃটিশ অধিকৃত গ্রাম দখল করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখান থেকেও তাঁকে সরে যেতে হয়। ১৮৫৭র অক্টোবরে এনায়েত শেখজানার সহকারী কমিশনার লেফটন্যাণ্ট হোর্ণের আস্তানা লুণ্ঠন করেন। সিট্টানায় ওহাবীদের খুব শক্ত ঘাঁটি ছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭র মধ্যে ইংরাজেরা কমপক্ষে ষোল বার সিট্টানার ওহাবীদের দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশেষ কোন কাজ হয়নি। পশ্চিমের ওহাবীদের সঙ্গে বিহার ও বাংলাব ওহাবীদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিডনি কটনের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ওহাবীদের দমনের জন্য সিট্টানায় প্রেরিত হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়না। সিডনি কটন অবশ্য সিট্টানা অধিকার করেছিলেন, কিন্তু ওহাবীরা দুর্গমতম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে উপজাতিদের হাতে ওই অঞ্চলের দায়িত্ব তুলে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এই আশ্বাস নেওয়া হয়েছিল যে তারা ওহাবীদের তাদের এলাকায় থাকতে দেবেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওহাবীরা ১৮৬৩র জুলাই মাসে সিট্টানা পুনর্দখল করে। ওই বছরের অক্টোবরে নেভিল চেম্বারলিনের নেতৃত্বে বৃটিশবাহিনী তাদের দমন করতে যায়, কিন্তু ওহাবীদের তীব্র প্রতিরোধের কাছে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জেনারেল গারভোক ৯,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে দু জায়গায় তাদের পরাজিত করেন। এছাড়া

১৫। Dutt R C. *England and India,* 85-88.

বিভিন্ন উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে ইংরাজরা ওহাবীদের বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল। সর্বোপরি বাংলা ও বিহার থেকে পশ্চিমের ওহাবীরা যে সাহায্য পেত তারও উৎস ইংরাজরা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আহমদ উল্লা প্রমুখ সন্দেহভাজন বহু লোককে গ্রেপ্তার করে বিচারে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এই জাতীয় ব্যাপক বিচার ও শাস্তিদান প্রথম শুরু হয় আম্বালায় (১৮৬৪), এবং পরে পাটনায় (১৮৬৫), মালদহে (১৮৭০) ও রাজমহলে (১৮৮০)। যুদ্ধে পরাজয়, ব্যাপক গ্রেপ্তার ও আরও নানা কারণে ওহাবী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৬] ১৮৩১-৩২ সালের বাংলাদেশের ফরাইদি আন্দোলনের যে গণচরিত্র ছিল, তা যেমন মূলত জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম ছিল, পরবর্তী ওহাবী আন্দোলনের চরিত্র তার চেয়ে কিছুটা পৃথক হয়ে পড়েছিল, এবং সেই আন্দোলনে ইসলাম ধর্মটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এর কয়েকটি কারণ অবশ্য ছিল। মেকলের পেনাল কোড মুসলিম ফৌজদারী আইনের স্থান দখল করেছিল, দেওয়ানী বিচারের ক্ষেত্রে শরিয়তের এলাকা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাজকীয় পারসিক ভাষা পরিত্যক্ত হয়েছিল, ঐশ্লামীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছিল, এবং এই কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশবিরোধী জেহাদের প্রবণতা জেগে উঠেছিল।[১৭] সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এই সাংস্কৃতিক সংকটের সমাধান না হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে মুসলিম রাজনীতি অন্য পথে গিয়েছিল। সেটা আপোষে সুবিধালাভের পথ, যার প্রবক্তা ছিলেন সার সৈয়দ আহমদ।

১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের সময় সম্বলপুরে সুরেন্দ্র সাই বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং সেই বিদ্রোহ চলেছিলও দীর্ঘকাল। সুরেন্দ্র সাই এর পূর্বেও দুবার বিদ্রোহ করেছিলেন ১৮২৭-২৯এ এবং ১৮৩৯-৪০এ, কেননা সম্বলপুরের সিংহাসনের উপর তাঁর দাবি বৃটিশ সরকার অগ্রাহ্য করেছিলেন। বিদ্রোহের অপরাধে সুরেন্দ্র সাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা তাঁকে কারামুক্ত করে, এবং অতঃপর ১৮৬২ পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যান।[১৮] ১৮৬২তে তিনি আত্মসমর্পণ করার পরেও তাঁর অনুচরেরা ১৮৬৪ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। ১৮৫৮ সালে মহারাষ্ট্রের পাঁচ মহল

১৬। *History and Culture of the Indian People*, IX, 890 ff

১৭। Hunter, *India of the Queen*, 37-39; *The Indian Musalmans*, 84-100; Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, I, 317-18, 432-35

১৮। *Sambalpur District Gazetteer*, 26-27.

অঞ্চলে রূপ সিং-এর নেতৃত্বে নৈকদরা বিদ্রোহী হয়।১৯ এই বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে কৃষকদের অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকের পাঁচের দশকে। ১৮৫০ সাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। ১৮৫২ সালেই সার জর্জ উইনগেট মহারাষ্ট্রে কৃষকদের দুরবস্থার প্রতি বোম্বাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছিল, ইতিহাসে যা নীল বিদ্রোহ হিসাবে খ্যাত। বিশেষ করে নিম্নবঙ্গ অঞ্চলেই এই বিদ্রোহের বিস্তার ঘটেছিল। ১৮৩০ সাল থেকে এদেশে নীলচাষের সূচনা হয়। গোড়ার দিকে নীলকর সাহেবেরা ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করেই নীলচাষ করাত, কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল যে তা না করিয়ে চাষীকে তাব নিজের জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করতে পারলে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই কোম্পানীর কর্মচাবী বহু ইংরাজ বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ জমির স্বত্ব নিয়ে জমিদার হয়ে বসেছিল, এবং তারা তাদের প্রজাদের ধানচাষের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করেছিল। যদি কৃষক নীলচাষ করতে অস্বীকার কবত তাহলে তার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হত তার তুলনা নেই। উৎপন্ন নীলের জন্য তাদের যে মূল্য দেওয়া হত তাতে উৎপাদনের খরচ উঠত না। দরিদ্র কৃষককে আগাম দাদন দিয়ে তাকে ঋণের চক্রে বেঁধে ফেলা হত, এবং পুরুষানুক্রমেও এই ঋণের বোঝা শোধ হবার কোন উপায় ছিলনা, ফলে কার্যত নীলচাষী নীলকর সাহেবদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। নীলচাষীদের উপর এই উৎপীড়নের মর্মান্তিক বিবরণসমূহ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ওই পত্রিকা দাবি জানিয়েছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া অতি সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। ওই নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদিও তা রেভারেণ্ড জেমস লং-এর নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলকর সাহেবেরা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নীলচাষীরা বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬০-এর জুন মাসে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা লিখেছিল: "যাদের আমরা রায়ত বলি, যাদের আমরা সহ্যশীল হেলট অথবা রুশদেশীয়

১৯। *History and Culture of the Indian People*, IX, 807-8.

সার্কদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে অভ্যস্ত, যাদের আমরা তারা যে জমিতে বাস করে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করি, সেই জমিদার ও নীলকরদের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ থাকা অপ্রতিরোধী শক্তি আজ অবশেষে কাজে নেমেছে, তারা আর শৃংখল পরে না থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যে ইনডিগো-কমিশন বসে সেখানে জেমস লং প্রদত্ত বিবৃতিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দক্ষিণবঙ্গের নীলচাষীরা তাদের বিদ্রোহের সময়ে রীতিমত সংঘবদ্ধ থাকতে পেরেছিল, তারা করদান বন্ধ করেছিল সরকার প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ও বন্দুক কামানকে উপেক্ষা করেই। তৎকালীন বাংলার লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর জে. পি গ্রাণ্ট তাদের সংগঠন এবং যুক্ত ক্রিয়াকলাপের আশংকায় ভীত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, তিনি হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যারা ন্যায়বিচার দাবি করছিল এবং সে দাবি পূর্ণ না হলে তারা যে তা আদায় করে নেবে সে বিষয়েও তারা নিঃসন্দেহ ছিল। শেষ পর্যন্ত এদেশ থেকে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায় কৃত্রিম নীল আবিষ্কার হবার ফলে।২০ কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড় জিনিস তা হচ্ছে নীলচাষীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সফল হয়েছিল। অনেক পরে, ১৮৭৪-এর ২২শে মে তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল, নীল বিদ্রোহই ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল্য যে কি তা বুঝিয়ে দিয়েছিল, বস্তুত বাংলাদেশে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হবার পর এটাই ছিল প্রথম বিপ্লব।

মহাবিদ্রোহের পর থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও যে সকল বিদ্রোহাত্মক ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নওগাঁ জেলার ফুলগুনি অঞ্চলে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়েছিল। তার কারণ ছিল আফিং চাষের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ এবং করবৃদ্ধি। অনুরূপ কারণেই আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়।২১ ১৮৬৩ থেকে পাঞ্জাবে শুরু হয় কুকা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন রাম সিং যাঁর মূল বক্তব্য ছিল বৃটিশ শাসন শিখ আদর্শের পরিপন্থী। ১৮৭১-৭২ সালে পাঞ্জাবের নানাস্থানে এই বিদ্রোহ ব্যাপকতা অর্জন করেছিল যদিও শেষ পর্যন্ত তা দমিত হয়।

২০। Das A. C., *The Indian Ryott* (1881), 295; Buckland, *op. cit.*, passim. *Calcutta Review*, 1859-61. ১৯৬০-এ নীল বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকটি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেগুলির মধ্যে প্রমোদ সেনগুপ্ত ও আবদুল্লা রসুলের গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২১। Dutt K. N., *Landmarks of the Freedom Struggle in Assam* (1958), 25 ff

রাম সিংকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।২২ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভগীরথের নেতৃত্বে পুনরায় সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল, বিদ্রোহীদের দাবি ছিল তারা যেন খাজনাবিহীন জমির অধিকারী হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনা জেলার কৃষকেরা করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে ওই একই কারণে আসামের সমভূমিতে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। ১৮৯৫ থেকে শুরু হয় বিখ্যাত মুণ্ডা বিদ্রোহ যা বিরসা-বিদ্রোহ নামেও পরিচিত। বিরসা নামক জনৈক শিক্ষিত মুণ্ডার নেতৃত্বে ছোটনাগপুরের উপজাতিরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, এবং চরিত্রের দিক থেকে তা ছিল পূর্বতন সাঁওতাল বিদ্রোহের অনুরূপ। এদের দাবি ছিল ভূমি ও অরণ্যে এদের প্রাক্তন অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এদের উপর কোনপ্রকার বিদেশী জুলুম থাকবে না। ১৮৯৬ সালে বিরসাকে আকস্মিক গ্রেপ্তার করে দু'বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ছাড়া পেয়ে বিরসা পুনরায় সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিবসা বিদ্রোহ চলে। এই বিদ্রোহ অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে দমন করা হয়। বিরসা বন্দী হন. কিন্তু সেই অবস্থাতেই কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিরসাব সাড়ে চারশো অনুচরকে ইংরাজেরা হত্যা করে।২৩

উপরি-উক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদেব জেনে রাখা প্রয়োজন। মহাবিদ্রোহের পর লণ্ডনের টাইমস পত্রিকার ভারতস্থ সাংবাদিক জি. ডব্লিউ রাসেল লিখেছিলেন যে ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরাজদের সম্পর্ক অহিনকুলের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে. এবং তা স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। ইংবাজ সবকারও এটা বুঝেছিল, এবং সেই কারণে কয়েকটি পাকা বাবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সুযোগ ও প্রলোভনের টোপ দিয়ে তাদের মধ্যে ইংবাজ শাসনের প্রতি অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জমিদাব শ্রেণীব মধ্যেও ওই একই রকম মনোভাবের ভিত্তি গড়ে তোলা; তৃতীয়টি হচ্ছে শিক্ষিত ভারতবাসীকে সম্মান ও খেতাব বিতরণ করে তারা যাতে বৃটিশ শাসনেব গুণগানে পঞ্চমুখ হয় সে ব্যবস্থা করা. চতুর্থটি হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেওয়া; পঞ্চমটি হচ্ছে. ধর্মনিবপেক্ষতার দোহাই দিয়ে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা ও পুষ্ট কবা; এবং ষষ্ঠটি হচ্ছে. সৈন্যবাহিনীতে পক্ষপাতমূলক নিয়োগ, এবং কোন কোন জাতিকে মার্শাল রেস বা বীরের জাতি আখ্যা দিয়ে বৃহত্তর

২২। *History and Culture of the Indian People*, IX,901 4
২৩। • Dutt K K, *op. cit*, O'Malley, *op. cit.*, 690 ff.

জনজীবনের সঙ্গ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।২৪ সব কটি পন্থাই পরবর্তী ইতিহাসে রীতিমত সফল হয়েছিল। রাজামহারাজা ও জমিদারদের জনবিরোধী ভূমিকার পুরো সুযোগ বৃটিশ সরকার নিয়েছিল, এবং বৃটিশ চলে যাবার পরেও ভারতবর্ষের অগ্রগতি এদের দ্বারা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যবিত্তের শিক্ষাভিমানকে উৎসাহ দিয়ে বৃটিশ সরকার যে ভদ্রলোকের রাজনীতি আমদানী করেছিল তার দ্বারা বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হয়েছিল, যার ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেও সেখানকার শাসকশক্তির সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবনের সংযোগ ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানী দেবার ফলে কি হয়েছিল, তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তথাকথিত ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, যা আসলে ধর্মের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলির পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল, তার উত্তরাধিকার আজও রেখে গেছে, স্বাধীন ভারতে অনুষ্ঠিত হরিজন হত্যার ঘটনাবলীতে এবং আরও বহু বিষয়ে, আর তথাকথিত মার্শাল রেসের ধাপ্পা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এক নিদারুণ বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

উপরে আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেছি, সেগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কৃষকেরা বার বার বিদ্রোহী হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে ইংরাজ সরকারের কৃষিনীতি ভারতের কৃষকসমাজের সর্বনাশ করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার শ্রেণীর হাতে কৃষক নিপীড়নের প্রচুর ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনার কৃষকেরা কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করে এবং তা সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সরকারী তরফ থেকে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে, এবং তা পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে ফরাইদি বা ওহাবী আন্দোলনের কিছু সম্পর্ক ছিল। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে : ব-দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলিতে, মূল বাংলার জেলাগুলির মতই, কৃষক বিদ্রোহগুলি মুসলিম কেন্দ্রিক ছিল, ফলে জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধকে 'ফরাইদি' ছাপ দিয়ে সেগুলির উপর রাজনীতির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেফটন্যান্ট গভর্ণর বিশ্বাস করেন যে ফরাইদি মতবাদে ধর্মগত বিষয়ের চেয়ে কৃষিগত সমস্যাগুলি বেশি প্রকাশ পেয়েছে কৃষকশ্রেণী তাদের সঙ্গে জুটেছে, ফলে রাজনৈতিক উদ্বেগেরও কারণ আছে।২৫ ১৮৭২-৭৩ সালে ঢাকা ও বাখর-

---

২৪। *Modern Review,* July and September (1930), January and February (1931)

২৫। Das A C, *op. cit*, 564-66

গঞ্জ জেলায় কৃষকেরা আন্দোলনে নেমেছিল। ১৮৭৫ সালে রিচার্ড টেম্পল লিখেছিলেন : পূব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কৃষকেরা নানাভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তারা জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করছে, এবং এর ফলে সশস্ত্র সংঘাতও হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল যার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ অ্যাক্ট প্রণীত হয়েছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গঠিত দুর্ভিক্ষ কমিশন ওই আইনকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত করার সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু তা কাজে পরিণত হয়নি। বাংলাদেশে যে সব কৃষক আন্দোলন হচ্ছিল সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৮৮৫র বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টের কিছু সংশোধন করতে বাধ্য হয়।২৬

ইতিমধ্যেই বৃটিশ শাসনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে একটি শ্রমিক শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। আমরা গোড়াতেই বলেছি যে দেশীয় গ্রাম শিল্পগুলির ধ্বংসের মধ্যেই ইংরাজ পেয়েছিল সুদূরপ্রসারী সাফল্যের সন্ধান। এর ফলে ভারতীয় জনসমাজের একটা বড় অংশ তাদের বংশানুক্রমিক পেশা থেকে চ্যুত হয়ে, হয় অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে, না হয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, না হয় শহরে এসে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হয়েছে। এটা শুধু কারিগরশ্রেণী থেকেই ঘটেনি, কৃষকশ্রেণী থেকেও এইভাবে বহু লোক ভূমি থেকে উৎখাত প্রাপ্ত হয়ে, অথবা জমিদারের অত্যাচারের ফলে অথবা গ্রামে অন্নসংস্থান না হওয়ার দরুণ, শহরগুলিতে এসে ভীড় করেছে, এবং তাদেরও একটা অংশ শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটিতে এই রকম একটি সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় মেলে যেখানে দেখানো হয়েছে যে একজন নিরন্ন চাষী জমিদার ও গ্রামসমাজের অত্যাচারে চোদ্দপুরুষের ভিটের মায়া ত্যাগ করে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যাচ্ছে, যদিও সে জানে সেখানকার অবস্থা সুস্থ জীবনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়, সেখানে তার মেয়ের ইজ্জত থাকবে না। এই পদ্ধতি আজও চলছে, গ্রামগুলিতে আজও কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই যে কারণে দলে দলে লোক প্রতি বছর শহরে আসছে, দু'চারজন শিল্পক্ষেত্রে ঠাঁই করে নিতে পারলেও অধিকাংশই জনারণ্যে হারিয়ে যাচ্ছে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছে, কেউ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হচ্ছে, শহরে আবার তাদের বংশধর বাড়ছে ফুটপাতে যাদের থেকে গড়ে উঠছে একটা ভিন্ন ধরনের লুম্পেন শ্রেণী। ১৮৫৩ সালে বোম্বাইতে কাপড়ের কল

২৬। Buckland *op. cit.*, I 544-48

তৈরী হয়, তারও আগে বাংলায় ১৮২৩ সালে। ১৮৮০ সাল নাগাদ দেখা গেছে যে কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৮টিতে, এবং শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪,০০০-এ। অবশ্য এদেশে কারখানা ও শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি হয়েছে ধীরে ধীরে, এবং এই বৃদ্ধির গতি আজও মন্থর। আজও ভারতীয় জনসমাজে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, এই কারণে শ্রমিক আন্দোলন এখনও পর্যন্ত খুব সবল নয়। ভারতবর্ষে প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট ঘটেছিল নাগপুরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে পঁচিশটি শ্রমিক ধর্মঘটের কথা জানা গেছে। শ্রমিক-শ্রেণীর প্রথম সংগঠন, যা মিল হ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত গড়ে তোলেন বোম্বাই-এর জনৈক সম্পাদক, যাঁর নাম এন এম লোখাণ্ডে। অবশ্য তারও পূর্বে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৬ সালে শ্রমিক আন্দোলনের পত্তন করেন। এদেশে তৎকালীন কারখানাসমূহে পুরুষ, নারী ও শিশু শ্রমিকদের ১২, ১৬, ১৮ এমনকি ২৩ ঘণ্টা পর্যন্ত পশুর মত কাজ করানো হত। রবিবার বা অন্য কোন ছুটি ছিলনা। ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই অমানবিক বর্বরতা ভারতবর্ষে নির্বিবাদে চালু ছিল।

ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেও ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকগুলিতে বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়েরা কর্মক্ষেত্রে ইংরাজদের সঙ্গে সমান সুযোগ পাচ্ছিল না, এটা খুব বড় কথা নয়, আসলে তাঁদের শিক্ষিত চেতনাকে বেশি দিন ধাপ্পা দেওয়া সম্ভব ছিলনা। রমেশচন্দ্র দত্তের মত উচ্চপদস্থ প্রশাসক ও অর্থনীতিবিদ একথা মানতে রাজি ছিলেন না যে ভারতবাসীর দুর্গতির মূলে তাদের অতিরিক্ত জনসংখ্যা। তাঁরা সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজ সরকার নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের ইংরাজও কোন গুরুতর অপরাধ করলে, এমনকি ভারতবাসীকে হত্যা করলেও, কোন বড় রকমের শাস্তি তাদের দেওয়া হত না। আইনের চোখে এই বৈষম্য শিক্ষিত ভারতবাসী সহজে হজম করতে পারেনি। ইলবার্ট বিলের শোচনীয় পরিণতি (যে আইন অনুযায়ী কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গের বিচার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল) ভারতবাসী ভোলেনি। লর্ড রিপণ ওই বিলের সমর্থক ছিলেন বলে কলকাতার ইংরাজেরা তাঁকে জোর করে জাহাজে তুলে যে এদেশ থেকে তাড়াতে চেয়েছিল সে কাহিনী ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন। বাকল্যাণ্ড লিখেছেন যে এর পিছনে খোদ লেফটন্যাণ্ট গভর্ণরের সমর্থন ছিল তিনিও ছিলেন রিপণবিরোধী এই চক্রান্তের শরিক।[২৭] ১৮৭৮ সালের কুখ্যাত

২৫। *ibid* II 787 ff.

ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টও শিক্ষিত ভারতবাসী ভোলেনি, যে আইনের দ্বারা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে বৃটিশ শাসনের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮৭৭-এর ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধিলাভের অনুষ্ঠানের রাজকীয় আড়ম্বর ও অর্থব্যয় এবং ঐ বছরেই ভয়াল দুর্ভিক্ষে ষাট লক্ষ লোকের মৃত্যু এই দুই দৃশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে শিক্ষিত ভারতবাসী সঙ্গতভাবেই অপারগ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধারা

পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা ১৭৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মুখ্যত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলির কথাই উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যে এই সব বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ মূলত ক্ষমতাচ্যুত রাজা-বাদশা, জমিদার, উৎপীড়িত উপজাতি সম্প্রদায়, এবং নিরন্ন কৃষক শ্রেণীর দ্বারাই ঘটেছে। কিন্তু এরা ছাড়াও আরও একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব বৃটিশ শাসনের ফলে হয়েছিল, এবং তা হচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা শুধুমাত্র ইংরাজী শিখেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই শিক্ষার দ্বারা তারা সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাসমূহের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিল। এঁদের চোখের সামনে জ্ঞানের যে নতুন জগৎ খুলে গিয়েছিল, সমালোচনামূলক যে চিন্তাপদ্ধতি এঁদের আয়ত্তে এসেছিল, তার দ্বারা এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে সব দোষটা ইংরাজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়না, আত্মসমালোচনা প্রয়োজন, এবং আরও প্রয়োজন সাবেকি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করা। এঁরা বৃটিশ শাসনকে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলে মনে করতে পারেন নি। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটি জাতীয়তার বন্ধনে বাঁধার জন্য বৃটিশ শাসন বর্তমান থাকা প্রয়োজন, এবং স্বাধীনতার জন্য যদি আদৌ কোন সংগ্রাম করতে হয় তা করতে হবে নিয়মতান্ত্রিক পথে। এঁদের দাবি ছিল, ধীরে ধীরে সুবিধা আদায় করা, ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য তৈরী হওয়া, শাসনকার্যে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই ধারাটিই উত্তরকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠী মূলত এই শ্রেণী থেকেই এসেছে। কিন্তু এই ধারা প্রবর্তিত রাজনীতির একটি বিশেষ ত্রুটি ছিল এই যে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন সংযোগ ছিলনা, এমন কি আজও তা নেই। পক্ষান্তরে প্রথম ধারাটি, যা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলির দ্বারা চিহ্নিত, ব্যাপকভাবে গণভিত্তিক হলেও, শিক্ষিত ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করায়, প্রত্যাশিত সাফল্য নিয়ে আসেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দুটি ধারার মিলন কদাচিত হয়েছে, কিন্তু যখনই তা হয়েছে

তখনই আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন এসেছে, যা আমরা পরে দেখব।

সংবাদপত্রই শিক্ষিত মানসের দর্পণ এবং সেই হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আশ্রয়ী রাজনৈতিক চেতনার মূল খুঁজতে হবে সংবাদপত্রের ইতিহাসে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হতে শুরু করে। হিকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন, এবং তাঁর পত্রিকায় পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রীতিমত আক্রমণ চালাতেন, এবং সেই কারণেই তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৭৮০ থেকে ১৭৯৩-এর মধ্যে কলকাতা থেকে আরও ছয়টি সংবাদপত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। মাদ্রাজের প্রথম সংবাদপত্র উইকলি মাদ্রাজ কুরিয়ের প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে, এবং আরও দুটি ১৭৯৫-এ। বোম্বে হেরাল্ড-এর প্রথম প্রকাশ ১৭৮৯তে, গুজরাতী-বোম্বে-সমাচারের প্রকাশকাল ১৮২২। বাংলা সংবাদপত্র ১৮১৮ সালের আগে প্রকাশিত হয়নি। সীমাবদ্ধ হলেও গোড়ার দিকে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা ছিল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরাজেরা মনে করতেন যে স্বাধীন সংবাদপত্র রাজদ্রোহ এবং বিক্ষোভের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।[১] কিন্তু ১৮১২ সাল থেকেই সরকার অন্যরকম চিন্তা করতে শুরু করেছিল। পরাধীন দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র বিপজ্জনক, মানরো-কথিত এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই[২] ১৮২৩-এর ১৪ই মার্চ কুখ্যাত প্রেস অর্ডিনান্স জারি করা হয়, যাতে বলা হয় যে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ও যথাযোগ্য লাইসেন্স ব্যতীত সংবাদপত্রের প্রকাশ চলবে না। এই নতুন প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় যিনি এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এবং পরে সপারিষদ রাজার নিকট আপীল করেন। এই কাজে রামমোহনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, এবং গৌরীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি, তথাপি এই ঘটনাটিই এদেশে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ।[৩] ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের জুরী অ্যাক্টের বিরুদ্ধেও রামমোহন আন্দোলন করেছিলেন যে আইন অনুযায়ী কোন খৃষ্টানের বিরুদ্ধেই মামলায় হিন্দু অথবা মুসলিম জুরী বসানো চলত না, অথচ বিপরীত ক্ষেত্রে তা চলত। ভারতবাসীদের হাতে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজ দেবার দাবিও রামমোহন তুলেছিলেন। কথিত আছে ১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্টের কয়েকটি কল্যাণকর

১। O'Malley, *Modern India and the West*, (1941) 197

২। Gleig, *Life of Munro*, II, (1930) 106-7

৩। O'Malley, *op cit.*, 197-98.

ধারার পিছনে রামমোহনের প্রভাব ছিল। ইংলণ্ডে গিয়েও রামমোহন ভারতের সমস্যা সম্পর্কে ইংরাজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পার্লামেণ্টারী কমিটির নিকট তিনি যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন, তা ভারতীয় সমস্যাসমূহের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত। ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রী নেতা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

বস্তুত রাজা রামমোহনের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা অত্যন্ত তীব্র ছিল, যদিও ভারতবাসীকে আধুনিক করার প্রশ্নে তাঁকে বৃটিশ শাসনকে মেনে নিতে হয়েছিল। পৃথিবীর যেখানেই জনগণ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে রামমোহনের সমর্থন তাদের উপরেই গিয়ে পড়েছে। ১৮২১ সালে হোলি অ্যালায়েন্সের দ্বারা যখন নেপলসের জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল রামমোহন দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধু বাকিংহামকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যার শেষ লাইন ছিল : "স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরাচারের বন্ধুরা আখেরে কোনদিন সাফল্যলাভ করেনি এবং করবে না।" স্পেনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রামমোহন আনন্দে কলকাতার টাউন হলে একটি ভোজসভা দিয়েছিলেন। বিলাত যাত্রার সময় পা ভাঙ্গা অবস্থাতেই বিপ্লবের পতাকাবাহী ফরাসী জাহাজ দেখে সেই পতাকাকে তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন।[৪] হিন্দু কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর কর্মকাল ১৮২৭ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে তাঁর ছাত্রদের দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ১৮২৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতাকেই প্রথম দেশাত্মমূলক কবিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর ছিল অখণ্ড অনুরাগ। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ঘটনাকে অভিনন্দিত করার জন্য ডিরোজিও টাউন হলে ১০ই তারিখে দুশো লোকের একটি জনসভা করেছিলেন। ঐ বছরেরই বড়দিনের দিন অক্টোর্লনি মনুমেণ্টের উপর তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ অনেকগুলি দেশাত্মমূলক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ১৮৩০ সালের অনুরূপ বিপ্লব ভারতবর্ষেও ঘটানো যাবে। এর প্রমাণ মেলে ১৮৪৩ সালের বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে।[৫]

৪। *Works of Rammohun Roy*, XV-XIX

৫। ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের জন্য দ্রষ্টব্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত *Studies in the Bengal Renaissance*, (1958) 16-32

১৮৩৫-এর ৫ই জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট নাগরিকেরা একটি সভা করে ১৮২৩-এর প্রেস অর্ডিন্যান্স এবং ১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্টের কয়েকটি ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই বছরেই মেটকাফ অবশ্য প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নেন, যদিও এই কাজটা বিলাতের কর্তারা পছন্দ করেন নি, এবং তার জন্য মেটকাফের প্রমোশনও আটকে গিয়েছিল। এর পর থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসে ল্যান্ড হোলডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সমিতি গঠিত হয়। যদিও মুখ্যত এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের সংরক্ষণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও কালক্রমে তা ওইটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি।৬ প্রত্যেক জেলাতেই এই প্রতিষ্ঠানের শাখা বিস্তৃত করার চেষ্টা হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকেও এই সমিতির কিছু বক্তব্য ছিল। ১৮৩৯-এর ৩০শে নভেম্বর জমিদার-সমিতির একটি সভায় মিঃ টুর্টোন ভারতবাসীর জন্য বৃটিশ নাগরিক অধিকার দাবি করেছিলেন, ভারতীয়রা বৃটিশের প্রজা হয়ে থাকুক এটা তাঁদের অভিপ্রেত ছিলনা। টুর্টোন তাঁর বক্তৃতায় প্রাচীন রোমের নজীর তুলে দেখিয়েছিলেন যে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিকৃত দেশগুলিতে যেমন রোমক নাগরিক অধিকারের বিস্তৃতি ঘটত, এবং তা যেমন রোম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষেও অনুকূল ছিল, ভারতবর্ষেও সেই নীতি আচরিত হওয়া উচিত।৭ ইংলণ্ডে রাজা রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতীয় বিষয়ে ইংলণ্ডের জনমতকে ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৯-এর জুলাই-এ বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪১ থেকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাডভোকেট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশও শুরু করেন। ইংলণ্ডস্থিত এই সংস্থার সঙ্গে জমিদার-সমিতি সহযোগিতা করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার ইংলণ্ডে যান সেখানে তিনি প্রভূত সমাদর পেয়েছিলেন। এডিনবরায় তাঁকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল যেখানে এই ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছিল যে ভারতবাসীর সঙ্গে যেন ইংরাজের উৎপীড়িত-উৎপীড়কের সম্পর্ক না থাকে।৮ ভারতের হয়ে ইংলণ্ডে প্রচার-কার্য চালানোর জন্য জমিদার-সমিতি মিঃ টমসন নামক দ্বারকানাথের এক বন্ধুকে বেতনভূক এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। টমসনের বক্তৃতাসমূহ তরুণ শিক্ষিত বাঙালীদের যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করে, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে

৬। Mitra J., *Raja Rajendralal Mitra's Speeches,* (1892) 25.
৭। Majumdar B., *History of Political Thought,* (1934) 164
৮। Mitra K., *Memoirs of Dwarakanath Tagore,* (1870) 88 ff

১৮৪৩-এর ২০শে এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ছিল বৃটিশ ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখা, এবং শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৮৪৩ থেকে বাংলাদেশে দুটি সংগঠন গঠিত হয়েছে—জমিদার-সমিতি এবং বৃটিশ ভারত সমিতি। যেহেতু দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল উপরতলার মানুষদের, সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনটিই জনপ্রিয় হয়নি। এমনকি শিক্ষিত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খার সঙ্গেও এই দুটি প্রতিষ্ঠান সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারছিল না। ১৮৪৩-এ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টাউন হলের একটি সমাবেশে দাবি করে যে সিভিল সার্ভিস ইংরেজদেরই একচেটিয়া করে রাখা চলবে না। প্রস্তাবটি এনেছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে আরও নানা ঘটনায় শিক্ষিত বাঙালী আহত হয়েছিল। ১৮৪৯-এ সরকারের ল-মেম্বার মিঃ বেথুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতসমূহের এলাকা সম্প্রসারিত করার জন্য চারটি বিল এনেছিলেন যার ফলে দূরবর্তী স্থানের লোকেরা ন্যায় বিচার পেতে পারে। বাংলাদেশের ইংরাজ সমাজ কিন্তু এই কল্যাণকর বিলগুলির বিরোধিতা করেছিল সেগুলিকে ব্ল্যাক অ্যাক্ট নাম দিয়ে, এবং তাদের চাপে শেষ পর্যন্ত বিলগুলি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। এই ঘটনাটিতে শিক্ষিত বাঙালী রীতিমত আহত হয়েছিল এবং উপলব্ধি করেছিল যে একটি মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা দরকার যা সংঘবদ্ধ ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উপরি-উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানকে এক করে ১৮৫১র ৩১শে অক্টোবর তারিখে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন করা হয়। গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। মাদ্রাজে এর একটি শাখার প্রতিষ্ঠা হয় যদিও কিছুকাল পরেই তা মূল সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বোম্বে ও পুণাতেও গড়ে ওঠে।

১৮৫২ সালে যখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে নতুন চার্টার অ্যাক্ট বিবেচনাধীন ছিল, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সেখানে একটি স্মারকলিপি দাখিল করেছিল যেখানে এমন একটি আইনসভার দাবি করা হয়েছিল যা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিহার করবে। ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি আইনসভার দাবি করা হয়েছিল যেখানে অন্তত তিনজন জনপ্রতিনিধি থাকবে, এবং প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সি থেকে একজন করে মনোনীত

ব্যক্তি থাকবে।[৯] ১৮৫৩র চার্টার অ্যাক্টে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে এই প্রতিষ্ঠান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি, আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রভৃতি দাবি করেছিল। ১৮৫৩ সালেই একটি জনসভায় রামগোপাল ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানান। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এর উপরেও দাবি করে যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতেই গ্রহণ করা হোক। এছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জেলায় সংগঠন গড়ে তুলেছিল, বাংলা ভাষায় সরকারী আইনসমূহ ও ঘোষণাপত্রাদির অনুবাদ করে প্রচার করেছিল, এবং বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কার দাবি করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কাজ করেছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'রিফর্মার নামক একটি ইংরাজী পত্রিকা চালু করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল ১৮৫৩ থেকেই। আমরা আগে দেখেছি যে এই বিশেষ পত্রিকাটি এবং তার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হননি। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠাব আন্দোলন করেছিল আইনানুমোদিত পন্থায়, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও সত্য যে নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা কোন ঔৎসুক্যই প্রকাশ করেন নি। সমসাময়িক গণঅভ্যুত্থানগুলির ক্ষেত্রে, যেগুলির কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, তাঁরা ছিলেন শুধু যে নীরব দর্শক তাই নয়, বহুলাংশেই বৃটিশ নীতির সমর্থক।

গোড়ার দিকে শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তাভাবনা কিছু সুবিধালাভের, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রে প্রবেশ করার, উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে তা স্বায়ত্তশাসনের আগ্রহে পর্যবসিত হয়। লণ্ডনে বোম্বাই-এর দাদাভাই নৌরজী এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন যার নাম দেওয়া হয় 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের লণ্ডনস্থ বাসভবনে এই সংস্থার অধিবেশন বসে। এক বছর পরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা ভারত ফেরৎ ইংরাজ কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত

৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য Majumdar B, *History of Political Thought*, 474-489 দ্রষ্টব্য।

আর একটি সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়ে ‘ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন’ নাম পরিগ্রহ করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখে লন্ডনে উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ ভাষণে ভারতের জন্য একটি দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে ভারতবর্ষে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা ও একটি সেনেট গঠিত হোক, এবং সেই সঙ্গে তাদের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রয়োজন বোধ করলে নাকচ করার অধিকার গভর্ণর-জেনারেল ও সম্রাটকে দেওয়া হোক।১০ ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও ১৮৬৭ সালে ইংলন্ডে আরও একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে রামমোহনের জীবনীকার মেরী কার্পেন্টারের প্রচেষ্টায়, যার নাম ন্যাশানাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।১১ এই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু পূর্বোক্তটির মত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ তার শাখা খুলেছিল, এবং ১৮৭১-এর মধ্যে তার সদস্যসংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করেছিল।১২ ১৮৭২-এ আনন্দমোহন বসু লন্ডনে ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করেন।১৩ কিন্তু ব্যাং-এর ছাতার মত স্বদেশে ও বিদেশে একই ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সেগুলির দ্বারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারেনি, তার কারণ একটি কোন নতুন ভাব বা আদর্শের প্রেরণা পিছনে না থাকলে ‘গণতন্ত্র’, ‘স্বায়ত্ত-শাসন’, ‘প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা’ ইত্যাদি কয়েকটি কেতাবী ধারণার উপর নির্ভর করে কিছুই করা যায় না। সে যুগে একটি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদই প্রেরণাস্বরূপ কাজ করতে পারত, দেশের অভ্যন্তরে তা গড়ে ওঠার সূত্র-পাতও হয়েছিল, কিন্তু তখনও তা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। ১৮৫২ সালে বোম্বাইতে বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণেই তা কিছুকালের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে গিয়ে-ছিল। পরবর্তীকালে ওই প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি।১৪ ১৮৬৭ সালে পুণা অ্যাসোসিয়েশন নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, ১৮৭০-এ যার নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় ‘পুণা সর্বজনিক সভা’। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে গণভিত্তিক হতে পেরেছিল, যে কথা আমরা পরে বলব।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পাল খুব জোরের

১০। Sanyal R, *A General Biography of Bengal Celebrities,* (1889) 41.
১১। *Modern Review* (Dec 1948), 463.
১২। Masani R. P., *Dadabhai Naoroji,* (1939) 224.
১৩। Sarkar H. C, *Anandamohan Bose,* (1910) 35.
১৪। Mazumdar A. C, *Indian National Evolution* (1917), 6,

সঙ্গে হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিলেন,১৫ কিন্তু এতখানি অগ্রসর হতে তৎকালীন কোন রাজনৈতিক সংস্থাই রাজি ছিলনা, ফলে অধিকতর সাহসীরা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জনগণকে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে "ইণ্ডিয়া লীগ" একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন, যা কালক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।১৬ ১৮৭৬-এর ২৬শে জুলাই তারিখে অ্যালবার্ট হলে সুরেন্দ্রনাথ ৭০০ লোকের উপস্থিতিতে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশে জনমত গড়ে তোলা, সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ভারতীয় জাতিসমূহের ঐক্য বিধান করা, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি আনয়ন এবং জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে তাঁদের সঙ্গে পাওয়া। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়ঃসীমা নিয়ে সর্বপ্রথম বিক্ষোভ করে। এই বিক্ষোভের পিছনে উক্ত প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় সমর্থন আদায় করেছিল। সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল সকল বিষয়েই সর্বভারতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৭৭-এর ২৬শে মে তারিখ থেকে তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ শুরু করেন। ভারতের সর্বত্রই তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনুরূপ সংস্থা গঠন করেন। সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বভারতীয় মতামত গড়ে উঠেছিল যার ফলে জাতীয়তাবাদী সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিত্তি এদেশে স্থাপিত হয়েছিল, এবং এটাই ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সবচেয়ে বড় অবদান।১৭ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী আন্দোলন ছিল ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে, ১৮৭৮-এ রচিত যে আইনে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লেখা নিষিদ্ধ হয়েছিল। অস্ত্র আইন ও লাইসেন্স আইনের বিরুদ্ধেও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন করেছিল। এছাড়া পত্রমারফৎ পার্লামেণ্টে আবেদন পাঠানোর পরিবর্তে এই প্রতিষ্ঠান সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে, এবং মহারাণী স্বর্ণকুমারীর খরচে লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন যেখানে তিনি পার্লামেণ্টের বহু সদস্যকে ভারতের সমস্যাবলী আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর এই চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল।১৮

১৫। Ghosh H. P., *Congress* (Beng.), 5.
১৬। Bagal J. C, *History of Indian Association,* (1953) 8 ff.
১৭। Banerjea S. N., *A Nation in Making,* (1925) 41-51.
১৮। *ibid.,* 54.

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পুনরায় আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়। পূর্বে দেশীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার ছিলনা। লর্ড রিপণের আমলে ইলবার্ট বিল মারফৎ এই অন্যায় ব্যবস্থা লোপ করার ব্যবস্থা হলে, ইউরোপীয় সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভারতীয়রাও পাল্টা বিক্ষোভ অবলম্বন করে, বিশেষ করে এই বিক্ষোভ দেখা যায় বাংলাদেশে ও বোম্বাই-এ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই হয়নি, ইউরোপীয়দের সহিংস বিক্ষোভের ফলে কর্তৃপক্ষ ইলবার্ট বিল তুলে না নিলেও সেখানে এমন সব ধারা যোগ করেন যাতে ইউরোপীয় স্বার্থ ষোল আনাই বজায় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিলের পক্ষে ভারতীয়রা যে আন্দোলন করেছিল তা তাদের রাজনৈতিক অগ্রসরতার পরিচায়ক। লক্ষ্যণীয় যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে ইলবার্ট বিল নিয়ে কোন বিক্ষোভ হয়নি।১৯ এর কিছু পরেই আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, এবং এই ঘটনার নিন্দা করে আগ্রা, ফৈজাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, পুণা এবং ভারতবর্ষের অপরাপর শহরসমূহে প্রতিবাদ সভা হয়। ১৮৮৩র ১৬ই মে তারিখে কলকাতার বীডন স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভা হয় যাতে কুড়ি হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ মুক্তি পান, এবং ১৭ই জুলাই তারিখে একটি মহতী জনসভায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।২০ ছাত্র সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথের বিষয় নিয়ে প্রচুর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল, এবং এটা সরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছিল। ইলবার্ট বিল নিয়ে বিক্ষোভ ও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার সর্বভারতীয় চরিত্র পেয়েছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে কলকাতায় একটি আন্ত-র্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, এবং সেই উপলক্ষে অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় কলকাতায় আসেন। এই সুযোগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ডিসেম্বরের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে তারিখে কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একশোরও বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষা, সিভিল সার্ভিসে ব্যাপকতর ভারতীয় নিয়োগ, প্রশাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকী-করণ, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, জাতীয় তহবিল, অস্ত্র আইন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনও বসে

১৯। Mazumdar A. C., *op. cit.*, 38.
২০। Bagal J. C. *op. cit.*, 61-63.

কলকাতায় ১৮৮৫র শেষের দিকে। এতে বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও যোগ দেয় এবং ন্যাশানাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন সহ উত্তর ভারতের তিরিশটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিনিধি পাঠায়। এখানে স্থির হয় যে এর পর থেকে ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত শহরগুলিতে সম্মেলনের অধিবেশন বসবে। বোম্বাই সম্মেলন উপলক্ষে, যেখান থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়, এবং যা ওই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এখান থেকে অভিনন্দনসূচক টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল।২১

বলা হয় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন যিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পালক পিতা।২২ কিন্তু ভারতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে ইংরাজদের কোনই মাথাব্যথা ছিলনা, তাদের লক্ষ্য ছিল বরং তা যাতে না গড়ে ওঠে, জনগণের বৃটিশবিরোধী মনোভাবকে যাতে ভিন্ন পথে চালিয়ে দেওয়া যায়। আমরা পূর্বেই দেখলাম যে কংগ্রেসের গড়ে ওঠাটা একটা অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিণতি, দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে নানা সংস্থা গঠনের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জনগণের একাংশ এই একটি পয়েন্টে এসে পৌঁছেছিল, এবং সেই একই ঐতিহাসিক নিয়মে তা কালক্রমে বৃটিশের ধামাধরা প্রতিষ্ঠান থাকার বদলে বৃটিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল। আসলে ভারতবর্ষের সর্বত্রই জনগণের মধ্যে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সাব উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমেব যিনি জীবনীকার, তাঁর গ্রন্থে খোলাখুলিই লিখেছেন যে হিউম সাহেব বিভিন্ন সূত্র থেকে এদেশে ব্যাপক বিদ্রোহের আশংকা করে তারই প্রতিষেধক হিসাবে কংগ্রেস স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদেব স্বার্থে নয়।২৩ হিউম বিদ্রোহের পক্ষে যে সব প্রমাণ পেয়েছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুর মত মানুষেরও কার্বোনারী ধরনের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশ যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা

২১। *ibid.*, 80 ff; Blunt W S., *India under Ripon,* (1909) 114 ff; Banerjea, *op. cit.*, 86, 98

২২। Mazumdar, *op. cit.*, 5-6: Chintamani C. Y, *Indian Politics since the Mutiny* (1940), 21-23

২৩। Wedderburn W., *Alan Octavian Hume* (1913), 80-81, 101.

পাবার জন্য ব্যাপক বক্তৃতাবাজি ও দরখাস্তের পর দরখাস্ত করছিলেন, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোরাবজী সাপুরজী, লোখাণ্ডে, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত শিক্ষিত মানুষেরা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করছিলেন শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করে। ১৮৭৪ সালেই বিখ্যাত মুখার্জীস ম্যাগাজিনে ভোলানাথ চন্দ্র বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন যা নিশ্চয়ই নিয়ম মাফিক আবেদন-নিবেদনের পথ নয়। অর্থাৎ এক কথায় দেশের ভিতরে একটা জঙ্গী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, এবং হিউমের আশংকা অমূলক ছিলনা।২৪ হিউম সাতটি বৃহৎ খণ্ডে রক্ষিত তিরিশ হাজারেরও বেশি দলিলপত্র পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বত্র, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে, বিক্ষোভ তীব্রতম পর্যায়ে পোঁছে গেছে, তারা যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহে ফেটে পড়বে, এবং সেটা যাতে না হতে পারে তার জন্যই 'সেফটি ভালভ' হিসাবে কংগ্রেস সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন।২৫ তাই বিস্ময়ের কিছুই থাকে না যখন দেখা যায় ১৮৮৫র ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলিতে বোম্বাই-এর গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলে হিউমকে প্রদত্ত থ্রি-চিয়ার্সের উত্তরে তিনি তিনগুণ থ্রি-চিয়ার্স লর্ড ডাফরিনকে দিচ্ছেন, এবং তারও তিনগুণ রাণী ভিক্টোরিয়াকে, যাঁর জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও তাঁর নেই, এতটা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় সম্মেলন অধিকতর সর্বভারতীয় চরিত্র যুক্ত ছিল, এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন যে রাজনীতির পত্তন করেছিল, তুলনামূলকভাবে তা অধিকতর সাহসী ও প্রগতিশীল ছিল। এই প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেস যে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল তার কারণ কি? প্রথমত রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ সারা ভারতে একই রকম হয়নি। বাংলাদেশের নেতাদের কথাবার্তা অপরাপর স্থানের নেতাদের কাছে বেশি বিপ্লবী মনে হয়েছিল, এবং কংগ্রেসের পৃষ্ঠ-পোষক ইংরাজ সরকারেরও এই মনোভাব ছিল। 'চরমপন্থী' সুরেন্দ্রনাথকে হিউম দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিউম বোম্বাই-এর বদরুদ্দীন তায়েবজী, দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজশা মেটা, কে টি. তেলাঙ প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে।২৬ তাঁর পরিবর্তে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করা হয়েছিল, যিনি ইংরাজদের মতই জীবনযাপন করতেন, যিনি যে কোন রাজ-

---

২৪। এই বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' দ্রঃ।
২৫। Wedderburn, *op. cit.*, 101.
২৬। Pal B. C, *Memoirs*, II, (1932) 13-14

নৈতিক বিক্ষোভকে বিদ্রূপ করতেন, এবং যিনি এতদিন সযত্নে নিজেকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে বাঙালীদের একঘরে করে রাখার পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে বাঙালীরা সৈন্যবাহিনীতে একটি লোকও দেয়নি, এবং অপরাপর সামরিক জাতিসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল নয়, এবং তাদের রাজনৈতিক দাবিসমূহ দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত।২৭ কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুকালের মধ্যেই এই 'দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত' বাঙালীরাই কংগ্রেস দখল করে নেয়। অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং জাতীয় সম্মেলনকে কংগ্রেসের মধ্যেই ঢুকিয়ে দেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসের কর্তাভজা চরিত্রকে অনেকটা পরিবর্তিত করতে সক্ষম হন। যে লর্ড ডাফরিন কংগ্রেস সৃষ্টির মুহূর্তে তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন, এদেশ থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই তিনি বিষোদ্গারে কুণ্ঠিত হননি। ১৮৮৭র ৪ঠা জানুয়ারী সেক্রেটারী অফ স্টেট লর্ড ক্রশকে একটি চিঠিতে ডাফরিন লিখেছিলেন যে কংগ্রেস একটি বাঙালী সংগঠন। প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল পছন্দসই লোকেদের নিয়ে, কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৮৮৬র দ্বিতীয় অধিবেশনে ৫০০ নির্বাচিত প্রতিনিধি এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ৪৩৪ জন ওই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে নাম রেজেষ্ট্রি করেছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের বাঙালী প্রাধান্যকে অবলম্বন করে কিছুটা জল ঘোলা করা হয়, বিশেষ করে মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত করার বিশেষ চেষ্টা হয়। পরবৎসর ১৮৮৭তে মাদ্রাজের তৃতীয় অধিবেশনের প্রাক্কালে সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসে বাঙালী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে তীব্র হুঁসিয়ারী দেন।

এই প্রসঙ্গে এখানে মুসলিম রাজনীতির গতি প্রকৃতির সম্পর্কে দু চার কথা বলা প্রয়োজন। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে রাজনীতির হিসাব-নিকাশ আমরা করছি সেখানে গোড়ার দিকে মুসলমানদের কোন স্থান ছিলনা, কেননা হিন্দুর মত মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেনি এবং তাদের মধ্য থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়নি। ১৮৫৬ সালের গোড়ার দিকে একটা মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য গড়ে উঠেছিল, যদিও সেই প্রতিষ্ঠান কোন কাজের কাজ করতে পারেনি। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা দেখা দেয়, এবং তারা মনেপ্রাণে ইংরাজ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ

২৭। Banerjea, *op. cit.*, 87.

হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মনোভাব যে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ যিনি বুঝেছিলেন যে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা যে পথে ধীরে ধীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করছে, মুসলমানদের ওই একই পথ নিতে হবে। এর অর্থ মুসলমানদের এতদিনের অনুসৃত ইংরাজ বিরোধিতা ত্যাগ করতে হবে এবং ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সৈয়দ আহমদ এটাও বুঝেছিলেন, এবং নিজ সম্প্রদায়কে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের যে ক্ষতিটা হয়ে গেছে তা পূরণ করার জন্য ইংরাজদের ওপর অধিকতর নির্ভর করাই সঙ্গত, এবং যেহেতু ইংরাজেরা শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আন্দোলন-সমূহের দ্বারা তিতিবিরক্ত, এই সময় ইংরাজদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই মুসলমানদের কর্তব্য, এবং সেই হিসাবে মুসলিম রাজনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত হিন্দুবিরোধী ও বৃটিশ সমর্থক আদর্শসমূহ। যেহেতু উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ মূলত ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, আন্দোলন-সমূহ ছিল হিন্দু ঐতিহ্য আশ্রয়ী, সৈয়দ আহমদের গৃহীত পন্থা বাস্তবোচিত হয়েছিল, কেননা এটুকু ভুললে চলবে না যে, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনে, যারাই ছিল ইংরাজী শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী, মুসলমানদের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। তা সত্ত্বেও গোড়ার দিকে মুসলিম রাজনীতি হিন্দু বিদ্বেষের রাস্তা ধরে চলেনি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ 'মহমেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠন করেন। ১৮৭৭ সালে আমীর আলি খানের প্রচেষ্টায় 'ন্যাশানাল মোহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। এই সংস্থাটি অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একযোগে কাজকর্ম করেছিল। পক্ষান্তরে সৈয়দ আহমদ মুসলিম রাজ-নীতির ধারাকে ভিন্নপথে, অর্থাৎ হিন্দুবিরোধী পথে ঠেলে দিয়েছিলেন, এবং এটা ঘটেছিল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আলিগড় কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকে। ১৮৭৭-এ আলিগড়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণদানের ব্যবস্থা সৈয়দ আহমদ করেছিলেন, নিজেও ওই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন, কিন্তু তখন থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সিভিল সার্ভিস ইত্যাদিতে মুসলমানদের একটি কোটা থাকা প্রয়োজন, তা নিছক প্রতিযোগিতামূলক হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই উচ্চতর পদসমূহের অধিকাংশই দখল করে থাকবে। কংগ্রেসের প্রতিও সৈয়দ আহমদের বিরূপতার কারণ এখানেই ছিল, কেননা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আদর্শের পক্ষেই কংগ্রেস দাঁড়িয়ে-ছিল, এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অর্থই সর্বাংশে হিন্দু

প্রাধান্য কেননা ভারতবর্ষের জনসংখ্যা মোট এক-চতুর্থাংশ মুসলমান। এই প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের একটি বক্তৃতায়। ১৮৮৪তে আলিগড় আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি তিনি চারটি আদর্শের ভিত্তিতে রচনা করেন। প্রথমটি হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সংযুক্ত রাজনৈতিক সত্তা এটাকে ধরে নিয়েই কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যা সম অধিকার ও নির্বাচনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, মুসলিম স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। তৃতীয়টি হচ্ছে, বৃটিশ শাসনই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ এটা মনে করেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এবং চতুর্থটি হচ্ছে, মুসলিম স্বার্থ ইংরাজদের হাতে নিরাপদ এটা ধরে নিয়েই, মুসলমানদের রাজনীতি পরিহার করে সাংস্কৃতিক বিষয়ে মন দিতে হবে, এবং রাজনীতি যদি আদৌ করতে হয় তা হিন্দু আন্দোলনকারীদের কাজকর্ম যাতে বাড়তে না পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই করতে হবে। উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই সৈয়দ আহমদ ন্যাশানাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশনকে সমর্থন করতে রাজি হননি। আলিগড় কলেজ সৈয়দ আহমদের আদর্শের প্রচারকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং তার প্রিন্সিপাল মিঃ বেক তাঁর সম্পাদিত ইনস্টিটিউট গেজেট পত্রিকায় বিশেষ করে বাঙালীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। এর কারণ বাংলাদেশেই সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শসমূহ অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল, এবং বলাই বাহুল্য এই আদর্শগুলি আলিগড় গোষ্ঠীর পক্ষে অনুকূল ছিলনা। অথচ এই সৈয়দ আহমদই একদা বাঙালীকে হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ের মাথা ও মুকুট বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৮৮৭র মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রাক্কালে সৈয়দ আহমদের কংগ্রেসে বাঙালী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে হুঁসিয়ারী দেবার পিছনের পটভূমিকা হিসাবে এই কথাগুলি বলতে হল।২৮

বদরুদ্দীন তায়েবজির সভাপতিত্বে ১৮৮৭র তৃতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ৬০৭ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের একটি সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয়তাও সেই সম্মেলনে অনুভূত হয়েছিল, যদিও কাজটি বাস্তবায়িত হতে আরও বহুকাল লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড় কথা

২৮। মুসলিম রাজনীতির গোড়ার কথার জন্য দ্রষ্টব্য 'যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা', 177 ; Majumdar B., *op. cit.*, 211-12, 392 ff ; Sen S , *Birth of Pakistan* (1955) , 42 ; Prasad Rajendra, *India Divided*, (1957) 100 ; Blunt W. S., *India under Ripon*, 27 ff . Pal B. C , *Memoirs*, I, 417 এবং সৈয়দ আহমদের *Akhari Madmin* (Sources of 'Indian Tradition 1958, 746-47) .

সেটা হচ্ছে এই যে কংগ্রেস অজস্র প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভা সেগুলিতে ভ্রূক্ষেপ করেনি। হিউম ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে সকল স্বৈরাচারী সরকারের মত বৃটিশ সরকারও শিক্ষাগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল।২৯ সরকার ছিল কংগ্রেসের ব্যাপারে উদাসীন, সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন খোলাখুলিই শত্রুপক্ষ, আর মুসলমানদের ধারণা ছিল কংগ্রেস এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা হিন্দুরাজ কায়েম করতে চায়। অগত্যা হিউম কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাকে কিছুটা জনমুখীন করার চেষ্টা করলেন। দেশজোড়া বক্তৃতার ব্যবস্থা করা ছাড়াও অজস্র ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা হতে শুরু হল। এই পুস্তিকাগুলিতে দেশের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরা হল এবং সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ চালানো হল। জমিদারী প্রথা দেশে যে কি সর্বনাশ ডেকে এনেছে তা ফলাও করে প্রকাশ করা হল এবং এও বলা হল যে একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, যা কংগ্রেসের আদর্শ, দেশের এই সব সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই সকল কাজকর্মের ফলে কংগ্রেস আর শাসকশক্তির চোখে ঢোঁড়া সাপ হয়ে রইল না। ইংরাজ মহল থেকে হিউমকে ফেরত পাঠাবার দাবি উঠল। হিউমের একদা-বন্ধু স্যার অকল্যান্ড কলভিন তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তিনি হিউমের এই জন-আন্দোলনকে অপরিপক্ক ও ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করলেন। হিউম পাল্টা জবাব দিলেন যে তাঁর এই কাজ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়।৩০ যে হিউম গণবিদ্রোহের আশংকায় 'সেফটি ভালব' হিসাবে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন, ঘটনাচক্রে তার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি নিজেই ভিন্ন পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু এক্ষেত্রে, অর্থাৎ কংগ্রেসকে জনমুখীন করার প্রচেষ্টায়, এবারে বাধা এল, শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও। বিপিনচন্দ্র পালের মত নেতাও কলভিনকেই সমর্থন করলেন, হিউমকে নয়।৩১ তাঁর বক্তব্য ছিল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং বলাই বাহুল্য এই মত তখন অনেক ভারতীয় নেতারই মত ছিল। ফলে কংগ্রেস গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারল না, আবার তাকে ফিরে যেতে হল আগের জায়গায়। তথাপি হিউম যে উত্তাপের সৃষ্টি করেছিলেন ১৮৮৮তে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে তার কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছিল। অধিবেশনের জন্য স্থান সংগ্রহ করতেও বেগ পেতে হয়েছিল, কেননা সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ

২৯। Wedderburn, *op. cit.*, 61-62.
৩০। *ibid.*, 64 ff; Mazumdar A. C., *op. cit.*, 72.
৩১। Pal B. C., *op. cit.*, II, 48-52.

মহল তাতে প্রচুর বাধা দিয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ জনৈক অনুগত হিন্দু জমিদারের সাহায্যে এলাহাবাদে একটা পাল্টা অধিবেশন করেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের অধিবেশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সরকারী তরফ থেকে এই বলে শাসানো হয়েছিল যে কংগ্রেস অধিবেশনে যে যোগ দেবে তার কপালে দুঃখ আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১২০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে ২০০ ছিলেন মুসলমান।

শুরু থেকেই কংগ্রেসের দাবি ছিল যে ভারতবাসীকে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক। প্রথম অধিবেশনেই নবগঠিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবের জন্য আইনসভার দাবি করা হয়, এবং পরবর্তীকালে এই আইনসভাগুলির ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য একনাগাড়ে দাবি জানিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে এই প্রতিষ্ঠানটি ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে আঘাত পেতে থাকে। কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব ও বৃটিশ জাতীয় মনোভাব সর্বদাই দোদুল্যমান ছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭ এই তিন বছর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, কিন্তু পরে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকা শুরু থেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেছিল, এমন কি লর্ড ডাফরিন, যিনি ১৮৮৫তে কংগ্রেসকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, ১৮৮৮তেই উল্টো সুর গাইতে শুরু করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসকে বিশেষ সমর্থন করেনি। ১৮৮৪তে সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান একই জাতির অংশ, তাদের যা পার্থক্য তা নিছক ধর্মীয়। কিন্তু ১৮৮৮তেই তিনি বললেন যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি যুদ্ধরত জাতি, বৃটিশ শাসনের অন্তে যাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব। শুধু তাই নয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর একান্ত অনুগত মিঃ বেক ১৮৮৮ সালে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে কংগ্রেসবিরোধী একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। অবশ্য বদরুদ্দীন তায়েবজি এবং রহিমতুল্লা সাহানীর মত নেতারা কংগ্রেসকেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মেনেছিলেন, এবং যাতে মুসলমান সম্প্রদায় অধিক সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন বসে যাতে সভাপতিত্ব করেন হিউমের জীবনীকার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ। এই অধিবেশনে মোট সদস্যের সংখ্যাও ছিল ১৮৮৯ জন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য চার্লস ব্রাডলাফ এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই অধিবেশনে ইংলণ্ডে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কেননা সেখানে

রীতিমত কংগ্রেসবিরোধী অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। ইংলণ্ডে প্রচার-কার্যের জন্য পূর্ববর্তী বছরেই মিঃ ডিগবীকে দিয়ে একটি অফিস খোলানো হয়, এবং ১৮৮৯ সালে গঠিত হয় 'বৃটিশ কমিটি অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস'। এর চেয়ারম্যান ছিলেন ওয়েডারবার্ণ, সেক্রেটারী ছিলেন ডিগবী, এবং সদস্য ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাদাভাই নৌরজী। এই কমিটি কংগ্রেসবিরোধী অপপ্রচারের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য তিনটি কাজ করে-ছিলেন : পার্লামেণ্টে একটি ভারতীয় পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠন, জনসভা, এবং ইণ্ডিয়া নামক একটি পত্রিকার প্রকাশ।

এই সক্রিয়তার ফলেই বোধ হয় ভারত সরকারের কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছিল, কেননা ১৮৯০-এর ষষ্ঠ কংগ্রেস অধিবেশনে, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়, সরকারী তরফ থেকে কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে পুনরায় ঘোষণা করা হয়, সরকারী কর্মচারীদেরও কংগ্রেসে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে তাঁদের নিষেধ করা হয়। এ সব সত্ত্বেও ইংরাজেরা কংগ্রেসকে বরদাস্ত করতে যে রাজি ছিলনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় বোম্বাই-এর গভর্ণর লর্ড রী-কে লিখিত লর্ড ক্রশের একটি পত্রে। ১৮৯০-এর ১৩ই জানুয়ারী তারিখে লিখিত এই পত্রে এই কথা বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল যে মুসলমান এবং পার্শী সম্প্রদায় কংগ্রেসকে বর্জন করেছে। ১৮৯২ সালে যে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্ অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়, সেখানে কংগ্রেসের দাবিকে পুরোপুরি মানা না হলেও, এটা ধরে নিতে পারা যায় যে এই আইন কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের দাবিরই ফলশ্রুতি। এর ফলে অনেক প্রসিদ্ধ ভারতবাসী আইনসভায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের বিখ্যাত বক্তৃতাসমূহের ফলে কাজ কিছু হোক না হোক, ভারতের সমস্যাগুলি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দেই দাদাভাই নৌরজি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডস্থিত পূর্বোক্ত 'ইণ্ডিয়ান পার্লা-মেণ্টারী কমিটি' ১৫৪ জন পার্লামেণ্ট সদস্যের সমর্থন পায়, এবং মূলত এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাতেই ভারত সংক্রান্ত ওয়েলবি রয়াল কমিশন গঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে লর্ড ল্যান্সডাউন বেআইনীভাবে ট্যাঁকশালসমূহের কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করেন, এবং ওই বছরেই লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়।৩২ পর বৎসর মাদ্রাজ কংগ্রেসে ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনকারীদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর জন্য প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৮৯৫-এ আইনব্যবসায়ীদের জেলা জজ ও

৩২। Chintamani, *op. cit.*, 46 ff.

রেভিনিউ কমিশনারের অধীন করার চেষ্টা হয়, এবং কংগ্রেস তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করে। মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টার সম্পূর্ণ সফল হয়নি। ১৮৯৬র অধিবেশনে রহিমতুল্লা সাহানী কংগ্রেসের সভাপতি হন, এবং মুসলমানেরা সেখানে প্রচুর সংখ্যায় যোগ দেন। সৈয়দ আহমদের তরফ থেকে হাজী মহম্মদ ইসমাইল খান জানান যে মুসলমানেরা কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারেন যদি আইনসভা, জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে মুসলমানদের অর্ধেক আসন দেওয়া হয়। কিন্তু রহিমতুল্লা সাহানী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৮৯৭-এর কংগ্রেসের অমরাওতি অধিবেশন নানান কারণে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ, কেননা এখন থেকেই কংগ্রেস আদর্শগত সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে ভিতর ও বাহির দুদিক থেকে আঘাত আসা সত্ত্বেও কংগ্রেস টিঁকে গিয়েছিল, এবং অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিছু কিছু কাজ করেছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান, তার নিজস্ব প্রকৃতির জন্য, তা জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবার জন্যই, দেশবাসীর চাহিদার সঙ্গে খাপ খায়নি, যদিও অনেক কংগ্রেস নেতা তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য সর্বশ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছিলেন। ১৮৯৭-এ ভারত সরকার তিনটি মরচে পড়া অস্ত্রে পুনরায় শান দিয়ে নেয়—১৮১৮র ৩নং বেঙ্গল রেগুলেশন, ১৮১৯-এর ২নং মাদ্রাজ রেগুলেশন এবং ১৮২৭-এর ২৫নং বোম্বে রেগুলেশন—যেগুলির দ্বারা বিনা বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে জেলে পোরার ক্ষমতা সরকার লাভ করে। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে—আর এগুলি ছাড়াও ছিল প্লেগ, খরা, ভূমিকম্প, যুদ্ধ ও উৎপীড়ন। ১৮৯৬ সাল থেকে যে প্লেগ মহামারী শুরু হয়, সেই সময় সরকারের প্লেগ-নীতি নিয়ে জনসাধারণের বিক্ষোভ চরমে পৌঁছায়, কেননা প্লেগ দমনের নামে পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীরা ও সৈন্যদল জনসাধারণের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করেছিল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে লণ্ডন থেকে এই প্লেগ উপলক্ষে ইংরাজ কর্মচারীদের অত্যাচার ও ঔদ্ধত্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এদিকে পুণায় তখন তিলকের নেতৃত্বে নূতন ধরনের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, এবং সেই প্রেরণাতেই চাপেকর-ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফটন্যাণ্ট আয়ার্স নামক দুজন অফিসারকে হত্যা করেন। ফলে বৃটিশ সরকার চূড়ান্ত দমন-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, এবং চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় সহ চারজনকে ফাঁসি দেয়, বহুজনকে গ্রেপ্তার করে এবং নাটু উপাধিধারী দুই ভাইকে নির্বাসিত করে। তিলককে এই সব ঘটনার মূল কারণ বিবেচনা করে তাঁর উপর আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। গোখলে যে ইংলণ্ডে সরকারী

প্লেগ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য রেখেছিলেন, চাপে পড়ে তা প্রত্যাহার করেন একটি ঘোষণার দ্বারা, কিন্তু তিলককে বশে আনার চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাবাসকেই অধিকতর পছন্দের বিষয় করেছিলেন। ১৮৯৭র কংগ্রেস অধিবেশনে গোখলে ও তিলক দুইটি আদর্শের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম জন বৃটিশ জাতির ন্যায়বোধে বিশ্বাসী শিক্ষিত নরমপন্থী আদর্শের প্রতীক, এবং দ্বিতীয় জন নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী আপোসবিরোধী চেতনার প্রতীক। এই প্রথম কংগ্রেস আত্মিক সংকটের, দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের সংঘাতের মুখোমুখি হল, এবং পরবর্তী-কালের কংগ্রেসের ইতিহাস এই দুই ধারার সংঘাতের ইতিহাস।

কিন্তু ১৮৯৭-এর অমরাওতি অধিবেশনে তিলকই অভিনন্দিত হয়েছিলেন যেটা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঠিক আশা করা যায়নি। যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বী ভাষণে তিলকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন, সভাগৃহের সদস্যরা তখন আবেগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, এবং সুউচ্চ করতালিধ্বনিতে এই ভারতীয় ডিমস্থিনিসের কণ্ঠস্বরও মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছিল। 'মডারেটপন্থী' সভাপতি স্যার সি. শংকরণ নায়ার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে সমর্থন এবং তিলকের শাস্তির নিন্দা করেছিলেন, এবং 'মারাঠা' পত্রিকায় প্রকাশিত তিলকেরই একটি রচনা থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে-ছিলেন : Plague is more merciful to us than its human prototypes reigning in the city.

জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশী আন্দোলন (১৯০১-০৫)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল ঘটনাসমূহ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে যে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায় তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথম ধারাটি হচ্ছে বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটেছে, এমন একটি বছরও যায়নি যে বছরে বৃটিশ সরকারকে এই সব বিদ্রোহগুলি বেগ না দিয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, যার মূলে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং যা পূর্ণতা পেয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে। প্রথম ধারাটির পিছনে জনসমর্থন ছিল, জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানসমূহে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু এই ধারাটির যা ছিল প্রধান ত্রুটি তা হচ্ছে এই যে, এই সব বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানসমূহ কোন সর্বভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি, কোন জাতীয়তাবাদী আদর্শে এইগুলি পরিচালিত হয়নি, স্থানীয় স্বার্থই ঘটনাগুলির পিছনে কাজ করেছে। পক্ষান্তরে রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বভারতীয় আদর্শ আনয়ন করার প্রধান কৃতিত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠনগুলির এবং পরিশেষে কংগ্রেসের। কিন্তু এই দ্বিতীয় ধারাটিও ছিল অপূর্ণ, কেননা বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ ছিলনা, এবং সর্বোপরি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও সাম্প্রদায়িক সহ বিভিন্ন শক্তি ও আদর্শসমূহের সংঘাত চলছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস চলছিল। ১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে লর্ড কার্জন হ্যামিলটনকে লিখেছিলেন : "আমার নিজের বিশ্বাস যে কংগ্রেস মৃত্যুর জন্য ছটফট করছে, এবং আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা যে ভারতে থেকে যাতে আমি একে শান্তিতে মরতে দিতে সাহায্য করতে পারি।" কার্জনের এই ইচ্ছাটি, বলাই বাহুল্য, পূর্ণ হয়নি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বোক্ত দুটি ধারার পারস্পরিক সংঘাত থেকে একটি নতুন তৃতীয় ধারার উদ্ভব হচ্ছিল দ্বান্দ্বিক বিকাশের অমোঘ নিয়মে, যেখানে প্রথম ধারাটির জঙ্গীয়ানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় ধারাটির সর্বভারতীয়ত্ব। এটাকেই আমরা বলছি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, যা সশস্ত্র বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী। মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশ, ভারতের যে দুটি অঞ্চল রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে অধিকতর

অগ্রসর ছিল, সেখানেই এই জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশে এই জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার পিছনে যাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল তিনি হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কিন্তু ইতিহাসে মধ্যপন্থী রাজনীতিক হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। ইটালীয় বিপ্লবী মাৎসিনীর উপর উনিশ শতকের সত্তরের দশকে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী যুবচিত্তে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল, এবং ইটালীয় কার্বোনারীর আদর্শে বাংলাদেশে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল, যেগুলির অনেকগুলির সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ নিজেই যুক্ত ছিলেন।১ সুরেন্দ্রনাথ প্রচারিত জাতীয়তাবাদ অবশ্য সর্বরকম সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিল। তা ছিল একান্তই ইউরোপীয় ধরনের। কিন্তু আমরা দেখব যে উনিশ শতকে প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের ফলে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শই কালক্রমে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। ১৮৬৭ সাল থেকে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র (যিনি ন্যাশানাল মিত্র বলেই অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন), এবং বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন মিলে হিন্দুমেলার প্রবর্তন করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় ভাবের জাগরণ ঘটানো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা পরিচালিত একটি গুপ্ত সমিতির উল্লেখ করেছেন যেখানে তাঁকে ও তাঁর বড় ভাইকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পালও এইরকম একটি গুপ্ত সমিতির উল্লেখ করেছেন যেখানে দীক্ষিতকে তার বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে হত।২

এই নতুন জাতীয়তাবাদ প্রচলিত কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল, কেননা কংগ্রেসের নেতারা বৃটিশ জাতির ন্যায়নিষ্ঠতার উপর অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু শ্লেষের সঙ্গে লিখেছিলেন, তোমরা কি মনে কর যে তারা তাদের বার্মিংহাম ও ম্যাঞ্চেস্টারকে অবহেলা করে তোমাদের শিল্পবাণিজ্যকে উৎসাহ দেবে?৩ পরবর্তীকালে লজপত রায় লিখেছিলেন যে কংগ্রেস আন্দোলন জনগণের দ্বারা উৎসাহিত হয়নি, তা তাদের দ্বারা পরিকল্পিতও হয়নি। কংগ্রেস নেতাদের পর্যাপ্ত রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাস ছিলনা। তাঁদের কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল, কিন্তু অভাবটি ছিল বিশ্বাসের, যা না থাকলে আত্মত্যাগ করা যায়না। তাঁরা কেউই আদর্শের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে রাজি ছিলেন না।৪ ১৮৯৩তে অরবিন্দ ঘোষ

১। Pal B. C., *op. cit.*, I, 227-47.
২। *ibid*, 246-48.
৩। Gupta A. C (ed.), *Studies in Bengal Renaissance* (1958), 210.
৪। *Young India* (1917), 146.

বোম্বাই-এর ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় লিখেছিলেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য বিপথ-চালিত, আদর্শে নিষ্ঠার অভাব এবং সর্বোপরি তা একটি সীমাবদ্ধ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বড় জোর দাবি করতে পারে, সমগ্র জাতির নয়।৫ বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত বঙ্গবাসী পত্রিকায় কংগ্রেসের কর্তাভজা নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। ১৮৯৭-এর কংগ্রেসের অধিবেশনে বরিশালের জননেতা ও বাংলার প্রতিনিধি অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অধিবেশনকে 'তিন দিনের তামাসা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রে এককভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা করেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে যে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, তা ফাড়কের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে দেশের এই শোচনীয় দুরবস্থার মূলে বৃটিশ শাসনই দায়ী, এবং সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন তাদের উৎখাতের আর কোন রাস্তা নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ফাড়কের আদর্শে সাড়া দেয়নি, তবে পিছিয়ে পড়ে থাকা রামোসিশ সম্প্রদায়, যারা পূর্বেই একবার বিদ্রোহী হয়েছিল, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়। ফাড়কের পরি-কল্পনা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়া এবং জেলখানাগুলি থেকে বন্দীদের মুক্ত করে আনা। কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা ছিল অর্থের, এবং সেই উদ্দেশ্যে ফাড়কে সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করান, কিন্তু যে রামোসিশ সম্প্রদায়ের দ্বারা এই কাজ হয়েছিল তারা নিজেরাই লুঠের টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা করে সরে পড়ে। এই সময় ফাড়কের সঙ্গে রঘুনাথ মোরেশ্বর ভাটের মধ্যস্থতায় রোহিলা সর্দার ইসমাইল খানের যোগাযোগ হয়, যিনি তাঁকে ৫০০ রোহিলা দিতে সম্মত হন। অন্যান্য সূত্র থেকে ফাড়কে আরও ৪০০ লোক সংগ্রহ করেন। কিন্তু ফাড়কের পরিকল্পনার কথা সরকার কোন সূত্র থেকে পূর্বেই অবগত হয়েছিল, ফলে ১৮৭৯-এর ৩রা জুলাই তারিখে তিনি ধরা পড়েন, এবং তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড ঘোষিত হয়। বন্দী অবস্থায় ফাড়কে জেল থেকে পালান, কিন্তু ১৮৮০র ১৩ই অক্টোবর তারিখে আবার গ্রেপ্তার হন। ১৮৮৩র ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বন্দী অবস্থায় যক্ষ্মারোগে এই নিঃসঙ্গ বিপ্লবীর মৃত্যু হয়।৬ ফাড়কের একক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল, এবং তা ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে বিপ্লবী ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'পুণা সর্বজনিক সভার' কথা আমরা পূর্বে

৫। Mukherjee H. and U., *Sri Arabindo's Political Thought* (1958), 75-76.

৬। ফাড়কে সম্পর্কে ভি. এস. যোশী লিখিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ করেছি। গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির একটি গণচরিত্র ছিল। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির উপর কর্তৃত্ব করেছিলেন রাণাড়ে এবং তৎশিষ্য গোখলে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁদের সরিয়ে দিয়ে বালগঙ্গাধর তিলক এই প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃত্ব দখল করেন। তিলকের বৈপ্লবিক মতবাদে আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯৬ সাল থেকেই তিলক বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পত্তন ঘটান মহারাষ্ট্রে। ওই বছরেই বোম্বাই-এ প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিলক খাজনা-বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত 'কেশরী' পত্রিকায় তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন, এবং জনগণকে তিলে তিলে মৃত্যুর পরিবর্তে কালেক্টার প্রমুখ সরকারী কর্মচারীদের ঘেরাও করতে উৎসাহিত করেন। এরও পূর্বে যথাক্রমে ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিলক মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। প্রথমটি অবশ্য ধর্মীয় উৎসবরূপে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, তিলক তাকে একটি দেশাত্মমূলক জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। শিবাজী উৎসব নবসৃষ্ট জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে-ছিল। ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে, মূলত তিলকেরই অনুপ্রেরণায়, যুবকদের শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যার প্রাণস্বরূপ ছিলেন দুই ভাই, দামোদর চাপেকর এবং বালকৃষ্ণ চাপেকর, যাঁরা ১৮৯৭-এর ২২শে জুন র্যাণ্ড ও আয়ার্সকে হত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। আমরা আগেই দেখেছি যে এই ব্যাপারে তিলককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা নিয়ে এমনকি কংগ্রেসেও ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তিলকের বিচার এবং কারাদণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি ক্রান্তিকারী মুহূর্ত, এবং ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করেছিল। কংগ্রেসের কর্তাভজা নীতির সামনেও এটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থিত হয়েছিল। বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লজপাত রায়, খাপার্দে প্রভৃতি নেতারা তিলককেই গ্রহণ করেছিলেন।৭

চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাণদণ্ডের পরে, যাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাদের গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল, যা থেকে বোঝা যায় চাপেকরদের সংগঠন তাঁদের মৃত্যুর পরেও সক্রিয় ছিল। পশ্চিম ভারতে,

---

৭। Athalye D. V., *Lokamanya Tilak* (1921); Kelkar, *Tilak*, 215 ff; Buch M. A, *Rise and Growth of Indian Militant Nationalism*, (1940), 24 ff.

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে, ঠাকুর উপাধিধারী জনৈক রাজপুত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে কয়েকজন মারাঠা নেতার দ্বারা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তিলকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু কিশোর বাল-সমাজ নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল। তারা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিতে আলকাতরা মাখিয়ে দেয় এবং ওই মূর্তির গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয়। এদের কার্যকলাপ ওয়ার্ধা, নাগপুর, অমরাওতি এবং যেওতমলেও বিস্তারলাভ করেছিল। ওয়ার্ধায় পাণ্ডুরং খানখোজে এবং আরও কয়েকজন 'আর্য বান্ধব সমাজ' নামক একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন, ফাড়কের আদর্শে যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজ হটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। ভীল ও গন্দ উপজাতির মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য খানখোজে চেষ্টা করেন। এই সংস্থার মধ্যে বজ্রচাঁদ পোদ্দার ও যমনলাল বজাজ ছিলেন, এবং বান্ধব সমাজের শাখা গুরুকুল ও লাহোরেও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বান্ধব সমাজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেছিল, এছাড়া এদেশে রাইফেল তৈরী করার একটি পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল যে তা করার পরিবর্তে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করাই অধিকতর সঙ্গত। বান্ধব সমাজের সঙ্গে পাঞ্জাবের লজপত রায় এবং ভাই পরমানন্দের যোগাযোগ ছিল। এই সংস্থা তার সদস্যদের গোপনে সমরবিজ্ঞান ও গেরিলা যুদ্ধ শেখাত। বরোদা এবং হায়দ্রাবাদেও এই সংস্থার সংগঠন বিস্তৃত হয়েছিল, এবং ১৯০১ সাল থেকে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গেও বান্ধব সমাজের যোগাযোগ হয়। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় বিশেষ করে সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায়। পাণ্ডুরং খানখোজে সামরিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে জাপান যাত্রা করেন, যার পিছনে তিলকের হাত ছিল।৮

মহারাষ্ট্রের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সঙ্গে তাল রেখে একই সময়ে বাংলাদেশেও বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহের প্রসার ঘটেছিল। ১৯০১ সালের আগে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, যিনি পি. মিত্র নামে অধিকতর পরিচিত, চারবার বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রকৃত সুযোগ আসে ১৯০১ সালে। ওই বছরেই সতীশচন্দ্র বসু, শশী চৌধুরী প্রমুখ কয়েকটি যুবক, যাঁরা অধ্যাপক ওয়ান, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির কাছে কিছুটা জাতীয়তাবাদী শিক্ষা পেয়েছিলেন, কলকাতার মদন মিত্র লেনে একটি লাঠিখেলার আখড়া গড়ে তোলেন।

৮। Majumdar, R. C., *op. cit.*, I, 454-56.

তাঁদের যিনি লাঠিখেলা শেখাতেন সেই নরেন ভট্টাচার্য (ইনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত ম্যানবেন্দ্রনাথ রায় নন) এই আখড়ার নাম দেন অনুশীলন সমিতি। এই সমিতির সদস্যরা তাঁদের পরিচালক হবার জন্য পি. মিত্রকে অনুরোধ করেন, এবং মিত্র সানন্দে সম্মতি জানান।) এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বরোদা থেকে আরও একদল লোক আসেন, যাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের অস্ত্রধারণে শিক্ষাদান যাতে তাঁরা ইংরাজদের সঙ্গে লড়তে পারেন, এরং যিনি এই শিক্ষা দেবেন সেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা থেকে পাঠিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ১৯০১-এর শেষের দিকে। এই দুটি দলেরই ঐক্য স্থাপিত হয়, কেননা উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যের অভিন্নতা বর্তমান ছিল। এই যুক্ত সংগঠনের সভাপতি হন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, সহ-সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, এবং কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০৮-এ সার্কুলার রোডে যতীন্দ্রনাথের আখড়া স্থাপিত হয়, ছোটদের শারীরিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রটি থাকে পূর্বোক্ত মদন মিত্র লেনে, এবং বড়রা শিক্ষা পেতে থাকেন সার্কুলার রোডে যেখানে শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষাদানও চলত। এই সময় যাঁরা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে টাকা যোগাতেন পি. মিত্র ছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন।[৯] ওকাকুরা নামক জনৈক জাপানী ভদ্রলোক ও ভগিনী নিবেদিতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে।[১০] অনুশীলন সমিতির কর্মধারা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এবং তার অনেকগুলি শাখা এবং সেগুলির উপর নির্ভরশীল অনেক গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতিও গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন ছিল, এবং টাকারও প্রয়োজন ছিল, এবং এই সকল উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় আসেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং বিপ্লবী সমিতিগুলির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তাও চালান। কিছু উৎসাহী ইতিমধ্যেই অর্থের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করেছিলেন, যেটা পি. মিত্র বা নিবেদিতা পছন্দ করেন নি, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল (১৯০৩ সালে যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ায়।) অরবিন্দের হস্তক্ষেপের ফলেও উভয়ের বিরোধের

৯। দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, I, 179 ff.

১০। নিবেদিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে শংকরীপ্রসাদ বসু লিখিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নিষ্পত্তি হয়নি, যার ফলে সার্কুলার রোডের ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে একটি আশ্রম খোলেন। এই সকল আভ্যন্তরীণ অসুবিধা সত্ত্বেও অনুশীলন সমিতি চলেছিল, এবং পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, যা আমরা পরে দেখব।

ইতিমধ্যেই ঘটনাচক্রের দ্রুত ও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছিল, যার ফলে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বাঙালীর সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বহুদিনের, এবং এর জন্য শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দোহাই দিলেও, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল গণ্ডগোলের নাটের গুরু বাঙালীকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রস্তাব করেন যে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তৎসহ ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসামের সঙ্গে যোগ করা হোক, কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষ, এমনকি ইংরাজ বণিকেরা পর্যন্ত এর তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি দাখিল করেন।[১১] পরবর্তী চীফ কমিশনার মিঃ কটন এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। তিনি বলেন যে চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব কুপরামর্শের অভিব্যক্তি, এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহের হস্তান্তর অচিন্তনীয়। কিন্তু বিষয়টিকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ১৯০৩ সালে লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর সার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার পূর্বোক্ত উইলিয়ম ওয়ার্ডের ধারা অনুসরণ করে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন, এবং লর্ড কার্জন তাতে সম্মতি জানান। বিষয়টিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী হার্বার্ট রিজলী, যিনি প্রস্তাব করেন যে ছোটনাগপুর জেলাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যোগ করা হোক, এবং সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ ও তৎসহ ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হোক। এই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সকল শ্রেণীর মানুষই প্রতিবাদমুখর হন। এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে ১৯০৩ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে দুহাজারেরও বেশি জনসভা হয়েছিল যাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সংবাদপত্রগুলি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

১১। Bagal J. C, *History of the Indian Association,* 154.

প্রতিবাদে গর্জন করে উঠেছিল, এমনকি 'ইংলিশম্যানের' মত সরকারের অনুগত পত্রিকাও বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে মত দিয়েছিল।১২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৩ এবং ১৯০৪-এর অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।)

কিন্তু লর্ড কার্জন এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। যে কোন মূল্যেই হোক বাংলাদেশকে দুটুকরো করতে হবে। তাঁর পক্ষে যে যুক্তি ছিল তা ১৯০৪-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রোডরিককে লিখিত তাঁর একটি পত্র থেকেই জানা যায় যেখানে লর্ড কার্জন লিখেছিলেন : "বাঙালীরা, যারা নিজেদের একটি জাতি হিসাবে চিন্তা করে, এবং স্বপ্ন দেখে ইংরাজরা হটে গেলে একজন বাঙালীবাবু কলকাতার সরকারীভবনে অধিষ্ঠিত হবে স্বাভাবিকভাবেই যে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতায় তীব্র আপত্তি জানাবে যা তাদের স্বপ্নের উপলব্ধির পথে বাধাস্বরূপ। আমরা যদি তাদের চীৎকারে দুর্বল হয়ে পড়ি, তাহলে আমরা বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ করতে বা তাকে ছোট করতে কোনদিনই সক্ষম হবনা, আর তাহলে ভারতের পূর্বাংশে এমন একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকেই দৃঢ় ও জোরদার করা হবে যা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান অশান্তির নিশ্চিত উৎস হবে।"১৩ বস্তুত, বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনার মূলে যে প্রেরণা তা শাসনতান্ত্রিক নয়, রাজনৈতিক। এই একই যুক্তিতে কার্জন বোম্বাই-এর সঙ্গে বেরারের সংযুক্তি ঘটতে দেননি। বঙ্গভঙ্গের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯০৪-এর ফেব্রুয়ারীতে কার্জন পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে অল্প সুদে সরকারের তরফ থেকে বৃহৎ পরিমাণে টাকা কর্জ দিয়ে তাঁর সমর্থন আদায় করেন, এবং তাঁর প্রভাবাধীন কিছু প্রভাবশালী মুসলমান কার্জনের পক্ষে আসেন। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লণ্ডনের স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা একটি সংবাদ প্রকাশ করে যে সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ ব্রোডরিক বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। এর প্রতিবাদে ষাট হাজার লোকের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি স্মারকলিপি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, কিন্তু সেটিকে অগ্রাহ্য করা হয়। ওই বছরেই ১৯শে জুলাই তারিখে সরকার বঙ্গবিভাগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, এবং পরদিন তা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংশোধিত প্রস্তাবটি হচ্ছে যে একটি নতুন প্রদেশ জনৈক লেফটন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীনে সৃষ্ট হবে। তাতে থাকবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগত্রয়, মালদহ জেলা,

---

১২। *ibid*, 162.

১৩। *Quarterly Review of Historical Studies*, V, 78-96

পার্বত্য ত্রিপুরা এবং আসাম প্রদেশ। এই বিভাগ কার্যকর করা হয়েছিল ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর তারিখে।

বলাই বাহুল্য, বাঙালীকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা, এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইভাবে যে বাংলা বিভাগ করা হয়েছিল, বাংলাদেশের জনসাধারণ সেক্ষেত্রে নির্বাক দর্শক হয়ে ছিলনা। তা ছাড়া, যে পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়েছিল তাও ছিল রীতিমত আপত্তিজনক। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বঙ্গভঙ্গের সংশোধিত পরিকল্পনাটি গোপনে জন্মলাভ করেছিল, গোপনে আলোচিত হয়েছিল, এবং গোপনে নির্ধারিত হয়েছিল, এ বিষয়ে জনগণকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে...আমরা অপমানিত হয়েছি, লাঞ্ছিত হয়েছি এবং প্রবঞ্চিত হয়েছি।"১৪ ৭ই জুলাই তারিখে তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'একটি গভীর জাতীয় বিপদ' এই শিরোনামায় তিনি লিখলেন যে যদি সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে, তাহলে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে না, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনও অতঃপর ভিন্ন দিকে মোড় নেবে।১৫ বাস্তবিকই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অজস্র সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হচ্ছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি, এমনকি কোন কোন বৃটিশ সংবাদপত্রও বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। কংগ্রেসের ১৯০৫ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে গোখলে বলেছিলেন সকল শ্রেণীর লোক, হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চ এবং নিম্ন, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সঙ্গতভাবেই বিক্ষোভ প্রকাশ করছে, এবং এই বিক্ষোভ স্বতস্ফূর্ত, অথচ লর্ড কার্জন বলেন, এই বিক্ষোভ নাকি তৈরী করা হয়েছে জোর করে, এবং তাঁর এই কথাটা আঘাতের উপর অপমানের যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।১৬ সত্য বলতে কি, বিপুল পরিশ্রমে কার্জন বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে যেটুকু জনমত তৈরী করতে পেরেছিলেন, তার ভিত্তিও ধ্বসে যেতে শুরু করেছিল। এমন কি লর্ড মোর্লে, যিনি ১৯০৬ থেকে ভারত-সচিব হয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।১৭

১৯০৫-এর ১৩ই জুলাই তারিখে সঞ্জীবনী নামক কলকাতার একটি

১৪। *op. cit.*, 186-7.

১৫। Mukherjee H. and U., *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement* (1958), 30-31.

১৬। *History and Culture of the Indian People*, XI, 26 ff.

১৭। O'Donnell C. J., *The Causes of the Present Discontent in India* (1908), 53.

সাপ্তাহিক পত্রিকায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের আহবান জানানো হয়, এবং তার তিনদিন পরে ১৬ই জুলাই তারিখে খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে একটি জনসভায় বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বরিশাল-হিতৈষী পত্রিকা ১৯০৫-এর ১৯শে জুলাই তারিখে বয়কটের আহবান দেয়। ৭ই আগস্ট তারিখে কলকাতার টাউন হলে একটি মহতী জনসভায় দেশজোড়া বৃটিশ পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করা হয়, বন্দেমাতরম জাতীয় ধ্বনি হয়ে ওঠে। অনেক পত্রিকায় প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত পরিদর্শন অনুষ্ঠান বয়কট করার আহবান জানানো হয়। বয়কটের সমর্থনে এরপর বিভিন্ন স্থানে জনসভা হতে শুরু করে, স্কুল কলেজের ছাত্ররা বিদেশী পণ্য বয়কটের জন্য পিকেটিং করতে শুরু করে। সরকারও অবশ্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলনা, ছাত্রদের উপর এই উপলক্ষে তারা এখানে ওখানে ব্যাপক লাঠি চার্জ করে, এবং যৎসামান্য কারণেই গ্রেপ্তারী শুরু করে। বৃটিশ পণ্য বয়কটের আহবান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মৈমনসিংহের মুচিরা বিলাতী জুতা সারাতে অস্বীকার করেন, ওড়িয়া রাঁধুনিরা বরিশালে একটি সভা করে স্থির করেন যে, যে বাড়ীতে বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার হয় তাঁরা সেখানে কাজ করবেন না। কালীঘাটের ধোপারা বিলাতী কাপড় কাচা বন্ধ করেন। এই রকম অজস্র উদাহরণ আছে যা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা বয়কটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, এবং বলেন যে বিলাতী লবণ ও চিনির ব্যবহার অশাস্ত্রীয়। অভিজাত ঘরের মহিলারা পর্যন্ত, যাঁরা এতদিন কোন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাননি, বয়কট আন্দোলনের সামিল হন। মুসলমান সম্প্রদায়ও দর্শক হয়ে বসে ছিলেন না। যদিও ঢাকার নবাব এবং কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিলেন, সাধারণ মুসলমান জনতা বয়কট আন্দোলনে সামিল হন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরা একটি জনসভা করে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বয়কটের স্বপক্ষে অভিমত প্রদান করেন। (১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখে, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনে, বাংলার ঘরে ঘরে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সুর্যোদয়ের পূর্বে হাজার হাজার মানুষ গঙ্গাস্নান করে বন্দেমাতরম গাইতে গাইতে একে অপরের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। ওই দিন বিকালে দুই বঙ্গের মিলনের প্রতীক হিসাবে ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপিত হয়, আনন্দমোহন বসুর পৌরোহিত্যে। তারপর বিরাট জনতা নগ্নপদে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ নেতাও এই দলের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে

একটি সভা হয়, এবং ৭০,০০০ টাকা চাঁদা তোলা হয় স্বদেশী আন্দোলন চালানোর উদ্দেশ্যে।১৮)

স্বদেশী আন্দোলন, যার পটভূমি আমরা দেখলাম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় টার্ণিং পয়েণ্ট। এই আন্দোলন প্রচলিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমাধি ঘটিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন ধরনের বেগ সঞ্চার করেছিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন একই সংগ্রামের দুই দিক, প্রথমটির উদ্দেশ্য বিদেশী দ্রব্যের বর্জন এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার। এই সংগ্রামের মূল কথা হচ্ছে বৃটিশ শক্তিকে আঘাত করতে হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক বয়কটের প্রধান লক্ষ্য ছিল ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা, কিন্তু লবণ, চিনি, সিগারেট ও অপরাপর বিলাতী পণ্যসমূহের ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন প্রসারিত হয়। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এই গান বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিলাতী কাপড়ের বহ্নুৎসব সুরু হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, ধোপা-নাপিত থেকে শুরু করে উকিল-মোক্তার-জমিদার-ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই বিদেশী পণ্যের ব্যবহার বর্জনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বয়কটের প্রেরণা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কয়েকটি বাস্তব পন্থাও গ্রহণ করেছিলেন। সংবাদ-পত্র, মিছিল, জনপ্রিয় সঙ্গীত ও স্বেচ্ছাসেবকদের পিকেটিং ছাড়াও, স্থির হয়েছিল যে যিনি বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার করবেন না, তাঁকে গণআদালতের সম্মুখীন হতে হবে, তাঁর ধোপা নাপিত বন্ধ হবে, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের শাসানি দেওয়া হয়েছিল যে তারা বিদেশী পণ্য কেনাবেচা করলে তাদের বিপদ হবে। সরকার তরফও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলনা, কারণ বয়কট ও স্বদেশীর প্রভাব বৃটিশ অর্থনীতির উপর বেশ ভালভাবেই পড়েছিল, সরকার তা অস্বীকার করতে চাইলেও। পুলিশকে পিকেটারদের উপর ব্যাপক লাঠি চার্জ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (এই লাঠি রেগুলেশন-লাঠি নামে পরিচিত), ব্যাপক গ্রেপ্তারীর অধিকারও দেওয়া হয়েছিল, এবং প্রকাশ্যে বন্দেমাতরম ধ্বনিকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকার এতেও থামেনি। এই আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের জন্য স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, যে সব ছেলে স্বদেশী করবে তাদের যেন স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। জমিদারদের সরকার এই বলে ভয় দেখিয়েছিল যে তাঁদেরই এলাকার দোকান বাজারে যাতে বয়কট না হয়

১৮। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃত তথ্যাবলীর জন্য দ্রঃ Majumdar R. C, *op. cit.*, II.

সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হবে, অন্যথায় বিপদ আছে। তৃতীয়ত চিরাচরিত কৌশল হিসাবে সরকার মুসলমানদের সরকারের স্বপক্ষে এবং বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে পেতে চেয়েছিল এবং চতুর্থত সরকার মিছিল, জনসভা ও সংবাদপত্র সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি কঠোর করেছিল। পক্ষান্তরে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা চার দফা কর্মসূচী নিয়েছিলেন—বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী ভাষা বর্জন, বিদেশী খেতাব বর্জন ও আইনসভা ইত্যাদি থেকে পদত্যাগ, এবং সামাজিক বয়কট, চতুর্থটি ছিল খুবই মারাত্মক। নদীয়া জেলার জনৈক চন্দ্রকান্ত পাল বিদেশী চিনি ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর জ্ঞাতিরা, ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত তাঁকে বর্জন করেছিলেন। একজন কেষ্ট নাপিত তাঁকে গোপনে কামিয়ে দিয়েছিল বলে তাকে গণধোলাই দেওয়া হয় এবং সেই কাজে অগ্রণী হয়েছিল তার নিজেরই শ্যালক।১৯

কার্যত স্বদেশী আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধস্বরূপ ছিল। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কালক্রমে ঘোষিত লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তা পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলন, পূর্ববর্তীকালের অনেক রাজনৈতিক 'অ্যাজিটেশন' যা পারেনি, জনগণকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদে দীক্ষা দিয়েছিল। তৃতীয়ত এই আন্দোলন ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসবাদের গর্ভধারণ করেছিল, ইংরাজদের সঙ্গে এই অঘোষিত যুদ্ধকে চিরকাল অর্থনৈতিক বয়কটের স্তরে আবদ্ধ রাখা যাবেনা, এ যেমন একদিকে উপলব্ধ হয়েছিল, অপরদিকে এটাও বোঝা গিয়েছিল সশস্ত্র রাজশক্তির বিরুদ্ধে সার্বিক গণযুদ্ধ সম্ভবপর নয়, একমাত্র গোপন সন্ত্রাসবাদই সাফল্যের সঙ্গে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করতে পারবে। চতুর্থত বাংলাদেশে সরকারের সঙ্গে জনগণের এই সংগ্রাম ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলি এই আন্দোলনের ফলে বিশেষ লাভবান হয়েছিল, যে আনন্দটা কলওয়ালারা চেপে রাখতে পারেনি, তা সত্ত্বেও পাশাপাশি এটাও ঠিক যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বৃটিশ অর্থনীতিকে কিছুটা আঘাত দিয়েছিল। এই আঘাতটা ঠিক কি পরিমাণে হয়েছিল তার কোন নিশ্চিত তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবেই সরকার রাখেনি। তৎকালীন স্টেটসম্যান পত্রিকা যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইংলণ্ড থেকে আমদানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল।২০ স্বদেশী

১৯। Mukherjee H and U., *op. cit.*, 29 ff.

২০। *History and Culture of the Indian People*, XI, 42-43; বিস্তৃত তথ্যাবলীর জন্য Majumdar R. C., *op. cit.*, II, 53-61.

আন্দোলন শুধুমাত্র বিদেশী পণ্য বয়কট ও দেশী পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। স্কুল কলেজের ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনের হয়ে কাজ-কর্ম বেশি করেছিল বলে তাদেরই উপর পুলিশী নির্যাতন বেশি হয়েছিল। ১৯০৫-এর ১০ই অক্টোবর তারিখে সরকার প্রতিটি স্কুলে একটি সার্কুলার পাঠায় যা কার্লাইল সার্কুলার নামে কুখ্যাত। তাতে প্রধান শিক্ষকদের নিকট স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের নামধাম দাবি করা হয়, এবং পুলিশের হাতে তাদের সমর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়। অনুরূপ আদেশ জারী করে একটি পত্র তৎকালীন ডি.পি.আই. মিঃ পেডলার কলেজ অধ্যক্ষদের নিকট পাঠান।২১ এই সার্কুলারের কথা প্রকাশ পাওয়া মাত্র তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়, এবং অনেক স্কুলের স্বাধীনচেতা শিক্ষকেরা খোলাখুলি এই নির্দেশনামাকে অস্বীকার করার অপরাধে কর্মচ্যুত হন। ১৯০৫-এর ২৪শে অক্টোবর তারিখে আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা হয় যেখানে বিপিনচন্দ্র পালের মত বক্তারা ওই সার্কুলারের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। ওই সভাতেই স্থির হয় যে স্বদেশী ধরনের শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করতে হবে। ২৭শে অক্টোবর তারিখে চারুচন্দ্র মল্লিকের গৃহে আরও একটি সভা হয়েছিল যেখানে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাত্মক বক্তব্য রাখেন।২২

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকারী হস্তক্ষেপ ও দমননীতির প্রতিবাদে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, একটি শচীন্দ্র-প্রসাদ বসু পরিচালিত অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি অপরটি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবাধীন ডন সোসাইটি। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে (১৯০৫-এর ৫ই নভেম্বর তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বক্তৃতা করেছিলেন। দুহাজার ছাত্রের এই সমাবেশে সতীশচন্দ্র ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের আহ্বান জানান। ১০ই নভেম্বর তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং আরও একজন যিনি নাম প্রকাশ করেননি লক্ষাধিক টাকা এই উদ্দেশ্যে দান করেন। আরও একজন বছরে ৩০,০০০ টাকা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে বাংলাদেশে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৯০৮ সালের মধ্যে ২৫টি মাধ্যমিক ও ৩০০টি প্রাথমিক 'জাতীয় বিদ্যালয়' গড়ে

২১। Mukherjee H. and U., *op. cit.,* 83-84.
২২। *ibid,* 89-90.

উঠেছিল, যেগুলির লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও মানবিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় ভাবধারায় পরিচালিত করা।২৩

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার বাংলাদেশের বাইরেও ঘটেছিল। গোপন সরকারী রিপোর্টসমূহ থেকে জানা যায় যে ১৯০৫-এর শেষের দিকে যুক্তপ্রদেশের ২৩টি জেলায়, মধ্যপ্রদেশের ১৫টি শহরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ২৪টি শহরে, পাঞ্জাবের ২০টি জেলায় এবং মাদ্রাজের ১৩টি জেলায় এই আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। বোম্বাই প্রদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বয়ং তিলক এবং তাঁর কন্যা শ্রীমতী কেটকার, শ্রীমতী এ. ভি. যোশী, এস. এম. পরাঞ্জপে, বিষ্ণুগোবিন্দ বিজাপুরকর এবং মহাদেব রাজারাম বোদাস। পাঞ্জাবে স্বদেশী আন্দোলন চালিয়েছিলেন জয়পাল, রাম গঙ্গারাম, চন্দ্রিকা দত্ত, এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এঁরা সকলেই ছিলেন আর্যসমাজের; মাদ্রাজে এই আন্দোলনের পত্তন করেছিলেন সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দ চারলু এবং টি. এম. নায়ার। বোম্বাই ও আমেদাবাদের এই বিষয়ে আগ্রহী হবার বিশেষ কারণ ছিল। ১৯০৫-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই সেখানকার কলওয়ালারা এক লক্ষ বেল কাপড় বাংলায় বিক্রী করেছিল, যা তাদের ছ মাসের বিক্রীর পরিমাণ। পুণায় অবশ্য ধর্মের নামে বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। লাহোরে এবং হরিদ্বারের পাণ্ডারা বিদেশী চিনিতে পুজো নিতে অস্বীকার করে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের হলে পাণ্ডারা বিদেশী পণ্য বয়কটের প্রস্তাব নেয়।২৪ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সারা ভারতেই প্রসারলাভ করে, এবং বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লজপত রায় এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯-এর মধ্যে যুক্তপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মসুলিপত্তনে একটি জাতীয় কলেজ গঠিত হয়। বোম্বাই-এ চাঁদা তুলে এবং চ্যারিটি শো মারফৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল।২৫

স্বদেশী আন্দোলন দমন করার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বৃটিশ সরকার দ্বিধা করেনি। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর ব্যামফাইলড ফুলার গুর্খা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সারা পূর্ববঙ্গে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সবচেয়ে উৎপীড়িত হয়েছিল বরিশাল মহকুমা। এই অত্যাচারের বিস্তৃত চিত্র লণ্ডনের ডেলি নিউজের সংবাদদাতা মিঃ নেভিনসন দিয়েছেন। ফুলারের অত্যাচার

২৩। Majumdar R. C., *op. cit.*, II
২৪। Mukherjee H and U *op. cit.*, 235-36.
২৫। *ibid.* 135

সম্পর্কে লণ্ডনের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা পর্যন্ত লিখেছিল যে তা জারতন্ত্রী রুশিয়াকেও বহুগুণে ছাপিয়ে গেছে।[২৬] ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল তারিখে বরিশালে আয়োজিত প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে সরকারী চণ্ডনীতির ব্যাপক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সম্মেলন স্থলে আবদুল রসুল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি যখন মিছিল করে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সেই মিছিলের উপর পুলিশ দারুণ লাঠিচার্জ করে, এবং চিত্তরঞ্জন গুহ নামক একজন যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ সুপার মিঃ কেম্পের কাছে এই লাঠিচার্জের প্রতিবাদ করতে গেলে, তাঁকে অপমানিত করা হয় এবং দুশো টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।[২৭] সম্মেলন চলাকালীন মিঃ কেম্প পুলিশ বাহিনী নিয়ে সভাস্থলে প্রবেশ করে বন্দেমাতরম ধ্বনি দেবার অজুহাতে ওই সভা ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেন।

বস্তুত এই পুলিশী দমননীতি, যা বরিশাল সম্মেলন উপলক্ষে নির্লজ্জভাবে প্রকটিত হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনকে দমন করার পরিবর্তে তাকে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের নিগ্রহের সংবাদ সারা ভারতে ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ভারতেই নয়, ইংলণ্ডে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা তাঁর ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট নামক পত্রিকায় এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। প্যারিসে মাদাম কামা ও সর্দার সিং রাণা এই উপলক্ষে একটি প্রতিবাদ সভা করেছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উত্তেজিত জনতা তাঁর ঘোড়ার গাড়ীব ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা সেই গাড়ী টেনে কলেজ স্কোয়ারে নিয়ে এসেছিল, এবং সেই মডারেট নেতা মুকুটহীন বাংলার সম্রাট বলে অভিহিত হয়েছিলেন। শাসকশক্তি অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস দেশের আবহাওয়াকেও উগ্রপন্থী করে তুলেছিল, এবং সরকারের দায়িত্বহীন কর্মসমূহ দেশকে আরও উগ্রপন্থাব দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। রাজদ্রোহের অভিযোগে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু এটা প্রমাণ করা যায়নি যে অরবিন্দই ওই পত্রিকার সম্পাদক। ফলে তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। বিপিনচন্দ্র পালকে ছমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ইংরাজ বিচারালয়কে অস্বীকার করেছিলেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাও

২৬। *ibid.* 116 ff

২৭। *A Nation in Making,* 220 ff.

করেন নি।২৮ তিনি বলেছিলেন কোন বিদেশীর পক্ষেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবেনা, এবং সত্যই বিচার শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকা, যা বিপ্লবীদের মুখপত্র ছিল, সেই পত্রিকার সম্পাদককেও বার বার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্বদেশী আন্দোলনকে ভাঙার জন্য ইংরাজ সরকার চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও আশ্রয় নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধানো হয়েছিল। নেভিনসন খোলাখুলি লিখেছিলেন, ইংরাজ কর্মচারীরা সর্বক্ষেত্রেই খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, এবং সরকারের নীতিই ছিল যে কোন মূল্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন টিঁকিয়ে রাখা। হিন্দুদের সরকারী চাকুরী দেওয়া হত না, হিন্দুদের পরিচালিত স্কুলসমূহের সরকারী সাহায্য প্রত্যাহৃত হয়েছিল, মুসলমানদের সঙ্গে হাঙ্গামা হলে পাড়ার সমস্ত হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হত। মোল্লারা একটি লাল ইস্তাহার বিলি করত, যাতে মুসলমানদের নানাভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হত। স্যার ব্যামফাইলড ফুলার সর্বদাই খোলাখুলি বলতেন তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে মুসলমানরাই সুয়োরাণী।২৯ ও'ডোনেল লিখেছেন, মুসলমানরা জানত হিন্দুদের উপর হামলা করলে আদালতে তাদের শাস্তি হবেনা এবং পার্লামেণ্টে স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুসলমানদের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন : May I ask since when has it become a part of the policy of the British people to sub-divide our possessions according to the religious tenets of their inhabitants?৩০

(১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে বারাণসী অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের উপর প্রস্তাব এনে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের সকল পন্থা ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের জনসাধারণ শেষ উপায় হিসাবে বয়কট আন্দোলনরূপী নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।) একশ্রেণীর মডারেট নেতা অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন, অর্থাৎ দেশীয় পণ্যের ব্যবহারের জন্য আন্দোলন, সমর্থন করলেও বয়কট আন্দোলন, অর্থাৎ বৃটিশ পণ্য বর্জনের জন্য আন্দোলন পছন্দ করেন নি। উদাহরণস্বরূপ গোপালকৃষ্ণ গোখলের নাম করা যায়।৩১ কিন্তু এই দুই আন্দোলনই চিরাচরিত রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এবং প্রথমটি ব্যতিরেকে দ্বিতীয়টি সার্থক হতে পারত না। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি

২৮। Ray P. C., *C. R. Das* (1927), 57.
২৯। Nevinson H. W., *The New Spirit in India* (1908), 192-93, 202
৩০। O'Donnell, *op. cit.*, 67, 72-73, 83.
৩১। *Speeches of G. K. Gokhlae* (1920), 1133.

তখনও নেতারূপে পরিচিত হননি, ১৯০৮ সালে লিখেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে যাবারই প্রথম অবস্থা। এ তাবৎ আমরা আমাদের অভিযোগ নিবেদন করেই ক্ষান্ত হতাম, কিন্তু বাংলাদেশ দেখিয়েছে যে সমস্ত কিছুর পিছনেই শক্তি যোগান যায়। স্বদেশী আন্দোলন মানুষের মন থেকে ইংরাজ ভীতি দূর করেছে, মানুষকে দুঃখবরণ করতে শিখিয়েছে, জাতীয় জাগরণের পক্ষে এর চেয়ে বড় কথা আর কিছুই নেই।৩২ ভ্যালেণ্টাইন চিরোল লিখেছিলেন : দেশবিভাগের প্রশ্নটাই আসলে তলিয়ে গিয়েছিল। ভাঙা বাংলা ভাঙা থাকবে কি তা জোড়া লাগবে, এটা আর বড় প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল, অতঃপর বৃটিশ শাসন বাংলা তথা ভারতবর্ষে থাকবে কি থাকবে না।৩৩ উইল ডুরাণ্ট যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন যে (১৯০৫ সাল থেকেই ভারতীয় বিপ্লব শুরু হয়েছিল।৩৪)

স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি তিলক, অরবিন্দ, লজপত রায়, বিপিন পাল প্রমুখ মনীষীরা করেছিলেন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ব্যতিরেকে সে জাতীয়তাবাদ মানুষের ঘরে ঘরে পেঁৗছাত না। ভারতের চিরাচরিত রাজনীতির ক্ষেত্রে, আমরা আগেই বলেছি, স্বদেশী আন্দোলন সমস্ত পুরাতন ধারণাসমূহকে ওলোট-পালট করে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে অর্জিত নতুন জাতীয়তাবাদ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল, কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী মডারেট ও একস্ট্রীমিস্ট, দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অনেক নরমপন্থী নেতা, যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, চরমপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি লিখেছিলেন, লর্ড কার্জন এবং তাঁর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা, যা জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে করা হয়েছিল, তা বৃটিশ সম্পর্কে আমাদের সকল মোহের বিনাশ ঘটিয়েছিল। চরমপন্থীরা, তিলক, লজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, খাপার্দে প্রভৃতির নেতৃত্বে সর্বভারতীয় প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে ইংলণ্ডে লিবারেল পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতভেদ চরমে উঠেছিল। কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন, যা সম্পূর্ণভাবে জনমতকে অগ্রাহ্য করে চালিত হয়েছিল, বৃটিশ জাতির ন্যায়বোধের প্রতি নরমপন্থীদের বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। তথাপি জন মোর্লে ভারত সচিব নিযুক্ত হলে নরমপন্থী নেতারা পুনরায় আশা করতে শুরু

৩২। *Hind Swaraj* (1909), 15-18.
৩৩। Chirol V., *Indian Unrest* (1910), 88.
৩৪। *A Case for India* (1930), 113

করেছিলেন যে তাঁদের পুরাতন পদ্ধতিকে হয়ত আবার প্রয়োগ করা চলতে পারে। বৃটিশ সরকারের তরফ থেকেও কিছুটা অনুকূল সংকেত ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী আদর্শের আমদানীতে ইংরাজ আতংকিত বোধ করেছিল, এবং অতঃপর তাদের নীতি হয়েছিল যে নরমপন্থী নেতাদের নিজেদের অনুকূলে রাখা, এবং তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে বোঝাপড়া করে নেওয়া। কিছুকালের জন্য এই নীতি সফল হয়েছিল, যা আমরা পরে দেখব।

স্বদেশী আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে যেমন এক চরমপন্থী রাজনীতির আমদানী করেছিল, কংগ্রেসের বাইরেও আরও একটি উগ্রপন্থী গুপ্ত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, যার আদর্শ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ। বঙ্গভঙ্গের কয়েক বছর পর থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন বৈপ্লবিক গোষ্ঠী-সমূহ তৎপর হতে শুরু করেছিল। এঁদের পথ, বলাই বাহুল্য, কংগ্রেসের নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের পথ ছিল না, কংগ্রেসের চরমপন্থীদের কিছুটা ব্যাপক ধরনের অহিংস বিক্ষোভও ছিল না। এঁরা বিশ্বাস করতেন ইংরাজকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে গেলে একমাত্র বোমার দ্বারাই তা করা সম্ভব। এদেশ থেকে ইংরাজদের সশস্ত্র যুদ্ধে উচ্ছেদ করার যে প্রচেষ্টা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছিল, বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ছিলেন তারই উত্তরসাধক। বিরাট ইংরাজবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যুদ্ধ অসম্ভব ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে, কেননা তার জন্য খুব দৃঢ় সংগঠন এবং প্রভূত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে বৈদেশিক শক্তির সহায়তায় ইংরাজকে ভারত থেকে উৎখাত করা সম্ভব। এঁদের কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। কিন্তু ভিতরের শক্তিগুলিও নিশ্চেষ্ট ছিল না।

বহুমুখী আন্দোলনের সূচনা ঃ সরকারী ভেদনীতি (১৯০৬-১০)

১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯০৫ সালের অধিবেশনে, যা ২৭ থেকে ৩০শে ডিসেম্বরে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইতিমধ্যেই ঘটে যাওয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ওই অধিবেশনে উপস্থিত ৭৫৮ জন সদস্য এই বিষয়ে সরকারের কার্যাবলীর উত্তেজনাপূর্ণ ও আবেগদীপ্ত সমালোচনা করেন। এটা অভূতপূর্বই ছিল।[১] স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা করে সভাপতি গোখলে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের সাবজেক্টস কমিটিতে প্রস্তাবসমূহ আলোচনার কালেই গণ্ডগোল দেখা গেল। সমস্যা সৃষ্টি হল বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাবে মডারেট বা নরমপন্থীরা আপত্তি জানালেন, পক্ষান্তরে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বয়কট আন্দোলনকে সোৎসাহে সমর্থন জানালেন। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতভ্রমণ নিয়ে। নরমপন্থীরা তাঁকে সানন্দ অভিনন্দন জানাতে উৎসুক ছিলেন, স্বয়ং গোখলে এ বিষয়ে লর্ড মিণ্টোকে আশ্বাস দিয়েছিলেন,[২] কিন্তু চরমপন্থীরা তাঁকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত গোঁজামিল দিয়ে অবস্থার সামাল দেওয়া গেল। যাতে সর্বসম্মতিক্রমে যুবরাজকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে তার সুযোগ দেবার জন্য চরমপন্থীরা সভামণ্ড ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন, এবং বিনিময়ে নরমপন্থীরাও বয়কট সম্পর্কে একটা মৃদুভাষায় রচিত প্রস্তাব নিলেন। তিলক এই অধিবেশনে কংগ্রেসের কর্তাভজা নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন, এছাড়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের স্বপক্ষে তিনি সাহসিকতাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ ও ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অভিনন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯০৫-এর কংগ্রেসে যে গোঁজামিল দিয়ে কাজ চলেছিল, পরবর্তী বছরে তাতে কাজ হয়নি। ১৯০৬ সালে দুই দলের মধ্যে বিরোধটা খুব স্পষ্টভাবেই দেখা গেল। ১৯০৫-এর শেষের দিকে রুশ-জাপান যুদ্ধে

১। Besant A., *How India Wrought for Freedom,* (1915), 426-27.
২। Minto Mary, *Minto and Morley,* (1934). 20

জাপানের জয়লাভ, ইউরোপীয় জাতিসমূহের অজেয়তার ধারণাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, এবং এই ঘটনা থেকে চরমপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশে চরমপন্থীদের জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল। নরমপন্থীদের আশা ছিল যে লিবারেল পার্টি ইংলণ্ডে ক্ষমতায় আসার দরুণ, এবং উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী জন মোর্লে ভারত সচিব হবার ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটবে, কিন্তু জন মোর্লে তাঁদের নিরাশ করলেন। উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে চরমপন্থীদের ঘাঁটি কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। চরমপন্থীরা সভাপতিরূপে তিলকের নাম প্রস্তাব করেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু গোলমাল এড়ানোর জন্যই শেষ পর্যন্ত দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হয়। বিরাশী বছর বয়স্ক এই 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান'কে এই ভেবেই সভাপতি করা হয়েছিল যে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতির দ্বারা অবস্থার সামাল দেবেন, এবং এই উদ্দেশ্য কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিল। এই অধিবেশনে ১৬৬৩ জন প্রতিনিধির সমাবেশ ঘটেছিল এবং বিশ হাজার দর্শক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এক হিসাবে যা অভূতপূর্ব। সভাপতির ভাষণে দাদাভাই নৌরজী যা বললেন তা থেকে বোঝা গেল যে সাম্প্রতিক আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। বস্তুত দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে থাকার ফলে তিনি ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছিলেন বললেই হয়। অবশ্য তাঁর ভাষণে এই প্রথমবার কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে স্বরাজের দাবি উত্থিত হয়, এবং এই 'স্বরাজ' শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়। বঙ্গভঙ্গের উপর প্রস্তাব আনেন নবাব খাজা আতিকুল্লা, যিনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থক নবাব সলিমুল্লার ভাই ছিলেন। এই কারণেই তাঁর আনা বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রস্তাব কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। বয়কট সম্পর্কে প্রস্তাব নেবার সময় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এবং শেষ পর্যন্ত অনেক বিতর্কের পর, বয়কট আন্দোলনকে 'বৈধ' বলে ঘোষণা করা হয়।[৩] 'দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন' এই অর্থে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়, এবং জাতীয় শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। চরমপন্থীরা, বলাই বাহুল্য, ১৯০৬-এর অধিবেশনে খুশি হতে পারেন নি, এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে জোড়াতালি দিয়ে আর চালানো চলছে না, তাঁদের বিদায় নিতেই হবে।

৩। Besant, *op. cit.*, 452

১৯০৬-এর ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই প্রতিনিধিদলের দাবি ছিল আইনসভা ও অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত করতে হবে, বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন মুসলমানকে রাখতে হবে, একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তুলে দিয়ে সিভিল সার্ভিসে মুসলমানদের স্থান সংরক্ষিত করতে হবে, প্রত্যেক হাইকোর্টে মুসলমান বিচারপতি রাখতে হবে ইত্যাদি। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং সরকারই ছিল এর মুখ্য উদ্যোক্তা, এবং এটার পরিকল্পনা করেছিলেন আলিগড় কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আর্চবোলড এবং বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ডানলপ স্মিথ। মুসলমানদের এইভাবে বিশেষ মদত দেওয়া যে সরকারী পরিকল্পনারই অঙ্গ ছিল, এবং উপরিউক্ত ঘটনাটি যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়েছিল, একথা শুধু পরবর্তীকালের মহম্মদ আলিই ফাঁস করেন নি, লেডী মিণ্টো এবং র‍্যামজে ম্যাকডোনালডও দ্বিধাহীনভাবে তা লিখে গেছেন।৪ শুধু তাই নয়, এই বিশেষ ডেপুটেশনটিকে ইংলণ্ডে ভালভাবে প্রচার করাব ব্যবস্থাও হয়। ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় ভারতের মুসলমান সম্পর্কে অনেক দরদ দেখানো হয়, এবং ভারতসচিব মোর্লে লর্ড মিণ্টোর এই অপূর্ব কূটনীতির প্রশংসা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। প্রত্যুত্তরে মিণ্টো যা লিখেছিলেন, বুচানের ভাষায়, তা ঐশ্লামিক অধিকারসমূহের একটি সনদ বিশেষ।৫ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া মাত্রই মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক দলগঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। স্যার সৈয়দ আহমদের নির্দেশ ছিল মুসলমানদের যেন কোন কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন না গড়ে তোলা হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেই নেতা বুঝেছিলেন যে বৃটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলিম তোষণ করবে, এবং আখেরে সেটাই হবে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড় লাভ। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলে ঘটনাচক্রে সেই দল বৃটিশবিরোধী হয়ে উঠতে পারে, সেই দল সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়তে পারে, তাতে মুসলমান সমাজেরই সমূহ ক্ষতি। কিন্তু যা অনিবার্য, তাকে রোধ করা যায় না, বিশেষ করে ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে সরকার খুবই বিব্রত, এবং সরকারের যখন মনোগত ইচ্ছা যে এই রকম একটি দল

৪। Minto, *op. cit.*, 45-48; Macdonald R., *Awakening of India*, 176.
৫। Buchan J., *A Memoir,* (1924). 244.

গঠিত হোক। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মুসলিম লীগের জন্ম হল। লীগের সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন যে হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক ঐক্য স্থাপনে তাঁদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভবপর নয়, কেননা তা করতে গেলে উভয় তরফেরই উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে হিন্দুরা এবং কংগ্রেসীরা ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়াতে চায়, তাদের এই চিন্তাধারা মুসলমান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্ন ওঠেনা।

একদিকে এই যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপর দিকে সশস্ত্র বিপ্লববাদ এখানে ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে যাঁরা আস্থা হারিয়েছিলেন, সেই বিপ্লবীরা যেমন দেশের অভ্যন্তরে বোমার রাজনীতির সূচনা করছিলেন, দেশের বাইরে থেকেও কেউ কেউ নানাভাবে ভারতকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বাংলা 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা কর্তৃক তা অভিনন্দিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ওই প্রতিষ্ঠান কলকাতা থেকে একটি চিঠি পায় যাতে ভারতে ওই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা খোলবার জন্য অনুরোধ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং-এর পুত্র দলীপ সিং, যিনি ইংলণ্ডে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, ১৮৮৫ সাল থেকে রুশিয়া ও ফ্রান্সে ইংরাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। রুশ সহায়তায় এদেশ থেকে ইংরাজদের উচ্ছেদ করার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তা অবশ্য সফল হয়নি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অরবিন্দ ঘোষ 'লোটাস এণ্ড ড্যাগার' নামে একটি গুপ্ত সমিতি খোলেন। তাঁর সহযোগী চারুচন্দ্র দত্ত আইরিশ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁরা কিছু অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে আয়র্ল্যাণ্ডের আটটি পার্লামেণ্টীয় আসন ভারতীয়দের ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনের বাসিন্দা হন, যিনি বৈপ্লবিক মনোভাব-সম্পন্ন ভারতীয়দের জন্য লণ্ডনে নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। সর্দার সিং রাণা নামক আরও একজন বিপ্লবী, যিনি পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী, দুহাজার টাকা মূল্যের তিনটি বৃত্তি ওই একই উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। শ্যামজীর কর্মক্ষেত্র ছিল লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস, এবং সর্দার সিং রাণার কর্মক্ষেত্র ছিল প্যারিস শহর যেখানে তিনি বাস করতেন। ১৯০২ সালে প্যারিসে একজন পার্শীজাতীয় ভারতীয় মহিলা বিপ্লবী উপস্থিত হন। 'ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী' হিসাবে উল্লিখিত এই ভদ্রমহিলার নাম মাদাম ভিকাজী রোস্তম কামা। মাদাম কামা ইউরোপে

ভারতীয় বিপ্লবের স্বপক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিং রাণা ও মাদাম কামা এই তিনজন প্রবাসী বিপ্লবী পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন। ১৯০৫-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্যামজী 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি'র পত্তন করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালান। এই প্রচারের জন্য তিনি একটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন যার নাম 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট'। শ্যামজীর দাবি ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং তার জন্য তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনকে পথ হিসাবে বেছে নেন। শ্যামজী মূলত অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী হলেও, প্রয়োজনে হিংসাশ্রয়ী পথেরও যথার্থতা স্বীকার করতেন। শ্যামজীর তুলনায় সর্দার সিং রাণা ও মাদাম কামা অধিকতর বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। লণ্ডনে শ্যামজী যে সকল বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রকে কাছে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, লালা হরদয়াল ও মদনলাল ধিংড়া।৬

ভারতের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তি যখন এককভাবে অথবা যৌথভাবে কাজ করছিলেন ভারতের অভ্যন্তরেও বৈপ্লবিক শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদের জাগরণ সম্পর্কে কিছু কথা আমরা অনুশীলন সমিতির উদ্ভব প্রসঙ্গে পূর্বে বলেছি। অনুশীলন সমিতির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল, এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে তার শাখা স্থাপিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পাল গোড়ায় এই সমিতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন, সম্ভবত মতদ্বৈধতার ফলে। ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্র পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ এবং পুলিন দাসকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর ঢাকায় অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময়ই অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে দলে টানেন। তাঁর সহযোগী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। ১৯০৫ সালেই বারীন্দ্রের ভবানী মন্দির বইটি প্রকাশিত হয় যে বই-এ তাঁদের আদর্শের কথা ব্যক্ত করা হয়। ১৯০৬ সালে কলকাতায় সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে বিপ্লবীদের একটি সম্মেলন হয়, এবং বিভিন্ন জেলার বিপ্লবীরা তাতে যোগ দিয়ে নিজেদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৬। এই বিষয়ে অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' দ্রষ্টব্য।

ওই বছরেই মার্চ মাসে বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তর প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পিছনে ছিলেন, বারীন্দ্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন দত্ত। মহারাজা সূর্যকান্ত অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক জনৈক মুন্সেফ যুগান্তর পত্রিকার জন্য প্রভূত স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। যুগান্তর পত্রিকা খোলাখুলিভাবেই বিপ্লবাত্মক বক্তব্য প্রকাশ করত। বাংলাদেশ ছাড়া মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ১৯০৪ সাল থেকে বিপ্লবী শক্তিসমূহ সক্রিয় হয়েছিল, এবং ভারতের আরও কয়েকটি অঞ্চলে আরও কিছুকাল পর থেকে। ফাড়কে ও চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্তরাধিকারী বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯০৪ সালে 'অভিনব ভারত' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। অনুশীলন সমিতির মতই এই সংস্থার বিভিন্ন গুপ্ত শাখা ছিল। সাভারকর নিজে মাৎসিনীর জীবনীর মারাঠী অনুবাদ করেছিলেন, এবং তা প্রচুর সংখ্যায় বিক্রয় হয়েছিল। ১৯০৬ সালে সাভারকর ইংলন্ড চলে যান, সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এবং সেখান থেকে মির্জা আব্বাস, সিকন্দর হায়াৎ প্রভৃতির মারফত অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে শুরু করেন। এর ফলে কি হয়েছিল তা আমরা একটু পরে উল্লেখ করব। পাঞ্জাবে ১৯০৪ সালে সাহারাণপুর জেলায় জে. এম. চ্যাটার্জী প্রমুখের চেষ্টায় একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির কর্মকেন্দ্র পরে রুরকীতে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকেই এই সমিতির অধিকাংশ সদস্য সংগৃহীত হয়েছিল। লালা হরদয়াল, অজিত সিং এবং সুফি অম্বাপ্রসাদ এই সমিতিতে যোগদান করে-ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গেও শিরিষচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মারফত এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ হয়েছিল। লজপত রায়, যদিও তিনি কংগ্রেস করতেন, গোপনে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতেন। এই সমিতির অন্যতম নেতা লালা হরদয়াল অস্ত্রের সন্ধানে ইউরোপে পাড়ি দেন।

১৯০৭ সালটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত। ১৯০৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের যে সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, ১৯০৭-এর সুরাট অধিবেশনে তা নগ্ন-ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মডারেট নেতাদের সঙ্গে সরকারের ইতিমধ্যেই একটা বোঝাপড়া হয়েছেল,[৭] এবং তাঁরা চরমপন্থীদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের সুযোগ খুঁজছিলেন। এটা চরমপন্থীরাও বুঝতে পেরেছিলেন।

৭। Minto, *op. cit.*, 99 ff.

কলকাতা অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে ১৯০৭-এর অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু নাগপুরের পরিবর্তে সুরাটকেই নির্বাচিত করা হল যেখানে নরমপন্থী নেতা ফিরোজশা মেটার বিশেষ প্রভাব ছিল। চরমপন্থীদের দাবি ছিল লজপত রায়কে সভাপতি করা হোক, কেননা তিনি সদ্য কারামুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁকে সভাপতি করলে জনচিত্তে কংগ্রেসের ইমেজ ভাল হত। কিন্তু নরমপন্থীরা ডঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করলেন। অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এড়ানোর জন্য লজপত রায় নিজেই সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নরমপন্থীদের আসল উদ্দেশ্যটা প্রকাশিত হল যখন দেখা গেল যে আলোচনার তালিকা থেকে বয়কট আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় শিক্ষা বাদ পড়েছে। চরমপন্থী তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ এই-গুলিকে আলোচনাসূচীর মধ্যে ঢোকানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু নরমপন্থী নেতারা তা হতে দিলেন না। ফলে অধিবেশনের পূর্ব থেকেই আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ২৬শে ডিসেম্বর ১৬০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যখন ডঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাবিত হল এবং তা সুরেন্দ্রনাথ যখন সমর্থন করতে উঠলেন সভাগৃহে না না ধ্বনি উঠল, ফলে সেই দিন অধিবেশন স্থগিত রইল। পরদিনও ওই একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। তিলক চরমপন্থীদের বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে উঠতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হলনা। পক্ষান্তরে ফিরোজশা মেটা এবং সুরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে মঞ্চে একজোড়া পাদুকা নিক্ষিপ্ত হল। পরদিন ২৮শে তারিখে তিলক একটি লিখিত চিঠির দ্বারা জানালেন যে স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে গত বছরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি যদি এবারেও বজায় রাখা হয় তাহলে তাঁরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি হিসাবে মেনে নেবেন। কিন্তু নরমপন্থীরা এতে রাজি না হয়ে পরদিন ২৯ তারিখে একটি নিজেদের মধ্যে কনভেন-শন আহবান করে স্থির করলেন যে চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁরা কোন সম্পর্ক রাখবেন না। সোজা কথায় চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন। এই নাটকের নেপথ্যে অবশ্য দুজন ইংরাজের হাত ছিল, একজন জন মোর্লে এবং অপরজন লর্ড মিণ্টো।

এদিকে যখন ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা সুস্পষ্টভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবার পথে পা বাড়িয়েছেন, অপরদিকে ইউরোপ মহাদেশে তখন ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে সক্রিয়-ভাবে কাজকর্ম শুরু করেছেন। (১৯০৭ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সোসালিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভরতের তরফ থেকে মাদাম কামা ও সর্দার সিং রাণা সেখানে

প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মাদাম কামা সেখানে ভারতে বৃটিশ অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি সহকারে একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত (সবুজ, হলদে ও লাল) পতাকা প্রদর্শন করেন।৮ সম্ভবত এই পতাকাটির পরিকল্পনা করেছিলেন ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো। এই সংবাদ সুবিস্তৃতভাবে মাদাম কামার বক্তৃতার পূর্ণ বয়ান সহ ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে বৃটিশ পত্রপত্রিকাগুলি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর বিপ্লবী মনোভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিবাদে শ্যামজী লেখেন তিনি তাঁর পত্রিকায় এ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে কোন ওকালতি করেন নি, তবে এও সত্য যে যদি তার প্রয়োজন হয় তিনি নিশ্চয়ই সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষেই বলবেন। যাই হোক এরপর শ্যাম লণ্ডনে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না, ১৯০৭ সালেই তিনি প্যারিসে চলে এলেন। শ্যামজীর অনুপস্থিতিতে ইণ্ডিয়া হাউসের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল সর্দার সিং রাণা ও সাভারকরের উপর। সাভারকর ওই বছরেই ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) অর্ধশতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান করলেন, যেটা ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মোটেই সুনজরে দেখেনি। ১৯০৭ সালে আমেরিকার কালি-ফোর্ণিয়া শহরে পাণ্ডুরং খানখোজে, খগেন্দ্রনাথ দাস, তারকচন্দ্র দাস এবং অধরচন্দ্র লস্কর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেন। ৪০০ সদস্য-যুক্ত এই প্রতিষ্ঠান দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। আমেরিকা প্রবাসী শিখদের মধ্যেই তাঁদের প্রভাব বেশি ছিল। আমেরিকা থেকে তাঁরা বিপ্লবী পুস্তিকা ও প্রচারপত্রসমূহ ভারতে পাঠাতেন।

দেশের অভ্যন্তরের আবহাওয়াও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭-এর ৯ই থেকে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত বন্দেমাতরম পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর প্রবন্ধ লেখেন যাতে কার্যত বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সর্ববিষয়ে অসহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসের ফলে চরমপন্থীদের সংগঠন তৈরী করার দায়িত্ব অরবিন্দের হাতে এসে পড়ে। সুরাট কংগ্রেসের পর তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে জাতীয়তাবাদ ও চরমপন্থী আদর্শ প্রচারের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এদিকে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের মুখপত্র যুগান্তরের কাটতি ভীষণ বেড়ে

৮। মাদাম কামা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য *Essays Presented to Sir Jadunath Sarkar*, 227 ff.

যায়, এবং ১৯০৭তেই তা ৭০০০-এ দাঁড়ায়। আমরা আগেই বলেছি যুগান্তর পত্রিকা খোলাখুলিভাবেই সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলত, এবং যুগান্তরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধাবলী থেকে বাছাই করে একটি সংকলন প্রকাশিত হয় যার নাম ছিল 'মুক্তি কোন্ পথে?' বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৭-এর মে মাসে কলকাতায় একটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন যাতে খোলাখুলিভাবেই তিনি বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করার দাবি জানান। ওই বছরেই ২৭শে মে তারিখে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার পরেই জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতায় বোমা তৈরীর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন, এবং বলেন যে প্রত্যেক অমাবস্যার রাত্রে ১০৮টা করে সাদা জানোয়ার বলি দেওয়া দরকার। ১৯০৭ সালে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে পূর্বোক্ত 'অভিনব ভারতের' শাখা ছাড়াও অনুরূপ গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং নাসিক, বোম্বাই, পুণা, কঠুরা, পেন প্রভৃতি স্থানে বোমা তৈরীর গুপ্ত কারখানা স্থাপিত হয়। সবচেয়ে বড় কারখানা স্থাপিত হয় বোসিনে। পাঞ্জাবের আর্যসমাজের অনেক সদস্য লজপত রায় ও অজিত সিং-এর গ্রেপ্তারের পর বোমা তৈরীর ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যার সূত্রপাত ও'ডোয়ারের মতে ১৯০৭ থেকেই।৯ কিন্তু আসল কাজ শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশে। ১৯০৭-এর অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলার নিতাইগঞ্জে রাজনৈতিক ডাকাতি হয় এবং ওই বছরেই ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে গোয়ালন্দে ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যালেন গুলিবিদ্ধ হন। উল্লাসকর দত্ত, যিনি ছিলেন বোমাবিশারদ, বারীণ ঘোষের দলে যোগ দেন, এবং ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোডের একটি বাগান বাড়ী বোমা তৈরীর কেন্দ্র হয়। হেমচন্দ্র দাস সম্পত্তি বিক্রী করে প্যারিস থেকে বোমা তৈরীর কলাকৌশল শিখে এসে উল্লাসকরের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তাঁরা যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে পুরোপুরিভাবেই নেমে যান। বারীন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীগণ পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী লেফটন্যান্ট গভর্ণর ব্যামফাইলড ফুলারকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে এই পরিকল্পনার পিছনে সুরেন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল। তিনি এই বাবদে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেবারও নাকি আশ্বাস দিয়েছিলেন।১০ অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনায় এ বক্তব্য সমর্থন করেন নি।১১ প্রফুল্ল চাকী এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ করেন নি। পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করা হয় বাংলার লেফটন্যান্ট

৯। O'Dwyer M. F., *India as I knew it*, (1925), 184.

১০। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, (1955), I, 228-30.

১১। *A Nation in Making*, 233-34.

গভর্ণরকে যিনি ১৯০৭-এর ৬ই ডিসেম্বর ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। ট্রেন লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বটে, কিন্তু তাতে কোন প্রাণহানি ঘটেনি। পরবর্তী লক্ষ্য ছিলেন মজঃফরপুরের বিচারক মিঃ কিংসফোর্ড, যাঁকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ভুলক্রমে জনৈক মিঃ কেনেডীর পত্নী ও কন্যাকে হত্যা করেন। প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারের পূর্বেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম ধৃত হন এবং ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তার দুদিন পরে ২রা মে তারিখে পূর্বোক্ত মুরারিপুকুর রোডের বাগান বাড়ীর তল্লাসী হয় এবং সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। পুলিশ এই ব্যাপারে অরবিন্দ ঘোষ সহ ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করে।[১২]

এই ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী নামে অভিহিত হবার পরিবর্তে বীরের মর্যাদা পান। অরবিন্দ প্রমুখের যে বিচার হয়েছিল তা আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে ব্যারিস্টার চিত্ত-রঞ্জন দাশও প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তুলে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে কেন্দ্র করে বহু লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছিল। আলিপুর বোমার মামলায় পনেরজন দোষী সাব্যস্ত হন, অরবিন্দ সহ বাকি সকলে মুক্তিলাভ করেন। এই পনেরজনের মধ্যে বারীন্দ্র সহ অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। মুরারিপুকুর বিপ্লবী কেন্দ্রের সন্ধান পুলিশ নরেন্দ্র গোঁসাই নামক জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে পায়, যে পূর্বে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ব্যক্তিকে জেলের অভ্যন্তরে সতোন বসু ও কানাই-লাল দত্ত হত্যা করেন। এই কাজ বাঙালীমাত্রের দ্বারাই অভিনন্দিত হয়েছিল। কানাইলালের ফাঁসি হবার পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে অভূতপূর্ব মিছিল বেরিয়েছিল। এই ঘটনা সরকারকে এত ভীত করেছিল যে এরপর কোন বিপ্লবীর মৃতদেহ তারা বাইরে বার করত না। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েকজন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হলেও, বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়নি। ১৯০৮-এর ১১ই এপ্রিল তারিখে চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ১৫ই মে তারিখে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাপক বোমাবাজি হয় এবং তারপর থেকে ওই ঘটনা বেড়েই চলে। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে রাজনৈতিক ডাকাতি। ৫ই জুন তারিখে ঢাকা জেলার বারহা গ্রামে এবং ৩০শে অক্টোবর তারিখে ফরিদপুরের নরিয়া বাজারে দুটি বড় ডাকাতি হয়। এ ছাড়া ওই একই বছরে মৈমনসিংহের বিজিতপুর,

---

১২। বিপ্লব আন্দোলন প্রসঙ্গে Majumdar, *op. cit.*, II, 265 ff. দ্রষ্টব্য।

নদীয়ার রতিয়া এবং বরিশালের দেহরগতিতে ছোটখাট রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছিল। গুপ্তহত্যার সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছিল। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে কলকাতার ওভারটুন হলে বাংলার লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। ওই দিনেই কলকাতার সার্পেণ্টাইন লেন-এ সাব-ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করা হয়। তার মাত্র ৫ দিন পরে ১৪ই নভেম্বর তারিখে ইনফরমার সন্দেহে রমণায় সুকুমার চক্রবর্তী ও আনন্দ ঘোষকে এবং হাওড়ায় কেশব দাসকে হত্যা করা হয়।

বিহারে পাটনা, দেওঘর ও দুমকায় অনুশীলন সমিতির আদর্শে কয়েকটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান ১৯০৮ সাল থেকে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। দুমকার বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ও প্রভুদয়াল মারোবারীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের পরবর্তীকালের একটি জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে বিহারের বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের রীতিমত যোগাযোগ ছিল। পাঞ্জাবে ১৯০৮ সালে লালা হরদয়াল বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর সেখানকার বিপ্লবী সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে, যদিও তাদের কার্যক্রম সুরু হয়েছিল পরের বছর থেকে। মহারাষ্ট্রে শুধুমাত্র পুণা শহরেই তিনটি বোমারু গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—খারে গোষ্ঠী, কোলাপুর গোষ্ঠী এবং মহাজন গোষ্ঠী। এ ছাড়া আরও বহু গোষ্ঠী সারা দেশে ছিল। ১৯০৮-এ তিলকের ছয় মাস জেল হবার আদেশ ঘোষিত হবার পর, বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থা তৎপর হয়ে ওঠে। কোলাপুর গোষ্ঠীর দামোদর যোশী ব্যাপকভাবে বোমা উৎপাদনে নিযুক্ত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে যায় এবং বিখ্যাত কোলাপুর বোমার মামলা শুরু হয়, যাতে অনেক বিপ্লবীর দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়। রাজস্থানের অর্জুনলাল শেঠি, ভারতকেশরী সিং এবং রাও গোপাল সিং, বারাণসীর শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতিরা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। একটি গোপন রিপোর্টে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যার যে সকল বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটেছিল, এবং সেগুলির সঙ্গে অপরাপর স্থানের বিপ্লবীদের কি ধরনের সম্পর্ক ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বারাণসী, পাটনা ও বাঁকিপুর অঞ্চলে শচীন্দ্র সান্যালের কার্যাবলী ও সংগঠনসমূহের ব্যাপক পরিচয় দেওয়া আছে।[১৩] দক্ষিণ ভারতেও বিপ্লববাদ ১৯০৮ সাল থেকে তীব্র হয়ে দেখা দিতে শুরু করে। মার্চ মাসে চিদাম্বরম পিল্লাই এবং

১৩। রিপোর্টটি W. Sealy-র সম্পাদনায় বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। শচীন্দ্র সান্যালের 'বন্দীজীবনে'-ও অনেক তথ্য আছে।

সুব্রমনিয়া শিব টিনেভেলীতে রাজদ্রোহমূলক কাজকর্মে উৎসাহ দিয়ে বক্তৃতা দেন যার ফলে কয়েক স্থানে হাঙ্গামা বাধে এবং সরকারী গৃহসমূহ, দলিল ও আসবাবপত্রাদি ধ্বংস করা হয়।

এরপর আমরা দেখব ১৯০৭-৮ সালে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কি ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেস থেকে চরমপন্থীদের বার করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৮-এর এপ্রিলে নরমপন্থীরা এলাহাবাদে মিলিত হয়ে একটি গঠনতন্ত্র তৈরী করেন, যা অনুযায়ী পূর্বতন আবেদন-নিবেদনের পথকেই কংগ্রেসের 'ক্রীড' বলে পুনরায় ঘোষণা করা, এবং এই ক্রীডে স্বাক্ষরদান ও সমর্থন ব্যতীত কংগ্রেস-প্রতিনিধি হবার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে ১৯০৬ সালের অধিবেশনে গৃহীত বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবাবলী সযত্নে পরিহার করা হয়। বলাই বাহুল্য এই কাজের ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থীদের কোন পাল্টা সংগঠন গড়ে ওঠেনি, কেননা লজপত রায় ১৯০৭ সালেই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯০৮-এ, এবং ওই বছরেই তিলকের ছয় বছর কারাদণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস ছাড়া আর যে দলটি ছিল তা হচ্ছে মুসলিম লীগ। ১৯০৭-এ মুসলীম লীগের করাচী অধিবেশনে, এবং ১৯০৮-এর অমৃতসর অধিবেশনে মুসলীম লীগ বৃটিশের সঙ্গে সমঝোতার নীতি অবলম্বন করে, এবং কংগ্রেসের পুরাতন নীতির অনুরূপ ইংলণ্ডে তাদের একটি প্রচারযন্ত্র স্থাপন করে, সৈয়দ আমীর আলীর মারফত। মোর্লে মিণ্টো সংস্কার পরিকল্পনাকে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্যও মুসলিম লীগ আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং কিয়দংশে সফলও হয়। এদিকে বৃটিশ সরকারও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না। জাতীয়াতবাদী, চরমপন্থী এবং বিপ্লবীদের দমন করার জন্য সবরকম ব্যবস্থাই তারা গ্রহণ করেছিল। ১৯০৭-এর সিডিসাস মীটিংস অ্যাক্টের দ্বারা জনসভার উপর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে রচিত হয়েছিল এক্সপ্লোসিভ সাবস্টান্সেস অ্যাক্ট, এবং ওই বছরেই রচিত হয়েছিল নিউজপেপার অ্যাক্ট যার দ্বারা 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অরবিন্দ, লজপত রায় ও তিলকের গ্রেপ্তারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৮-এর ১৬ই ডিসেম্বর অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯০৯ সালের সংস্কার আইন, যা ভারতসচিব জন মোর্লে এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর হাতের গুণে রচিত, কোন তরফকেই খুশি করতে পারেনি, যদিও মুসলিম লীগ কিছুটা হৃষ্ট হয়েছিল। এই আইনে অবশ্য একজন ভারতীয়কে বড়লাটের কার্যনির্বাহক সভায় স্থান দেওয়া হয়েছিল, প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক পরিষদসমূহে কিছু ভারতীয়ের স্থান হয়েছিল, এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যসংখ্যা কিছু বর্ধিত করা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থায় নরমপন্থী কংগ্রেসও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৯০৯-এর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। চরমপন্থীদের, বলাই বাহুল্য, এ বিষয়ে কোন মাথাব্যথা ছিলনা। বিপ্লবীরাও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, ছিটেফোঁটা অনুগ্রহ পেয়ে যে কোন লাভ হয়না, সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁরা পূর্বের মতই কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাস আলিপুরে নিহত হন, এবং ৩রা জুন তারিখে প্রিয়নাথ চ্যাটার্জী, যাঁকে অবশ্য ভুল করে হত্যা করা হয়েছিল। ওই বছরের ১১ই অক্টোবর তারিখে রাজেন্দ্রপুরে একটি ট্রেন থেকে ২৩,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ওই টাকা ছিল নারায়ণগঞ্জের একটি পাট কোম্পানীর। ১১ই নভেম্বর তারিখে ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর থেকে ১৬,৪০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এগুলি সবই ছিল রাজনৈতিক ডাকাতি, তবে কারা তা করেছিলেন সে কথা বলা শক্ত। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অনুশীলন সমিতির কর্মকেন্দ্র ছিল মূলত মৈমনসিংহ ও ঢাকা এবং কর্মক্ষেত্র ছিল দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কুচবিহার ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল। আর খাস কলকাতা তো ছিলই। ওই সমিতির শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত বেলোনিয়া ও উদয়পুরে। বহির্বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির যোগাযোগ ছিল।

অবশ্য বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতি প্রকৃতিগতভাবে এক ও অখণ্ড ছিলনা। বারীন ঘোষ ও তাঁর গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্র পছন্দ করেন নি। ফলে অরবিন্দকে সভাপতি করে অনুশীলন সমিতির অভ্যন্তরে আর একটি উপদল গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস ও বোমার রাজনীতির পরিবর্তে অনেকে বৃহত্তর সংগ্রামের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন ইংরাজদের সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই যুদ্ধই হচ্ছে ভারতকে মুক্ত করার

সবচেয়ে বড় সুযোগ।১৪ বারীন ঘোষের দল ছাড়া, আরও যে দুটি দলের কার্যকলাপের পরিধি খুবই ব্যাপক ছিল তা হল পূর্ববঙ্গের পুলিন দাসের দল যার কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকায়, এবং অপরটি, পি. মিত্রের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কর্তৃক পরিচালিত ছিল। তৃতীয় আর একটি দলের নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। এ'দের সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আরও দু'এক বছর পর থেকে। পাঞ্জাবে ১৯০৯ সাল থেকে বিপ্লবীরা পুনরায় তৎপর হয়ে ওঠে। অজিত সিং, যিনি লজপত রায়ের সঙ্গে ছমাস কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত পারস্যে পলায়ন করতে বাধ্য হন। বারীন ঘোষ গোষ্ঠীর একটি বোমা নির্দেশিকা ভাই পরমানন্দের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। লালা হরদয়াল পুনরায় বিদেশ চলে গেলে, জে. এম. চ্যাটার্জী এবং দীননাথ তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেন। তাঁদের সঙ্গে দিল্লীর আমীর চাঁদের যোগাযোগ হয়। চ্যাটার্জী কিছুকাল পরে বিদেশে চলে যান, এবং যাবার আগে দীননাথকে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রাসবিহারী ইতিমধ্যেই একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। এই গোষ্ঠী বাংলাদেশের সঙ্গে বোমা তৈরীর ব্যাপারে যোগাযোগ রাখত। রাসবিহারীর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অবধ-বিহারী এবং বালমুকুন্দ। হরদয়াল প্যারিসে গিয়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু শ্যামজী হরদয়ালের মত অতটা উগ্রপন্থী না হওয়াতে, তিনি আমেরিকা চলে যান এবং সেখানেই বিপ্লবী কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন।১৫ মহারাষ্ট্রের নাসিকে কার্ভে পরিচালিত গোষ্ঠী ১৯০৯-এর ২১শে ডিসেম্বর ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে হত্যা করে। হত্যাকারী অনন্তলক্ষণ কানহেরী কিন্তু ধরা পড়ে যান, এবং তারপর থেকেই কার্ভে গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সীমিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কেননা গোখলে নাকি মোর্লে সাহেবকে জানিয়েছিলেন যে তিলকের সঙ্গে সাভারকর ও বাপাতের যোগাযোগ আছে। গোখলের এই কাজকে বিপ্লবীরা দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করেছিলেন। পি. এন. বাপাতও বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন, এবং হেমচন্দ্র দাস ও মীর্জা আব্বাসের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

কিন্তু ১৯০৯-এর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল ভারতবর্ষের বাইরে ইংলণ্ডে। ১লা জুলাই তারিখে সাভারকরের সহযোগী মদনলাল ধিংড়া

১৪। মুখোপাধ্যায় যদুগোপাল, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, (1958), 277-78.
১৫। Har Dayal, *Fortyfour Months in Germany and Turkey*, 19.

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে একটি সভায় কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের কৈফিয়ত স্বরূপ মদনলাল ধিংড়া বলেছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবেই ইংরাজ রক্তপাত করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় যুবকদের উপর ইংরাজদের নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে। বস্তুত ইংরাজদের নিষ্ঠুর আচরণ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খোদ ইংলণ্ডেও তা প্রসারিত হয়েছিল, যার ফলে শ্যামজীর মত্ লোকও, যিনি সর্দার সিং রাণা ও মাদাম কামার তুলনায় অধিকতর নরমপন্থী ছিলেন, ১৯০৭ সালে লণ্ডন থেকে প্যারিসে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধিংড়ার এই কাজের আগে বাসুদেব ভট্টাচার্য নামক জনৈক ছাত্র স্যার উইলিয়ম লী ওয়ার্ণারকে চপেটাঘাত করে অর্থদণ্ড দিয়েছিলেন।১৬ সে যাই হোক, ধিংড়ার এই কাজের বিরুদ্ধে আগা খাঁর সভাপতিত্বে ক্যাক্সটন হলে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সকলেই এই নিন্দা প্রস্তাবে সায় দেননি, সাভারকর প্রচণ্ডভাবে আপত্তি করেছিলেন, এবং এই উপলক্ষে ওই হলের মধ্যে হাতাহাতিও হয়েছিল। পামার নামক একজন ইংরাজ সাভারকরকে আঘাত করেছিল, এবং সাভারকরের বন্ধু ত্রিমুল আচারিয়া তাকে পাল্টা আঘাত করেছিলেন। বিচারাধীন কোন বন্দীর বন্দীর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা চলে না, এই রকম একটি বক্তব্য সাভারকর একটি বিলাতী পত্রিকায় প্রকাশ করাতে পেরেছিলেন। বিচারে অবশ্য মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু ধিংড়ার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ, এমন কি ইংরাজদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছিল। লয়েড জর্জ ও উইনস্টন চার্চিল ধিংড়ার প্রশংসা করেছিলেন। সবচেয়ে খুশি হয়েছিল আইরিশরা এবং তারা তাদের পত্রপত্রিকায় এবং বড় বড় প্লাকার্ডে ধিংড়ার এই আত্মত্যাগকে অভিনন্দিত করেছিল।১৭

ধিংড়ার প্রাণদণ্ডের পরেই সাভারকরকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং নাসিক ষড়যন্ত্র এবং আরও কয়েকটি অভিযোগে দু দফায় তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সাভারকরের গ্রেপ্তারের পরেই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের বৈপ্লবিক ভূমিকা খতম হয়ে যায়। তাঁকে জাহাজে করে ভারতে ফেরত পাঠাবার পথে সাভারকর জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে ফ্রান্সে উপস্থিত হন, কিন্তু ফরাসী পুলিশ তাঁকে পুনরায় ইংরাজদের হাতে সমর্পণ করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক নিয়ম লংঘন করেছে, এই বক্তব্য তুলে ধরে মাদাম কামা কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারলেও, এ

১৬। ভট্টাচার্য, *op. cit.*,
১৭। Keer D., *Savarkar and His Times,* (1950), 55 ff; Blunt W. S., *My Diaries,* II, 276 ff.

বিষয়ে কিছু করা যায়নি। শ্যামজী প্যারিসে থাকাকালীন ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেন প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। সর্দার সিং রাণা ও মাদাম কামা জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের দিকে নজর রাখছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া ইউরোপের অপরাপর স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গেও মাদাম কামার যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকেই ১৯১০ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লেনিনের নাম শোনেন। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ও সরোজিনী নাইডুর বড় ভাই, যিনি বিদেশে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং ফরাসী সোসালিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে আমরা 'বার্লিন কমিটি' নিয়ে আলোচনাকালে পুনরায় আসব।

১৯১০-এর ২৫শে জানুয়ারী, ১৯০৯-এর শাসন সংস্কারের ভিত্তিতে নবগঠিত আইনসভার উদ্বোধন হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ নয়জন নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়। বড়লাটের শাসন পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯০৯ সালেই সুপারিশ করেছিলেন যে পুলিন দাস ও ভূপেশ নাগ ছাড়া বাকি রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। ১৯১০-এর ১লা জানুয়ারী তারিখে ওই প্রস্তাব পুনরায় ওঠে কিন্তু লর্ড মিণ্টো তা নাকচ করে দেন। পরে অবশ্য মিণ্টোকে অবনত হতে হয়। এর পিছনে মোর্লে এবং হাউস অফ কমনসের উদারনৈতিক সদস্যদের হাত ছিল।১৮ এই নয়জন রাজবন্দীর মুক্তিদানের কিছু পরেই ৫৩ জন ব্যক্তিকে ১৮১৮র ৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করার জন্য বাংলা সরকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ৫৩ জনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির নামে এলাহাবাদে বিপ্লবাত্মক মতবাদ প্রচারের অভিযোগ ছিল। ১৯১০ সালে নতুন করে আর একটি ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট রচনা করা হয়, যে আইনের ফলে সরকারবিরোধী প্রবন্ধ বা পুস্তিকার লেখককে যে কোন ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যে কোন পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করা বা তার উপর মোটা অর্থদণ্ড চাপিয়ে দেবার অধিকার সরকারের হাতে বর্তেছিল। এর ফলে সাড়ে তিনশো প্রেস এবং তিনশো সংবাদপত্রের উপর অর্থদণ্ড জারী হয়েছিল, পাঁচশো পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। দণ্ড এত কঠোর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ

১৮। Morley J., *Recollections,* (1917), 322, 327.

হয়েছিল যে ভারতসচিব জন মোর্লে পর্যন্ত লর্ড মিণ্টোর কার্যকলাপে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।১৯ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সরকার-বিরোধিতার জন্য তিলকের ছয় বছর কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। এই সংবাদে বোম্বাই-এ ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট ও ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল। বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল যার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং গুলিবর্ষণের অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছিল। "আসলে লর্ড মিণ্টো পাল্টা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলাদেশের বিপ্লবীরা কিন্তু এ অবস্থায় হাত গুটিয়ে বসেছিলেন না। ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলম বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। ওই বছরেই ৩০শে নভেম্বর তারিখে বাখরগঞ্জ জেলার দাদপুরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাকাতি হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ওই ডাকাতি পরিকল্পিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের বিপ্লবী সংস্থাগুলি ১৯১০ সালে রীতিমত সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যভাবেই কয়েকটি সংবাদ-পত্রের দ্বারা বিপ্লবাত্মক ভাবধারার প্রচার সেখানে ঘটতে শুরু করে। নীল-কণ্ঠ ব্রহ্মচারী দক্ষিণ মাদ্রাজে একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর সঙ্গে ত্রিবাংকুর বন বিভাগের জনৈক কর্মচারী বঞ্চি আয়ার, যাঁর একটি নিজস্ব গুপ্ত সংগঠন ছিল, যোগদান করেন। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন থেকে ভি. ভি. এস. আয়ার পাণ্ডিচেরীতে আসেন এবং দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্থির হয় যে টিনেভেলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাসেকে হত্যা করা হবে, কেননা এই ব্যক্তি ১৯০৮-এর টিনেভেলী হাঙ্গামার সময় দমনমূলক কাজ করেছিলেন। ১৯১০ সালের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, যার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই বছরেই অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, এবং পাণ্ডিচেরীতে ধর্মজীবন যাপনের জন্য চলে যান। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বিপ্লবী নেতার অনুপস্থিতি অনেকের কাছেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল।

১৯১০ সালে কংগ্রেস অধিবেশন ঘটেছিল এলাহাবাদে। বলাই বাহুল্য এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস ছিল না। চরমপন্থী বিশিষ্ট নেতারা ১৯০৭-এর কংগ্রেসের পর থেকেই কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাঁদের উপর রাজরোষ নেমে এসেছিল। অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। নরম-

---

১৯। *ibid.*, 269-70.

পন্থী নেতারা কার্যত জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একটি করে জাঁকালো অধিবেশন করে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা ভিন্ন কংগ্রেসের আর কোনই কাজ ছিল না। ১৯১০-এর এলাহাবাদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্য বিলাত থেকে বৃদ্ধ উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণকে আহ্বান করে আনা হয়। এই ওয়েডারবার্ণ ছিলেন হিউমের বন্ধু ও জীবনীকার। ওয়েডারবার্ণ এই অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধ মেটাবার, এবং চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। এই অধি-বেশনে মহম্মদ আলি জিন্না মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সংস্থায় হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯০৯ সালের আইনে লর্ড মিণ্টো সুস্পষ্টভাবেই দ্বিজাতিতত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক ভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিষয়টি মুসলিম লীগের পক্ষে আনন্দদায়ক হলেও অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা এই দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতির বিপক্ষে সুস্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, বৃটিশ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক নীতি আসলে সত্যকারের মুসলিম স্বার্থের অনুকূল হতে পারেনা। কিন্তু এঁরা সংখ্যায় পর্যাপ্ত ছিলেন না, এবং বৃহত্তর মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এঁদের প্রভাব অল্প ছিল। ১৯০৯-এর নভেম্বরে আসফ আলি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাকে লেখেন যে তিনি জাতীয়তা-বাদী হবার জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের কাছে নিন্দিত হচ্ছেন। এই অবস্থার হিন্দু প্রতিক্রিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব না জাগে তাহলে ভারতের একটি জাতি হিসাবে কোন ভবিষ্যৎ নেই, অথচ এটাও অস্বীকার করা যায় না যে সেরকম কোন মনোভাব আজকে বর্তমান নেই।[২০] কিন্তু সমস্যা শুধু এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যাকে বলা হয় প্যান-ইসলামিজম, সেই ভাবধারার আগমনও ভারতে ধীরে ধীরে ঘটছিল, যার প্রভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতিও ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল সুলতান, আবদুল হামিদ উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁর পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য টিঁকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ধর্মীয় জিগির তুলে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমর্থনের ভিত্তিতে টিঁকে থাকতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে অবশ্য তার কোন প্রভাব

২০। *Gokhale's Speeches,* (1920), 1136-37.

পড়েনি। ১৯০৮ সালে নব্য-তুর্কী আন্দোলনে এই বৃদ্ধ খলিফার পতন হয়, এবং তাঁর সৃষ্ট প্যান-ইসলামবাদেরও কোন ভবিষ্যৎ থাকে না। তার চার বছর পরে কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের মধ্যে প্যান-ইসলামবাদের, ইসলাম-বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার লাভ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যের রীতিমত পরিবর্তন ঘটে যায়। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকের মনেই এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ইসলামীয় সংস্কৃতির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। সিবলি, ইকবাল প্রমুখ সংস্কৃতি জগতের মনীষীগণ এই মুসলিম অসন্তোষকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। চারটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা—কলকাতার 'আল হিলাল', লাহোরের 'জমিন্দার', ইংরাজী 'কমরেড' এবং উর্দু 'হামদর্দ'—ক্রমাগত প্রচার করে চলে যে বৃটিশ শাসনে ইসলামীয় সংস্কৃতির ক্ষতি হচ্ছে।[২১] ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই প্যান-ইসলামবাদ এমন একটা বৃটিশবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানী করে যে তা সৈয়দ আহমদের পুরাতন তত্ত্বকে—অর্থাৎ ইংরাজদের আশ্রয় করেই মুসলমানদের এগিয়ে যেতে হবে, কদাপি তাদের বিরোধিতা করা চলবে না—নস্যাৎ করে দেয়।

২১। Smith W. C., *op. cit.*, 225-27.

স্বদেশ ও বিদেশে প্রাক-মহাযুদ্ধ রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক তৎপরতা (১৯১১-১৪)

১৯১০ সালের শেষের দিকে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড মিণ্টোর স্থলে, এবং লর্ড ক্রিউই ভারতসচিব হলেন জন মোর্লের জায়গায়। হার্ডিঞ্জ এবং ক্রিউই উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত অসন্তোষের মূলে আছে বঙ্গভঙ্গ, কাজেই বঙ্গভঙ্গকে রদ করলেই সম্ভবত অবস্থার সামাল দেওয়া যাবে। বাংলাদেশ তো বটেই, সারা ভারতেই লর্ড মিণ্টোর আমলে এবং তাঁর সন্ত্রাস সৃষ্টির নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, যে পাল্টা সন্ত্রাসবাদ গড়ে উঠেছিল তাকে এক কথায় রুখে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাংলাদেশে যথারীতি গুপ্ত হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি চলছিল। ১৯১১ সালেই সি.আই.ডি.-র হেড কনস্টেবল শিরীষচন্দ্র চক্রবর্তী, মনমোহন দে, সাব-ইনস্পক্টর রাজকুমার নিহত হন। ১১ই জুলাই তারিখে ঢাকা জেলার সোনারং-এ পুলিশের ইনফরমার সন্দেহে তিনজনকে হত্যা করা হয়, ডিসেম্বরে পুলিশ ইনস্পেক্টর মনমোহন ঘোষকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে বরিশালে হত্যা করা হয়। ওই বছরেরই এপ্রিলের ২২ তারিখে বাখরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মণকাটিতে ১০,০০০ টাকার একটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। ভারতের অপরাপর স্থানও এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। রাজস্থানের কয়েকটি সামন্ত রাজ্য বিপ্লবীদের ঘাঁটি হয়েছিল। শচীন্দ্র সান্যালের দুজন লোক বারাণসী থেকে খারোয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন বোমা তৈরীর জন্য। ১৯১১ সালে রাজস্থানের অনেক যুবক বিপ্লববাদে দীক্ষা নেয়, এবং তাদের অনেককেই দিল্লীতে প্রেরণ করা হয় আমীর চাঁদ, অবধবিহারী ও বালমুকুন্দের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত কেশরী সিং-এর পুত্র প্রতাপ সিং, যিনি রাসবিহারী বসুর যোগ্য সহকারী হতে পেরেছিলেন। রাও গোপাল সিং. বিষ্ণু দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরাও বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৯১১র ১৭ই জুন টিনেভেলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি রেলের কামরায় বাঞ্চি আয়ার কর্তৃক নিহত হন। এঁকে হত্যার পরিকল্পনার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নিহত মিঃ অ্যাসের দেহের উপর রাখা তামিল ভাষায়

লিখিত একটি চিঠিতে বলা হয়েছিল যে ভারতীয়রা প্রত্যেকেই ইংরাজকে তাড়াবার চেষ্টা করছে, এবং তিন হাজার দক্ষিণ ভারতীয় এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে পঞ্চম জর্জ ভারতের মাটিতে পা দিলেই তাঁকে হত্যা করবে।

১৯১১র অক্টোবরে ফন বের্ণহার্টির 'জার্মানী ও পরবর্তী যুদ্ধ' নামক গ্রন্থে বলা হয়, "জার্মানী আশা করে যে বাংলাদেশের হিন্দু জনগণ, যাঁরা তাঁদের বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র বিশেষভাবে প্রকটিত করেছেন, ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন, এবং এই উপাদান-গুলির সহযোগিতা এমন একটি গভীর বিপদের সৃষ্টি করতে পারে যা পৃথিবীতে ইংলণ্ডের উচ্চ আসনের ভিত্তিকেই টলিয়ে দিতে পারে।"[১] বস্তুত বের্ণহার্টি যা আশা করেছিলেন অনুরূপ চিন্তা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই করেছিলেন। মাদাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতিরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই সুযোগে জার্মানীর প্রত্যক্ষ অস্ত্র সাহায্যে ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ বিতাড়ন সম্ভব। ১৯১৭-১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত সানফ্রান্সিসকো মামলা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিল যে হরদয়াল জার্মান সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ উৎখাতের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন ১৯১১ সালে। আরও অনেক প্রমাণ আছে যে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা ওই একই উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ জার্মান কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ১৯১১ সালের একটি ঘটনা প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। মরোক্কোতে বৃটিশের সঙ্গে সহ-যোগিতায় ফরাসীরা তাদের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করছিল, এবং এ বিষয়ে জার্মানীর আপত্তিতে তারা কর্ণপাত করেনি। ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে জার্মানী মরোক্কোর আগাদির বন্দরে প্যান্থার নামক একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠায়। এতে বৃটেন যে প্রতিবাদ করে তাতে জার্মানী কর্ণপাত না করায় ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে যায়। জার্মানীর বুদ্ধিজীবী সমাজও উঠতি জঙ্গীবাদের প্রেরণায় শত্রুর শত্রুদের অর্থাৎ ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান সাহায্যলাভের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে নানা রচনার প্রকাশ শুরু করেন। জার্মানী ছাড়াও অপরাপর স্থানের ভারতীয়রা বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমেরিকায় গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ১৯১০ থেকে ১৯১২র মধ্যে কানসিরাম যোশীর নেতৃত্বে পোর্টল্যাণ্ড বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপের একটা বড় কেন্দ্র হয়ে

১। *Sedition Committee Report* (1918), 119. অতঃপর এটি রচয়িতা Rowlatt-এর নামে উল্লিখিত হবে।

ওঠে। ভূপালের বরকতুল্লা, যিনি ১৯০৯ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পরে গদর পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, ১৯১১ সালে কায়রো, সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং কনস্টান্টি-নোপল পরিভ্রমণ করেন এবং শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্যান-ইসলাম ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রচণ্ডরকম বৃটিশবিরোধী বরকতুল্লা জাপান থেকে ইসলামিক-ফ্র্যাটারনিটি নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, এবং এই পত্রিকাটির বৃটিশবিরোধিতা এত উচ্চগ্রামে উঠেছিল যে ১৯১২ সালে জাপান সরকার তা নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯১০-১১ সালে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় যান পেনাং-এ।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর যে দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হয় তাতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদ বাঙালীমাত্রের নিকটেই খুব আনন্দদায়ক ছিল, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলেও বাংলাদেশের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়নি। বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একজন লেফটন্যান্ট গভর্ণরের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়। অনুরূপভাবে আসামকেও জনৈক চীফ কমিশনারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশরূপে গণ্য করা হয়। পূর্ববঙ্গ যুক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, কিন্তু ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বলাই বাহুল্য এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করে বৈপ্লবিক কাজকর্মসমূহের অবসান ঘটিয়ে দেবার যে স্বপ্ন লর্ড হার্ডিঞ্জ দেখেছিলেন তা সফল হয়নি, কেননা বঙ্গভঙ্গ শুধু বাঙালীর মনে ক্ষোভ ও তিক্ততার সৃষ্টিই করেনি, বাঙালীকে তা জাতীয়তাবাদে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করেছিল। ইংরাজদের প্রতি ভারতবাসীর যে পরিবর্তিত মনোভাব বিগত কয়েক বছরে সৃষ্ট হয়েছিল, তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। সত্য বটে লর্ড হার্ডিঞ্জের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছিল যে বঙ্গভঙ্গ রদ করে বিপ্লবাত্মক ঘটনাসমূহ তিনি বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন, কেননা বঙ্গভঙ্গের পর এক বছর তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটেছিল মোট দুটি, একটি হচ্ছে ১৯১২র জুন মাসে ফেণীতে সারদা চক্রবর্তীর হত্যা, যা ছিল বিপ্লবীদের ঘরোয়া হত্যাকাণ্ড, এবং অপরটি ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কনস্টেবল রতিলাল রায়কে হত্যা, যা ঘটেছিল ঢাকায়। রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছিল দুটি ১১ই জুলাই তারিখে ঢাকার পানাম গ্রামে এবং ১৪ই নভেম্বর তারিখে ঢাকার লাঙ্গলবন্দে। এছাড়া রাজস্থানে ১৯১২র জুন মাসে যোধপুরের

মোহান্তকে দুধে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়েছিল যার পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতকেশরী সিং। এই ঘটনাগুলিকে লর্ড হার্ডিঞ্জ ছোটখাট স্থানীয় ব্যাপার হিসাবে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মোহমুক্তি তখনই ঘটল যখন ১৯১২র ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর নিজের উপরেই বোমা নিক্ষিপ্ত হল। রাসবিহারী বসুর দল এই কাজ করেছিলেন যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লী প্রবেশ করছিলেন। এতে একজন লোক নিহত হয় এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজে গুরুতরভাবে আহত হন। বোমাটি ছুড়েছিলেন বসন্তকুমার বিশ্বাস। এই বোমাগুলি তৈরী করেছিলেন চন্দননগরের মণীন্দ্রনাথ নায়েক এবং সেগুলি রাসবিহারীর দলের কাছে পেঁছে দিয়েছিলেন নলিনচন্দ্র দত্ত। লর্ড হার্ডিঞ্জ পরে লিখেছিলেন যে এই ঘটনাটি তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল।২ তিনি গোখলের মতই বিশ্বাস করেছিলেন যে ভারতবাসীমাত্রেই রাজভক্ত এবং বিপ্লবীরা নিছক কয়েকজন দুষ্কৃতকারী. এবং এখানেই তাঁর ভুল হয়েছিল। আসলে দেশ যে রাজনৈতিক চেতনার দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে, বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করতে একদল লোক কৃতসংকল্প, এটা তিনি তলিয়ে বুঝতে পারেন নি।

১৯০৯-এর সংস্কার আইনের পর হিন্দু নেতারা ভেবেছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায়েব দাবিসমূহ সরকার কর্তৃক রক্ষিত হয়েছে, কাজেই এর পর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রাজনৈতিক কর্মসূচীর সমঝোতা সম্ভবপর। কিন্তু এখানেই দেখা গিয়েছিল প্রচণ্ড অসুবিধা. কেননা বৃটিশ-বিরোধী হিন্দু রাজনীতির সঙ্গে বৃটিশ-অনুগামী মুসলিম রাজনীতির সমঝোতা হওয়া অসম্ভব ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯১১র ১লা জানুয়ারী এলাহাবাদে একটি হিন্দু-মুসলিম সম্মেলন হয়েছিল যাতে ৬০ জন হিন্দু ও ৪০ জন মুসলমান যোগদান করেছিলেন, কিন্তু এতে কোন সুফলই পাওয়া যায়নি। সদিচ্ছা যা আনয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কয়েকটি এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯১১ সাল থেকে, যা ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনীতিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে প্রত্যাশিত পথে নিয়ে এসেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ব্যাপারটা মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করেছিল. বৃটিশ সরকার যে সব অবস্থাতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখবে এই আশাটা আশংকায় পরিণত হয়েছিল। প্যান-ইসলামবাদের প্রভাবে (এর কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে) ইংরাজদের মিশর অধিকার, মরোক্কো সংক্রান্ত ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি, পারস্য সংক্রান্ত বিষয়ে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি, প্রভৃতি বিষয়গুলিতে ভারতীয় মুসলমানেরা সুস্পষ্টভাবেই মুসলিম স্বার্থ-

---

২। Hardinge, *My Indian Years,* (1948), 81.

বিরোধী রাজনীতির পরিচয় পাচ্ছিলেন, যার ফলে বৃটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের অটুট বিশ্বাসস্থাপন আর সম্ভবপর হচ্ছিল না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের নিকট থেকে ইটালীর ত্রিপোলি অধিকার এবং তার পিছনে মদত-দানের ব্যাপারটিকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় সুনজরে দেখেনি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন তুরস্কের ইউরোপীয় প্রদেশগুলি হস্তচ্যুত হল সেক্ষেত্রেও ইংরাজদের ভূমিকা মুসলমানদের নিকট আপত্তিকর ঠেকেছিল। এই সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতের মুসলমান সমাজের উপর কি ধরনের হয়েছিল, তা খুবই তীব্র ভাষায় মোহম্মদ আলি প্রকাশ করেছিলেন।৩ এর ফলে মুসলিম লীগের নীতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৃটিশবিরোধিতা এসে গিয়েছিল। ১৯১৩র মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন, জাতীয় ঐক্য এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। লীগের মনোভাবের এই পরিবর্তনে কংগ্রেস খুশি হয়েছিল। কিন্তু অতটা খুশির কারণ ছিল না। অপর সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে সমঝোতার অর্থ কোন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার বিষয় ছিল না। লীগ তার সাম্প্রদায়িক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে মোটেই রাজি ছিল না, তার বৃটিশ-বিরোধিতার উৎস জাতীয়তাবাদ নয়, প্যান-ইসলামবাদ, এবং মুসলিম নেতাদের কৃতিত্ব এখানেই ছিল যে তাঁরা কংগ্রেসকে দিয়ে তাঁদের স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা, এবং পরোক্ষভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বকে স্বীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৩ সালে তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল, নিহতের সংখ্যা ছিল ৬ জন এবং রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছিল ১০টি। রাজনৈতিক হত্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কলেজ স্কোয়ারে হেড কনস্টেবল হরিপদ দেবকে হত্যা, এবং মৈমনসিংহে ইনপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে হত্যা যা ঘটেছিল যথাক্রমে সেপ্টেম্বর মাসের ২৯শে ও ৩০শে তারিখে। ওই বছরের নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ডাকাতি ঘটেছিল মৈমনসিংহের ধুলদিয়ায় ও সরাচরে, ঢাকার ভরাকরে, ফরিদপুরের গোপাল-পুর এবং কাওয়াকুরিতে, ত্রিপুরার খারমপুর এবং পশ্চিমাসিং-এ এবং আরও কয়েকটি স্থানে। বাংলার বাইরে যে সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিহারের নিমেজ নামক স্থানে একজন মোহান্তকে হত্যা। এটা ঘটেছিল ১৯১৩র ২০শে মার্চ তারিখে, বিষ্ণু দত্তের নেতৃত্বে যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মোতি চাঁদ,

৩। *Sources of Indian Tradition*, (Columbia University, 1958), 777.

মাণিক চাঁদ এবং জয় চাঁদ। কিন্তু এই হত্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, টাকাকড়ি কিছু পাওয়া যায়নি। পাঞ্জাবের লরেন্স গার্ডেনসে ১৭ই মে তারিখে একটি বোমা ফাটানো হয়েছিল, কিন্তু তা ভুল লক্ষ্যকে আঘাত করেছিল। এর পিছনে ছিল রাসবিহারীর দল। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের পর থেকেই পুলিশের সন্দেহ রাসবিহারীর উপর পড়েছিল, ফলে রাসবিহারী বারাণসীতে তাঁর কর্মকেন্দ্র সরিয়ে আনেন ১৯১৩ সালে। এখানে তিনি পূর্বে উল্লিখিত শচীন্দ্র সান্যালের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় ঘটেছিল চন্দননগর-গোষ্ঠীর সুরেশচন্দ্র ঘোষ মারফৎ। রাসবিহারী তাঁর বন্ধু প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়কে শচীন্দ্র সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেন যিনি শচীন্দ্রের অপূর্ব সংগঠনশক্তির কথা রাসবিহারীকে জানান। এরপর রাসবিহারী ও শচীন্দ্র একত্রে বারাণসীতেই কাজকর্ম শুরু করেন। বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন, এছাড়া আরও অনেকে আসেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনায়করাও কাপলে, দামোদরস্বরূপ, প্রতাপ সিংহ, অবধবিহারী, বালমুকুন্দ, বাচ্ছা সিং, কর্তার সিং, বিষ্ণুগণেশ পিংলে প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকা থেকে এসেছিলেন ১৯১৪ সালে গদর পার্টির শিখদের সঙ্গে।

আমেরিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। আমরা পূর্বেই আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লবী ক্রিয়া-কলাপ ও সেগুলির কেন্দ্রসমূহের কথা উল্লেখ করেছি। এই সকল বিচ্ছিন্ন সংস্থাসমূহ খুব দ্রুতগতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তা থেকে গদর পার্টির উদ্ভব হয়। 'গদর' শব্দটির অর্থ বিপ্লব। এই নামটি পছন্দ করেছিলেন লালা হরদয়াল, গদর পার্টি গড়ে তোলায় যাঁর অবদান অতুলনীয়। যেহেতু বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সংস্থার একীকরণে গদর পার্টির জন্ম হয়েছিল, এই পার্টির উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তির কিছুটা অবকাশ আছে। দাবিশি চেঞ্চায়া গদর পার্টির উদ্ভব প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নাম করেছেন যাঁর কাছ থেকে তিনি নিজে বিপ্লববাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রণধীর সিং, যিনি গদর পার্টির ইতিহাসকার, এই প্রসঙ্গে সোহন সিং ভাকনার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[৪] সোহন সিং-এর বক্তব্য অনুযায়ী ১৯১৩র ১৩ই মার্চ তারিখে ১২০ জন ভারতীয় অ্যাস্টোরিয়ায় একটি সভা করেন, এবং ওই বছরেরই ১লা নভেম্বর সানফ্রান্সিসকোয় একটি বিরাট সমাবেশে 'হিন্দী অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকার' পত্তন হয়। 'গদর' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়, এবং তা থেকেই

৪। *The Gadar Heroes*, (1945), 8 ff; Banerjee K. K, *Revolutionaries in America* (1969).

পার্টির নাম সংক্ষেপে গদর পার্টি দাঁড়িয়ে যায়। সোহন সিং ও হরদয়াল যথাক্রমে এই পার্টির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস হয় ৪৩৬ নং হিল স্ট্রীটে, বাড়ীটির নাম দেওয়া হয় 'যুগান্তর আশ্রম', কোষাধ্যক্ষ হন মুনশী রাম। অ্যাস্টোরিয়ায় যে সমাবেশটি হয়েছিল তার তারিখ নিয়ে সংশয় আছে, ওটা জুন মাসের ১৩ তারিখে হয়েছিল বলে অন্য এক সূত্রের সংবাদ আছে। সাপ্তাহিক 'গদর' পত্রিকা ও অপরাপর পুস্তিকা প্রকাশ করা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার আয়োজন করে গদর পার্টি আমেরিকার জনমতকে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। গদর পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে ছিল, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, প্রভাবশালী এবং বৃটিশ অনুগত কর্ম-চারীদের হত্যা করা, বৈপ্লবিক পতাকা উত্তোলন করা, জেলভাঙা, ট্রেজারী ও থানা লুণ্ঠন করা, রাজদ্রোহমূলক সাহিত্যের প্রচার করা, বৃটিশের শত্রুজাতিসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, রাজনৈতিক ডাকাতি করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা, বোমা তৈরী করা, গুপ্ত সমিতিসমূহ গঠন করা, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য যুবক সংগ্রহ করা—এক কথায় চরমপন্থী একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী। ১৯১২ সালে ভূপতি মজুমদারকে ইউরোপ ঘুরে আমেরিকা পাঠানো হয়। ইউরোপে যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়ায় অর্থসংকটে পড়ে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়। ওই বছরেই সত্যেন সেন আমেরিকা যান এবং তারকনাথ দাসের সঙ্গে যোগ রাখেন। ১৯১৩ সালে সুরেন কর জাপান হয়ে আমেরিকা যান, তারপর ১৯১৪ সালে জার্মানীতে।

আমরা আগেই দেখেছি যে ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস থেকে চরম-পন্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর তাঁদের পক্ষে কোন পৃথক সংগঠন তৈরী করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত এই ছয় বছর তিলক কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯১০ সালে অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এবং লজপত রায় ভারতবর্ষের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চরমপন্থীদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা চলছিল, এবং অনেকেই বোধ করছিলেন যে এটা হওয়া দরকার। কোন কোন প্রভাবশালী নেতা এতে অবশ্য আপত্তি করেছিলেন, যেমন ফিরোজশা মেটা যিনি ১৯১২ সালে তীব্র ভাষায় চরমপন্থীদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার প্রবণতার নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু ফিরোজশা মেটার এই মনোভাব অনেক নরমপন্থী নেতাই পছন্দ করেন নি। সুরেন্দ্র-নাথের মত নরমপন্থী নেতাও চাইছিলেন যে চরমপন্থীরা কংগ্রেসে ফিরে

আসুক। ১৯১৪ সালের ১৬ই জুন তিলকের কারামুক্তির পর প্রশ্নটি নতুন করে দেখা দিয়েছিল। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত উদ্যোগী হয়ে সুব্বা-রাও পাণ্টুলুকে সঙ্গে নিয়ে গোখলে ও তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ১৯১৪র ডিসেম্বরে। গোখলের সঙ্গে শ্রীমতী বেশান্তের চরমপন্থীদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনা নিয়ে একটা বোঝাপড়া হল, এবং তা একটি প্রস্তাবাকারে শ্রীমতী বেশান্ত কংগ্রেসের আসন্ন মাদ্রাজ অধিবেশনে পেশ করার জন্য তৈরী হলে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু জানালেন যে তিনি গোখলের কাছ থেকে চরমপন্থীদের কংগ্রেসে না নেওয়ার একটি বার্তা পেয়েছেন, যেখানে গোখলে বলেছেন যে চরমপন্থীদের কংগ্রেসে নেওয়া যায় না কেননা তিলক অসহযোগিতা ও বয়কটের আদর্শে সক্রিয় বিশ্বাসী, তিনি আইরিশ কায়দায় সরকারের সঙ্গে লড়তে চান। গোখলের এই যুক্তি মোটেই জোরালো ছিল না, কেননা তিলক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে চরমপন্থীরা সকল ক্ষেত্রেই বয়কট ও অসহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী নয়, তারা আইনসভা, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে অংশ-গ্রহণ করছে। আসলে গোখলের আপত্তির কারণ ছিল অন্যত্র। তিলক স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার ছিলেন, এবং গোখলের এই আশংকাই তিলকের হোমরুল আন্দোলনের দ্বারা পরবর্তীকালে সমর্থিত হয়েছিল। তিলক এটাও গোপন করেন-নি যে কংগ্রেসে তাঁর পুনঃপ্রবেশের উদ্দেশ্য তার পালে প্রগতিশীলতার বাতাস লাগানো, এবং ফিরোজশা মেটা, গোখলে এঁরা তাঁদের দিক থেকে ঠিকই বুঝেছিলেন যে চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেসে ঢোকানোর অর্থই হচ্ছে তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলার নোটিশ।

১৯১৪ সালেও যথারীতি গুপ্তহত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ১৯শে জুন তারিখে সি.আই.ডি. ডিপার্টমেণ্টের ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষ কলকাতার চিৎপুরে এবং সত্যেন্দ্র সেন চট্টগ্রামে ইনফর্মার সন্দেহে নিহত হন। ১৯শে জুলাই রামদাস ওরফে উমেশ দে ঢাকায় নিহত হন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য করার অভিযোগে। ২৫শে নভেম্বর পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বোমা ফেলা হয়, তবে বসন্ত অক্ষত থেকে যান। ওই বছরে তিনটি বড় ডাকাতি হয়েছিল গোঁসাইপুর, বিতাই এবং দ্বারিকপুরে। ১৯১৪র ২৬শে আগস্ট তারিখে রডা এণ্ড কোম্পানী নামক একটি অস্ত্র-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত ৫০টি মসার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ কার্তুজ বিপ্লবীরা হস্তগত করে।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে যায়। এই যুদ্ধে ভারতবাসীর

কোন স্বার্থই ছিল না, অথচ যুদ্ধের জন্য ভারতবাসীকে মূল্য কম দিতে হয়নি। ১,২১৫,৩৩৮ জন ভারতীয়কে যুদ্ধার্থে চালান দেওয়া হয়েছিল, যাদের মধ্যে নিহত হয়েছিল ১০১,৪৩৯ জন। ভারত সরকার ১২৭,৮০০,০০০ পাউণ্ড যুদ্ধখাতে বরাদ্দ করেছিল, এছাড়া চাঁদা হিসাবে নগদ ২,১০০,০০০ পাউণ্ড যুদ্ধখাতে দিয়েছিল, তদুপরি আরও ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড ভারতবাসীর কাছ থেকে কার্যত গায়ের জোরে যুদ্ধের নামে আদায় করেছিল। ভারতীয় নেতারা বুঝেছিলেন যে এ যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ নয়, অথচ তার ইন্ধনের একটা বড় অংশ ভারতবাসীকেই বহন করতে হচ্ছে, তথাপি তাঁরা এই আশায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধান্তে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবেও অন্তত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়া যাবে। এবং তাঁদের এই মনোভাব তাঁরা গোপন করেন নি। তিলক স্পষ্টই বলেছিলেন, এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আলোচনা হতে পারে, ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গটির পক্ষেও সময়হরণ অপ্রয়োজন। এমন কি নরমপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসও ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে প্রস্তাব নিয়েছিল যে ভারতের জনগণ বর্তমান সংকটে যে আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখাচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ যাতে স্বায়ত্তশাসনের পথে যেতে পারে সেটা দেখা ইংরাজ সরকারের অবশ্য কর্তব্য। শুধু একজন নিঃসর্তে বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার পক্ষে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তখনও অবশ্য তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন নি। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তও ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতের আনুগত্যের মূল্য হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৪র ২রা জানুয়ারী শ্রীমতী বেশান্ত 'দি কমনওয়েলথ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যে পত্রিকা মারফত তিনি দাবি করেছিলেন বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতের স্বশাসন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড সফর করেছিলেন, এবং পার্লামেণ্টে তাঁর দাবির অনুকূলে একদল সদস্যের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। হোমরুল লীগ নামক একটি প্রতিষ্ঠান তিনি খোলেন এবং ১৯১৪র বসন্তকালে লণ্ডনের কুইনস হলে একটি বক্তৃতায় অনেকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হন। ওই বছরেই তিনি মাদ্রাজের একটি দৈনিক পত্রিকা কিনে নেন এবং নিউ ইণ্ডিয়া নামে সেটিকে চালাতে শুরু করেন।[৫] শ্রীমতী বেশান্তের হোমরুল আন্দোলন জনপ্রিয় হয় এবং তিলক প্রভৃতি নেতা তাতে সামিল হন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

৫। Besant A, *India Bond or Free,* (1926), 162-63.

১৯১৩ সালে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তা আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং বিশিষ্ট আমেরিকানদের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেটি হচ্ছে আমেরিকার নতুন ইমিগ্রেশন আইন, যা প্রাচ্যদেশবাসীকে কার্যত আমেরিকায় ঢুকতে না দেওয়ার জন্যই রচিত হয়েছিল। মূলত এই আইন ভারতবাসীদের জন্য করা হয়েছিল এবং এর নেপথ্যে বৃটিশ সরকারের হাত ছিল। এই আইনের ফলে আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয়রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, এবং গদর পার্টির সেক্রেটারী হরদয়াল তীব্র ভাষায় এই আইনের প্রতিবাদ করে মার্কিন সরকারের বিরাগভাজন হন। মার্কিন সরকার আরও একটি কারণে হরদয়ালের উপর নজর রেখেছিল। হরদয়াল প্রকাশ্যভাবেই আমেরিকার বামপন্থী সিন্ডিক্যালিস্ট পার্টির সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, এবং তাদের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন গণসমাবেশে বক্তৃতাও দিতে শুরু করেন। ১৯১৪র ২৫শে মার্চ মার্কিন সরকার হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে। জামিনে ছাড়া থাকাকালীন হরদয়াল গোপনে আমেরিকা ত্যাগ করেন, এবং সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায় চলে আসেন। এখান থেকে তিনি 'বন্দেমাতরম' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। বীরেন দাশগুপ্ত ওই সময় সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ছিলেন যাঁর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। হরদয়ালের চলে আসার পর রামচন্দ্র গদর পার্টির সর্বাধ্যক্ষ হন। তাঁর আহ্বানে জাপান থেকে ভগবান সিং এবং মোহম্মদ বরকতুল্লা ১৯১৪র মে মাসের শেষের দিকে আমেরিকায় আসেন এবং যথাক্রমে গদর পার্টির প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মহাদেশে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মার্সাইতে বৃটিশবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য মাদাম কামাকে ১৯১৪ সালের শেষের দিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রথমে বোর্দো ও পরে ভিসি দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর ফলে ফ্রান্সে বৃটিশবিরোধী কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই জার্মানী হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র। জার্মান সরকারও তাঁদেব প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, শত্রুর শত্রু আমাদের বন্ধু এই নিয়মেই। ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে জার্মানীর ভূমিকা কি ছিল সেটা বিতর্কের বিষয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া ঘটনাবলী থেকে আমরা অবস্থাটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং খানচাঁদ বর্মা জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে ভারতীয়দের বৃটিশ-বিরোধিতা এবং জার্মানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁরা

একটি সৈন্যদল, চিকিৎসকবাহিনী ও অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে চান। এই প্রস্তাবে জার্মান রাষ্ট্রদূত রাজি হন। কিন্তু গদর পার্টির সম্পাদক রামচন্দ্র, দত্ত ও বর্মার এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহবোধ করেন না। ফলে প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়ে। এর কিছুদিন পরে খোদ বার্লিনে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (এ'র পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি) সঙ্গে জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের ব্যারন ফন ভেরটহাইমের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি বীরেন্দ্রকে ৫০০ মার্ক দেন এবং ব্যারন ওপেনহাইমের কাছে পাঠিয়ে দেন। উভয়ের কথাবার্তার পর বার্লিনে ১৯১৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে একটি কমিটি গঠিত হয় যার নাম দেওয়া হয় ডয়চের ফেরাইন ডেয়ার ফ্রয়েণ্ডে ইণ্ডেন, অর্থাৎ 'বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের জার্মান সমিতি'। এই সমিতির সভাপতি হন হের আলব্রেষ্ট, সহ-সভাপতি হন ওপেনহাইম এবং সুখতাংকর, এবং সম্পাদক হন ধীরেন সরকার। কিছুদিন পরে সুখতাংকর ভারতে চলে এলে চট্টোপাধ্যায় অন্যতম সহ-সভাপতি হন, এবং ধীরেন সরকার আমেরিকায় প্রেরিত হলে তাঁর স্থলে ডঃ মুলার সম্পাদক হন। কমিটিতে আরও ১৭ জন ভারতীয় ছিলেন। এ'দের প্রাথমিক কর্মসূচী ছিল বার্লিনের নিকটস্থ পাণ্ডাউতে বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ নির্মাণ শিক্ষা, আধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বন্দীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো এবং নৌবাহিনীর লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাতে জাহাজযোগে ভারতের উপকূলে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো যায়। স্থির হয় যে এই কমিটি গদর পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করবে, জার্মানী থেকে কিছু ভারতীয় বিপ্লবীকে আমেরিকা পাঠানো হয়, আমেরিকা থেকে কেদারেশ্বর গুহ এবং বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ভারতে পাঠানো হয়, এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, তারকনাথ দাস প্রভৃতিরা চলে আসেন বার্লিনে, আর আসেন হরদয়াল জেনিভা থেকে।

আমরা আগেই দেখেছি যে হরদয়াল জেনিভায় চলে যাবার পর গদর পার্টির নেতৃত্ব রামচন্দ্রের উপর গিয়ে পড়ে। মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে গদর পার্টি ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী পাঠানোর পরিকল্পনা নেয়, যাঁরা ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চালাবেন। গোড়ার দিকে এভাবে ভারতবর্ষে লোক পাঠানোর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। প্রথমে তাঁদের পাঠানো হত সাংহাইতে যেখানে তেহল সিং তাঁদের জার্মান বাণিজ্য জাহাজে তুলে সিয়ামে পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে তাঁরা ভারতে আসতেন। ১৯১৪ সালের ২৯শে আগস্ট এস. এস. কোরিয়া নামক জাহাজে জোয়ালা সিং এবং নবাব খানের নেতৃত্বে ৬০ জনের একটি দল ভারত অভিমুখে রওনা হবার পথে ক্যাণ্টনে উপস্থিত হয়। সেখানকার

জার্মান কন্সাল তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সমুদ্রে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। আরও কিছু ভারতীয় ক্যান্টনে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন, এবং প্রায় দেড়শো জনের একটি বাহিনী একটি জাপানী জাহাজে কলকাতা অভিমুখে রওনা হয় ১৯১৪র ৮ই অক্টোবর তারিখে। এভাবে সশস্ত্র ব্যক্তিদের ভারতে প্রবেশের বিষয়টি ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিন জাহাজেরও বেশি সশস্ত্র ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে ৪০০ জনকে জেলে পোরা হয়েছিল, এবং ২,৫০০ ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। কিন্তু এছাড়া আরও বহু লোক ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহিরাগত ভারতীয়দের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ১৯১৪র ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইনগ্রেস অর্ডিন্যান্স তৈরী করেছিলেন। গদর দলের যাঁরা প্রথমে এস. এস. কোরিয়া জাহাজে, এবং পরে জাপানী জাহাজ তোসা-মারুতে কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁদের তন্দণ্ডেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এই ঘটনার কিছু আগে বহিরাগত ভারতীয়দের কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। বাবা গুরদিত সিং নামক আম্বালার জনৈক শিখ ভদ্রলোক 'কোমাগাতা মারু' নামক একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে বহুসংখ্যক পাঞ্জাবীকে নিয়ে ১৯১৪র গোড়ার দিকে কানাডা যাত্রা করেন। কিন্তু কানাডা সরকার তাঁদের কানাডায় অবতরণের অনুমতি না দিলে জাহাজটি ঘুরে আসে এবং কলকাতার নিকটবর্তী বজবজে নোঙর করে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে। সরকারের ধারণা জন্মায় যে ওই জাহাজের আরোহী শিখেরা নিঃসন্দেহে বিপ্লবী, অন্তত তারা আমেরিকার গদর পার্টির কাছ থেকে কিছু বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছে। ফলে জাহাজের সমস্ত আরোহীকেই সোজাসুজি পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আরোহীদের মধ্যে অনেকেই তাতে রাজি না হওয়ার ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুলিশ গুলি চালায়, যার ফলে ১৮ জন শিখ নিহত হয়, এবং হাঙ্গামায় ৬ জন পুলিশও মারা যায়। সরকারী তরফ থেকে 'কোমাগাতা মারুর' শিখদের সশস্ত্র হাঙ্গামাকারী, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ঘোষণা করা হলেও[৬] কার্যত তারা মোটেই তা ছিল না বলে গুরদিত সিং যা দাবি করেছিলেন সেটাই সঠিক বলে মনে হয়। গুরদিত সিং এই ঘটনাটিকে শীতল মস্তিষ্কপ্রসূত গণহত্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯১৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর বার্লিন থেকে ৎসিমেরমান আমেরিকাস্থ

৬। Rowlatt, 147-48.

দূতাবাসের ফন বের্ণস্টোর্ফকে টেলিগ্রাম করে জানান যে হেরম্বলাল গুপ্তকে 'ভারত-জার্মান সমিতি' আমেরিকায় পাঠাচ্ছে যাতে তিনি আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে দিয়ে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সাংহাই ও বাটাভিয়া কেন্দ্রদ্বয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য গুপ্তকে ১৫০,০০০ মার্ক দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এও বলা হয় যে গুপ্ত বিশেষ নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন, এবং বিস্ফোরক দ্রব্য-সমূহের ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকদের সন্ধান নেবার ব্যাপারে আমেরিকাস্থ জার্মান দূতাবাস যেন হেরম্ব গুপ্তকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।৭ হেরম্ব গুপ্তের সামনে দুটি কাজ ছিল, প্রথমটি হচ্ছে বিপ্লবীদের তালিকা তৈরী, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং সেগুলি ভারতবর্ষে চালান দেওয়া। দ্বিতীয় কাজটিই ছিল অধিকতর কঠিন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার নয়, জার্মানরা নিজে থেকে কেন অস্ত্র দেয় নি। যাই হোক হেরম্ব গুপ্ত সান-ইয়েৎ-সেনের চীনা সরকারের কাছ থেকে দশ লক্ষ রাইফেল কেনার জন্য কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, কিন্তু জানা গিয়েছিল দক্ষিণ চীনের কোনস্থানে রক্ষিত ওই রাইফেলগুলি আসলে গাদাবন্দুক ছাড়া কিছুই নয় তখন সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। গুপ্ত তখন জাপানে চলে আসেন। সেটা ১৯১৫র এপ্রিলের গোড়ার দিক।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন এভাবে বিপ্লব প্রচেষ্টা হচ্ছিল, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অনুকূলে প্রচারকার্য চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তুরস্কে বন্দী একদল ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তিফৌজে রূপান্তরিত করার একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওবেদুল্লা আরব রাষ্ট্রগুলিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে একত্র করার একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, প্যান-ইসলামাবাদের প্রেরণায়, কিন্তু তা পরিকল্পনাই থেকে গিয়েছিল। এ বিষয়ে যেটুকু গঠন-মূলক কাজ হয়েছিল তা হচ্ছে কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে ইন্দো-জার্মান মিশন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ইউরোপ যান। জেনিভায় তিনি হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে জার্মানী যান। সেখানে তাঁকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া হয়, এবং খোদ কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলমের সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও হয়। জার্মান চ্যান্সেলার বেটমান হোলভেক ২৬ জন ভারতীয় দেশীয় রাজাকে বৃটিশবিরোধী কাজে লিপ্ত হবার অনুরোধ করে এবং সেই প্রচেষ্টায় জার্মান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লেখেন এবং এই পত্রগুলি মহেন্দ্র-

---

৭। Landau H., *The Enemy Within*, (1937), 29 ff

প্রতাপকে দেওয়া হয় যাতে তিনি সেগুলিকে যথাস্থানে প্রেরণ করতে পারেন সেইজন্য। এবং এও স্থির হয় যে মহেন্দ্রপ্রতাপ একটি ইন্দো-জার্মান কূটনৈতিক মিশন নিয়ে কাবুল যাবেন। ওই মিশনে ছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ নিজে, মৌলানা বরকতুল্লা এবং ডঃ ফন হেনটিক। কিছুসংখ্যক আফগান আফ্রিদি সৈন্যও তাঁদের সঙ্গে ছিল।৮

আমেরিকা থেকে যে সব ভারতীয়েরা, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শিখ, ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই গদর পার্টির ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন। ভারতের সর্বত্রই এই রকম একটি ধারণা বিপ্লবীদের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে পর্যাপ্ত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়বে সেই মুহূর্তে দেশজোড়া বিপ্লব শুরু করতে হবে। আমেরিকা থেকে ভারতে আসার পথে যে সব জায়গায় জাহাজগুলি থামত, যেমন হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেঙ্গুন ইত্যাদি, সর্বত্রই সেই সকল জাহাজের আরোহীরা স্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে সেই সব জায়গায় নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করতেন। স্থানীয় গুরুদ্বারগুলিকে তাঁরা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন। তোসা-মারু জাহাজের আরোহীদের বৃটিশবিরোধী বৈপ্লবিক মনোভাবের কথা নবাব খান রাজসাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।৯ পাঞ্জাব সরকারের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৪র অক্টোবরে অমৃতসরের একটি সমাবেশে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এইরকম আরও কয়েকটি সমাবেশ হয়েছিল, যে সকল সমাবেশে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার, সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার, এবং তজ্জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। বস্তুত এগুলি যে অলস পরিকল্পনা ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথম লাহোর ট্রাইবুনালের রায়ে। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯১৪র ডিসেম্বর থেকে ১৯১৫র ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটেছিল জলন্ধর জেলায় তিনটি, গুরুদাসপুর জেলায় দুটি, এবং ফিরোজপুর, হোসিয়ারপুর, মণ্টোগোমারী ও কাপুরথালে একটি একটি করে। পাঁচটি রাজনৈতিক ডাকাতি আদালতে প্রমাণিত হয়েছিল—প্রথমটি ঘটেছিল লুধিয়ানা জেলার সাহেনেওয়াল-এ, দ্বিতীয়টি ঘটেছিল ওই একই জেলার মনসুরণ গ্রামে, তৃতীয়টি ঘটেছিল মালেরকোটলা নামক দেশীয় রাজ্যের ঝানির নামক স্থানে, চতুর্থটি ঘটেছিল অমৃতসর জেলার দাবা গ্রামে

৮। এই প্রসঙ্গে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বিরচিত *My Life Story of Fiftyfive Years* (1947) দ্রষ্টব্য।

৯। Rowlatt, 151.

এবং পঞ্চমটি ঘটেছিল লুধিয়ানা জেলার রাবণ-উণ্ডি নামক স্থানে। এছাড়া ১৯১৫র জানুয়ারীতে দু'বার রেল লাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল।১০ তৃতীয় 'অতিরিক্ত লাহোর চক্রান্ত মামলায়' ফরিয়াদি পক্ষ হিসাবে সরকার যে অভিযোগগুলি পেশ করেছিল তা থেকেও পাঞ্জাবে গদর পার্টির বিদ্রোহাত্মক কাজকর্মের আভাস পাওয়া যায়। সরকারী অভিযোগ অনুযায়ী চক্রান্তকারীরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একাংশকে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল ফিরোজপুর, আম্বালা, মীরাট, সরগোদা, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট, ফৈজাবাদ, বারাণসী, কানপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, বন্নু, নওশেরা প্রভৃতি স্থানে। ১৯১৪ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে মোগাতে সরকারী ট্রেজারী লুণ্ঠন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী ফিরোজপুর থেকে যাত্রা করেছিল। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বিসারত আলি এবং জোয়ালা সিং জাইলদার তাদের হাতে নিহত হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে পুলিশ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল। সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ করা হয়েছিল লাহোরে ১৯১৪র ১৫ই নভেম্বরে, ঝরসাহিব এবং কাইরোণে ওই বছরের নভেম্বরের শেষের দিকে, এবং পুনরায় লাহোরে ও ফিরোজপুরে ১৯১৫র ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়েছিল যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গদর', ভাই পরমানন্দ রচিত 'ভারতের ইতিহাস', 'গদর-ই-গঞ্জ', 'গদর-সন্দেশ' এবং 'আলান-ই-জঙ্গ।'

বিষ্ণু গণেশ পিংলে রাসবিহারীকে জানিয়েছিলেন যে আমেরিকা থেকে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে চার হাজার লোক এসেছে, এবং আরও বিশ হাজার লোক আছে যারা বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেই অংশগ্রহণ করবে। পাঞ্জাবের যে বিপ্লব প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করা হল, তার সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা যোগাযোগ রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পিংলে ও সত্যেন সেন আমেরিকা থেকে ১৯১৪র নভেম্বর মাসে ভারতে আসেন। রাসবিহারী অতঃপর শচীন্দ্র সান্যালকে পাঞ্জাবে পাঠান সেখানকার প্রস্তুতিপর্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য। শচীন্দ্র ফিরে এলে রাসবিহারী লাহোরে যেতে মনস্থ করেন। শচীন্দ্র ফিরে এসে কাশীর ভার নেন এবং নলিনী মুখোপাধ্যায়কে জব্বলপুরে পাঠান। লাহোর যাত্রার পূর্বে রাসবিহারী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) সারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটবে, এবং যতীন্দ্রনাথকে তিনি বাংলার বিশেষ ভার নিতে অনুরোধ করেন। কিভাবে সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করা হয়েছিল সেকথা শচীন্দ্র সান্যাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।

১০। *ibid.*, 152-53

সংক্ষেপে বলা যায় দিনাপুর থেকে জলন্ধর পর্যন্ত প্রায়ই প্রতিটি ক্যাণ্টনমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অধিকাংশ বাহিনীই এই আশ্বাস দিয়েছিল যে বিদ্রোহ শুরু হওয়ামাত্রই তারা যোগ দেবে, এবং দুটি বাহিনী বিদ্রোহ শুরু করার দায়িত্ব নিয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব রাসবিহারী পরীক্ষিত বিপ্লবীদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন—এলাহাবাদের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন দামোদর স্বরূপ, বেনারসে প্রিয়নাথ ও বিভূতি, রামনগরে বিশ্বনাথ পাণ্ডে, সেক্রোলে মঙ্গল পাণ্ডে ও দিল্লা সিং, জব্বলপুরে নলিনী মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল বাঘা যতীনের উপর সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটেছিল পরবর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা করব।

বর্তমান অধ্যায়ের পরিশিষ্ট হিসাবে কয়েকটি তথ্যের এখানে উল্লেখ করছি। ১৯১০ সালে আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ডে যে বিপ্লবী কর্মকেন্দ্র চালু হয় তার নেতা ছিলেন কাশীরাম। সোহন সিং যোগ দেন ১৯১১-১২ সালে। ভাই পরমানন্দ বিলাত থেকে আমেরিকা যান ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে। বার্লিনে ভারত-জার্মান সোসাইটি স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ নিবাসী চম্পকরমণ পিল্লাই, যিনি জুরিখে প্রো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন, জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগে দরখাস্ত করেন যেন তিনি বার্লিনে এসে বৃটিশবিরোধী একটি সমিতি স্থাপন করতে পারেন। ডঃ জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত ও পিল্লাই উভয়ে স্বাধীনভাবে বিপ্লব ঘটাবার জন্য সাহায্য চান এবং অনুমতি পান। 'ভারত-জার্মান সমিতি' এই ধরনের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। আমরা আগে উল্লেখ করেছি, তুরস্কে বন্দী একদল ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তিফৌজে রূপান্তরিত করার একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল। বরকতুল্লার চেষ্টায় বার্লিনে, কুটেল-আমরায় বাগদাদে ও কেরমানে জার্মান-তুর্কী হস্তে বন্দী ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। কেরমান থেকে বালুচ সর্দার জিহান খানের সহায়তায় বেলুচিস্তানের যে অংশ পারস্য-সীমানার কাছে ছিল সেখানে মুক্তিসৈন্য হানা দিয়ে জয়লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন বাদে তাদের ওই স্থান ত্যাগ করতে হয়। কুটেল-আমরার অধিকাংশ সৈন্যকে কনস্ট্যাণ্টিনোপলে আনা হয়। সেখানে একদল গোঁড়া ভারতীয় মুসলমানের চাপে তুর্কী সরকার হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে বিভেদমূলক ব্যবহার করতে শুরু করে। মুসলমান সিপাহীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত এই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জাহান-ই-ইসলাম নামে একটি পত্রিকা তুরস্কে প্রকাশিত হত। ১৯১৪ সালের মে মাস থেকে এই

ত্রিভাষিক (হিন্দী, আরবী ও তুর্কী) পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়েছিল। আবু সৈয়দ নামক জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান, যিনি রেঙ্গুনে কাজ করতেন, ইটালী-তুর্কী যুদ্ধের সময় রেঙ্গুন ত্যাগ করেন, এবং জাহান-ই-ইসলামের নবসৃষ্ট উর্দু বিভাগের সম্পাদক হন। কলকাতা, লাহোর, বর্মা সর্বত্রই পত্রিকাটি পাওয়া যেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে হরদয়ালের একটি উত্তেজনাপূর্ণ রচনা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৪র ২০শে নভেম্বর আনোয়ার পাশার একটি বক্তৃতা জাহান-ই-ইসলামে প্রকাশিত হয় যাতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

'ভারত-জার্মান সমিতি' ব্যাঙ্ককে বোয়েম নামক একজন জার্মানকে পাঠায়, শ্যামদেশবাসী ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য। স্থির হয়েছিল যে শ্যামদেশ থেকে বর্মা আক্রমণ করা হবে, বর্মাস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা সৈন্যদলকে স্বপক্ষে আনবেন, এবং শ্যাম-বর্মার জাতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করবে। আর একটি বাহিনী সাংহাই-এর জার্মান কন্সালের সঙ্গে থেকে ব্যাঙ্কক, জাভা-বাটাভিয়ার কেন্দ্র থেকে ভারত আক্রমণ করবে, আর ওই একই সঙ্গে গদর পার্টির লোকেরা পাঞ্জাবে অভ্যুত্থান ঘটাবে। আন্তর্জাতিক সংগঠনটি এইভাবে করা হয়েছিল : জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ, ভারত-জার্মান সমিতির সহযোগিতায়, আমেরিকার ওয়াশিংটনস্থিত কন্সাল জেনারেলকে নির্দেশ দেবে। ওয়াশিংটনের কন্সাল জেনারেল নির্দেশ দেবেন সাংহাই-এর কন্সাল জেনারেলকে, ব্যাঙ্ককের জার্মান কনসুলেট এবং বাটাভিয়ার জার্মান কনসুলেট সাংহাই-এর কন্সাল জেনারেলের নির্দেশে চলবে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্ককে এসেছিলেন ১৯১৩ সালে এবং ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভের পব বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ব্যাঙ্ককে বাঙালী বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র ছিল। বাটাভিয়ায় ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন ভট্টাচার্য 'সি. মার্টিন' নাম নিয়ে যান, এবং অস্ত্র পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জুন মাসে ফিরে আসেন। পুনরায় আগস্ট মাসে ফণীন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে নরেন ভট্টাচার্য বাটাভিয়ায় যান। এখান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র পাবার সম্ভাবনা ছিল স্থির হয়েছিল তার একভাগ নোয়াখালি বা হাতিয়ায় পাঠানো হবে, যা দিয়ে পূর্ববঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবেন নরেন ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ বরিশাল গ্রুপ; দ্বিতীয় ভাগটি সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে আসবে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ও নরেন ভট্টাচার্যের কাছে, যা দিয়ে কলকাতা দখল করবেন ফণী চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, ব্রজেন দত্ত প্রভৃতি; এবং তৃতীয় ভাগটি যাবে বালেশ্বরে।

ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় (যাদুগোপাল ও ধনগোপাল মুখো-

পাধ্যায়ের দাদা) ১৯০৮ সালে বর্মায় যান, আর তার কিছুকাল পরে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় যান শ্যামদেশে। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল। মুখোপাধ্যায় বর্মার সীমান্ত মিকটিলায় কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। রেঙ্গুনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রংপুরের যতীন্দ্র হুই। ভোলানাথ শ্যামদেশে যে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন, সেখানে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন কুমুদ মুখোপাধ্যায় নামক আইনজীবী এবং অমর সিং নামক ইঞ্জিনীয়ার। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধকালে দিল্লীর বিখ্যাত নেতা ডঃ আনসারীর অধীনে রেড ক্রেসেণ্ট নামক একটি সেবাদল তুরস্কে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজন, আলি আহমদ ও ফাইম আলি বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রেঙ্গুনে চলে আসেন, এবং একটি গুপ্ত সমিতির পত্তন করেন। মাসিদি খান নামক জনৈক আফগান গোপনে অস্ত্রাদি সরবরাহের ভার নেন। এই মাসিদি খানের সঙ্গে ক্ষীরোদ-গোপালের যোগাযোগ ছিল। ১৯১৪ সালে দুজন গদর দলীয় লোক, হাসান খান এবং সোহনলাল পাঠক ব্যাঙ্কক থেকে শ্যাম-বর্মার সীমান্ত পার হয়ে রেঙ্গুনে আসেন। তাঁরা ডাফরিন স্ট্রীটে একটি বাড়িতে একটি গুপ্ত সমিতি খোলেন, এবং এটির সঙ্গে আগেরটির ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। এঁরা বর্মা মিলিটারী পুলিশকে বিদ্রোহী করার চেষ্টা করেন। এঁদের কার্যকলাপ পুলিশের নজর এড়ায় নি। সৈন্যদলের মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে সোহনলালের প্রাণদণ্ড হয়।

প্রত্যাশা ও পরিণতি, ১৯১৫-১৭

১৯১৪ সালে যুদ্ধ ঘোষিত হলে ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যালড ক্র্যাডক সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য আহ্বান জানালেন। সে আহ্বান বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোমাত্র, সামরিক শিক্ষা-প্রাপ্তির আশায় তরুণ সমাজের মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে তরুণ সমাজের যোগদান করা উচিত কিনা তা নিয়ে অবশ্য দু'রকম মতবাদ গড়ে ওঠে। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে মৌলভী লিয়াকত হোসেন ছিলেন লোক পাঠানোর বিরুদ্ধে, শত্রুর শত্রু তাঁর মতে মিত্র। তা ছাড়া এ ছিল তুরস্কের সঙ্গে ইংরাজদের লড়াই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তব্য ছিল বাঙালীর ছেলেকে বারুদের গন্ধ শুঁকিয়ে আনা উচিত। ইতিমধ্যে সরকারের মত বদলালো, ক্র্যাডক সাহেব ঘোষণা করলেন, সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কুলি-মজুরের প্রয়োজন। বস্তুত বাঙালী যুবকরা সামরিক শিক্ষা পেয়ে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে তা সুযোগমত কাজে লাগাতে পারে, এ আশংকাটা সরকারেরও মনে উদিত হয়েছিল। ভারতস্থ বাহিনীর মধ্যে ছিল ৮০,০০০ ইংরাজ এবং ২৩০,০০০ ভারতবাসী, এ ছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন আরও ১,২০০,০০০ লোক নেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলি থেকে, এবং শিক্ষিত বাঙালীকে সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করা হয়েছিল অত্যন্ত নির্মমভাবে, যে সকল স্থানে জীবনের ঝুঁকি অত্যধিক সেখানে ভারতীয় সৈন্যদেরই এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্ল্যান্ডার্সের রণক্ষেত্রে জার্মানদের ঝটিকা আক্রমণ ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে প্রতিহত করানো হয়েছিল, কিন্তু তাতে ব্যাপক-ভাবে ভারতীয়দের প্রাণহানি ঘটেছিল। মেসোপোটেমিয়াতে নিছক কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও খামখেয়ালীতে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যের প্রাণ যায়, যার সমালোচনা লয়েড জর্জও করেছিলেন। সহজ কথায় নিজেদের চামড়া বাঁচিয়ে ভারতীয় রক্তের বিনিময়ে ইংরাজেরা যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছিল।১

চরমপন্থীদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে গোখলে ও ফিরোজ শা মেটার বাধাদানের কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ১৯১৫র ১৯শে ফেব্রুয়ারী গোখলের মৃত্যু হবার পর বিষয়টা অনেকটা সহজ হয়ে

১। *Cambridge History of India*, VI, 479-81.

যায়। ওই বছরেই ৮ই মে তারিখে জোসেফ ব্যাপ্টিস্টার সভাপতিত্বে পুণা শহরে চরমপন্থীদের একটি সভা হয়, যেখানে তিলক বলেন যে কংগ্রেস যদি এমন নিয়ম করে যে তাদের প্রতিনিধিদের জনসভার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, তাহলে তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেন। তিলক আরও বলেন যে কংগ্রেসকে আরও জোরাল, প্রগতিশীল এবং সক্রিয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা দরকার, যাতে তা সফল জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হতে পারে, যাতে তার কর্মধারা 'তিন দিনের তামাশাতেই' ফুরিয়ে না যায়। ওদিকে ১৯১৫-র বোম্বাই অধিবেশনের আগে ফিরোজশা মেটার মৃত্যু হওয়ায়, চরমপন্থীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথে শেষ কাঁটাটি অপসৃত হয়ে যায়।

এদিকে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত ১৯১৫ সাল থেকেই তাঁর 'হোমরুল' আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে জনমত তৈরীর জন্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যে পত্রপত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং ইংলণ্ডে বক্তৃতা করেছিলেন সেকথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে একটি ভাষণ প্রদানকালে তাঁর হোমরুল আন্দোলনের মূল বক্তব্যটি বলেন। তিনি বলেন যে হোমরুল বলতে তিনি বোঝেন দেশের নিজস্ব সরকার। প্রতিটি প্রদেশের জনগণ ভোটের দ্বারা আইনসভার সদস্যসমূহ নির্বাচিত করবেন এবং তাঁদের থেকে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকার আইনসভার নিকট নিজ কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবে। রাজকীয় পরিষদ, অর্থাৎ বড়লাটের শাসন পরিষদও গঠিত হবে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা, এবং সেই পরিষদও তার কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। প্রদেশগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা হবে, এবং প্রাদেশিক গভর্ণরগণ নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। এর দশ দিন পর, ২৫শে সেপ্টেম্বর, তাঁর নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তিনি লিখলেন যে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক আলাপ-আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অতঃপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা হিসাবে 'হোমরুল লীগ' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ১৯১৫র কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে তিনি তাঁর হোমরুল সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী পেশ করেন, কিন্তু সভাপতি তা বাতিল করে দেন এই অজুহাতে যে তা কংগ্রেস-শাসনতন্ত্রের এক নম্বর ধারার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে এই বিষয়ে একটা খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে পরে আলোচনা হবে, এবং সেই হিসাবে শ্রীমতী বেশান্তকে 'হোমরুল লীগ' গঠনের বিষয়টি কিছুদিন পিছিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীমতী বেশান্ত এতে রাজি হন, যদিও তাঁর সমর্থকেরা বিষয়টিকে তাড়াতাড়ি

ঘটাতে চেয়েছিলেন। আসলে নরমপন্থীদের এই বিষয়ে কোন আগ্রহই ছিল না, যা পরে বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু চরমপন্থীরা, বিশেষ করে তিলক, এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ১৯১৫র ৮ই মে তারিখে পুণা শহরে চরমপন্থীদের যে সভা হয়েছিল, তাতে সভাপতির ভাষণে জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা বলেছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয়দের সামনে হোমরুল দাবি করার সুযোগ এনে দিয়েছে। তিলক ১৯১৫র ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর, কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের চরমপন্থীদের এক সম্মেলন পুণায় আহ্বান করেন। এই সম্মেলন হোমরুল সংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি সুপারিশ করে যে আপাতত স্থানীয়ভাবে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে হোমরুল লীগের শাখা গঠিত হোক, পরে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হোমরুল লীগ গঠন করা হবে।

রাসবিহারীর নেতৃত্বে সারা ভারতে সৈনিক বিদ্রোহের প্রস্তুতির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯১৫র ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ওই বিদ্রোহের দিন ধার্য হয়েছিল। এই বিষয়ে শচীন্দ্র সান্যাল যা লিখেছেন, তা হচ্ছে এই যে, স্থির হয়েছিল যে নির্দিষ্ট রাত্রিতে সমস্ত ক্যাণ্টনমেণ্টগুলিতে ভারতীয় সৈন্যরা ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করবে, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের বন্দী করা হবে, আর যারা তা করবে না তাদের হত্যা করা হবে। সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হবে, ট্রেজারীসমূহ লুঠ করা হবে, এবং জেলখানাগুলি ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হবে, এবং তারপর বিপ্লবীরা লাহোরে সমবেত হয়ে নিজেদের সরকার ঘোষণা করবেন।• পরিকল্পনাটির মধ্যে অবাস্তবতা কিছুই ছিল না, কেননা সেই সময় ক্যাণ্টনমেণ্টগুলিতে ইংরাজ সৈন্য খুবই কম ছিল। কিন্তু বিষয়টি পূর্বেই ফাঁস হয়ে যায়। কৃপাল সিং নামক জনৈক পুলিশ ইনফরমার সুকৌশলে রাসবিহারীর দলে সদস্য হয়েছিল। বিষয়টি সে ফাঁস করে দেয়। তখন প্রস্তাবিত বিদ্রোহের দিন দু'দিন এগিয়ে এনে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ধার্য করা হয় কিন্তু সে খবরটাও ফাঁস হয়ে যায়। সরকার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকে ব্যাপক বদলির আদেশ দেয় এবং বহুজনকে গ্রেপ্তার করে। পিংলে গ্রেপ্তার হন মীরাটে ১৯১৫র ২৩শে মার্চ তারিখে দশটি বোমাসহ। তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। শচীন্দ্র সান্যাল ধরা পড়েন ১৯১৫র জুন মাসে। রাসবিহারী চন্দননগর, নবদ্বীপ ও কলকাতায় কিছু-দিন কাটিয়ে, পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্মনামে ১৯১৫র ১৫ই মে জাপানে

পাড়ি দেন। এই বিষয় সরকারী বক্তব্য হচ্ছে যে ১৯শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র বিদ্রোহের আঁচ পেয়ে এবং কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে পেয়ে সরকার বহু চক্রান্তকারীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়, এবং তাদের নামে তিন দফা মামলা রুজু করা হয়, যেগুলি 'লাহোর চক্রান্ত মামলা' এবং 'অতিরিক্ত লাহোর চক্রান্ত মামলা' নামে পরিচিত। বিশেষ ট্রাইবুনালে চক্রান্তকারী নয়টি গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক বিচার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৮ জনের প্রাণদণ্ড হয়, ২৯ জন ছাড়া পায় এবং বাকি সকলের কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর হয়।২

১৯১৫র শুরুতেই আমেরিকাস্থ জার্মান দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাসে ক্যাপ্টেন ফ্রানৎস ফন পাপেন নিউ ইয়র্কের ক্রুপ এজেন্সির হান্স টাউসেরকে দশ হাজার লোকের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র কিনতে এবং গোপনে সেগুলি কালিফোর্ণিয়ার সান ডিয়েগোতে পাঠাবার নির্দেশ দেন এবং ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এই নির্দেশ কার্যকর হয়। সান ডিয়েগো থেকে সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র 'অ্যানি লারসেন' নামক একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হয় এবং ৮ই মার্চ (১৯১৫) তারিখে 'অ্যানি লারসেন' যাত্রা করে। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে 'অ্যানি লারসেন' মেকসিকোয় যাবে। কিন্তু তার আসল গন্তব্যস্থল ছিল সোকোরো দ্বীপ। ওদিকে ফ্রেড জেবসেন নামক জনৈক জার্মান রে হাওয়ার্ড নামক জনৈক লজ এঞ্জেলসের এটর্ণির সহযোগিতায় ম্যাভেরিক নামক একটি ট্যাংকার ক্রয় করেন। জেবসেন, যিনি নিঃসন্দেহে একজন জার্মান এজেণ্ট, পরিকল্পনা করেছিলেন যে ম্যাভেরিক সান পেড্রো নামক স্থানে তার মাল খালাস করে দিয়ে সোজা চলে যাবে সোকোরো দ্বীপে, এবং সেখানে 'অ্যানি লারসেন' জাহাজে রক্ষিত অস্ত্রসমূহ তুলে নিয়ে যাত্রা করবে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাভেরিক ১৯১৫র ২৩শে এপ্রিল তারিখে সান পেড্রো থেকে যাত্রা করে সোকোরো দ্বীপের অভিমুখে। এই জাহাজে তখন ছিল গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র প্রেরিত হরি সিং প্রমুখ পাঁচজন লোক এবং প্রচুর বিপ্লবী সাহিত্য। ৩১শে এপ্রিল সোকোরো দ্বীপে পৌঁছে ম্যাভেরিক দেখে সব ফাঁকা, অ্যানি লারসেনের চিহ্নমাত্র নেই। অ্যানি লারসেনের ক্যাপ্টেন ম্যাভেরিকের ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে একটি নোট রেখে গিয়েছিল যাতে লেখা ছিল যে সোকোরোয় এক মাস অপেক্ষা করার পর তাঁদের জলাভাব দেখা দেয়, ফলে জলের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁরা মেকসিকোয় যাচ্ছেন। তবে শীঘ্রই তাঁরা ফিরবেন, ম্যাভেরিক যেন অপেক্ষা করে।

২। Rowlatt, 157.

এরপর দুর্দৈব অ্যানি লারসেন ও ম্যাভেরিক উভয়েরই বরাতে ঘটে। জলাভাবের জন্য অ্যানি লারসেন সোকোরো দ্বীপ থেকে আকাপুলকোতে আসে, এবং সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে সোকোরো দ্বীপে পুনরায় প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু প্রতিকূল বায়ু, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি এবং অপরাপর কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত হোকিয়াম বন্দরে আশ্রয় নেয়। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা ওই জাহাজে রক্ষিত 'মালপত্রের প্রকৃতি বুঝতে পেরে সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে। ওদিকে ম্যাভেরিক জাহাজ দিনের পর দিন অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ২৯ দিন অপেক্ষা করার পর, ম্যাভেরিক উত্তরমুখো যাত্রা করে এবং করোনাডো দ্বীপে নোঙ্গর করে, এবং সেখান থেকে সানফ্রান্সিসকো কনসুলেটের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। ম্যাভেরিকের ক্যাপ্টেনকে জানানো হয় যে তিনি যেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে নির্জন জনস্টন দ্বীপে অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করেন। সেই মত কাজ হয়, এবং আর এক দফা বৃথা অপেক্ষার পর ম্যাভেরিক বাটাভিয়ায় আসে! কিন্তু এখানে ডাচ কর্তৃপক্ষ জাহাজটিকে আটক করে। ম্যাভেরিকের তত্ত্বাবধায়ক স্টার হাণ্ট এবং বারজন ভারতীয় অন্য একটি জাহাজে চেপে পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরা পড়েন। ম্যাভেরিক প্রসঙ্গের এখানেই ইতি।

অথচ এই ম্যাভেরিককে কেন্দ্র করে এখানকার বিপ্লবীরা কতই না আশা করেছিলেন! সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯১৫র মার্চে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ভারতে আসেন, এবং এই সংবাদ জানান যে জার্মানরা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে, এই উদ্দেশ্যে যেন কাউকে বাটাভিয়ায় পাঠানো হয়। ফলে নরেন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন) সি মার্টিন নাম নিয়ে বাটাভিয়ায় যান, এবং সেখানকার জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। নরেন ভট্টাচার্যকে পাঠানো হয় ১৯১৫র এপ্রিলে। দলের নেতা যতীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে আত্মগোপন করেছিলেন কেননা পুলিশ তাঁকে গার্ডেন রীচ এবং বেলেঘাটা ডাকাতির ব্যাপারে খুঁজছিল। বাটাভিয়ায় হাজির হয়ে নরেন ভট্টাচার্য ওরফে মার্টিন সেখানে জার্মান কনসাল থিয়োডোর হেলফেরিষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হেলফেরিষ তাঁকে জানান যে একটি জাহাজ অস্ত্র নিয়ে শীঘ্রই করাচী বন্দরে আসছে। বলাই বাহুল্য ওই জাহাজটি ম্যাভেরিক। মার্টিন জানান যে করাচীতে জাহাজ এলে কোন লাভ নেই, কেননা সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্রের ডেলিভারী নেওয়া শক্ত, বরং সেই জাহাজকে পাঠানো হোক সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে। এই যুক্তি গৃহীত হয়, এবং মার্টিন কলকাতার 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নামক

কোম্পানীকে (আসলে এটি ছিল একটি কোম্পানীর ছদ্মনামে বিপ্লবীদের আখড়া) তার করে দেন যে ব্যবসার গতি ভাল। জুন মাসে 'হ্যারি এন্ড সন্স' মার্টিনকে টাকার জন্য তার করে, এবং বাটাভিয়া থেকে হেলফেরিষ 'হ্যারি এন্ড সন্স'-কে দুই দফায় ৪৩,০০০ টাকা পাঠান, যার মধ্যে ৩৩,০০০ টাকা বিপ্লবীদের হাতে পড়ে, এবং বাকি ১০,০০০ পরবর্তীকালে সরকারের হাতে পড়েছিল। মার্টিন জুন মাসের মাঝামাঝি ফিরে আসেন, এবং তাঁরা স্থির করেন যে অস্ত্রগুলি তিনভাগে ভাগ করে তিন জায়গায় পাঠানো হবে হাতিয়া, কলকাতা ও বালেশ্বরে। কিভাবে অস্ত্রশস্ত্রের ডেলিভারী নেওয়া হবে তার ব্যবস্থা করেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় এক জমিদারের সঙ্গে এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করা হয়। ১লা জুলাই-এর মধ্যে ম্যাভেরিকের আগমন তাঁরা আশা করেছিলেন। অতুল ঘোষ নৌকায় করে রায়মঙ্গলের নিকটবর্তী এলাকাসমূহে টহল দেওয়ানোর জন্যও কিছু লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলেন।৩ কিন্তু প্রত্যাশিত ম্যাভেরিক কোনদিনই আসেনি, কেন তা আগেই বলেছি।

ম্যাভেরিক ছাড়াও অন্য সূত্রে কিছু অস্ত্র আসার কথা ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আত্মারাম নামক জনৈক গদর পার্টির লোক আমেরিকা থেকে সাংহাই ও ব্যাঙ্কক হয়ে পাঞ্জাবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। মার্চ মাসে তাঁর সঙ্গে যাদু-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার হয় কলকাতায়, আমেরিকা ফেরত সত্যেন সেন অথবা তাঁর মামা বিজয় রায় মারফৎ। আত্মারাম তাঁকে ব্যাঙ্ককের কনসাল-জেনারেলের কাছ থেকে অস্ত্রপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়ে যান। বিপ্লবীরা এই বিষয়টি বাটাভিয়ার হেলফেরিষকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখেন। হেনরী এস. নামক একটি জাহাজে এবং আরও দুটি জাহাজে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সত্যই পাঠানো হয়েছিল। পরিকল্পনা হয়েছিল সাংহাই থেকে সোজাসুজি একটি জাহাজ হাতিয়া যাবে, আর একটি জাহাজ যাবে বালেশ্বরে। তৃতীয় জাহাজটি আন্দামান দখল করে বন্দীদের মুক্ত করে দেবে, সেখান থেকে অতঃপর সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনে হানা দেওয়া হবে। বৃটিশ সরকার এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিল। ফলে সাংহাই-এ ফণী চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হন, অবনী মুখার্জী গ্রেপ্তার হন সিঙ্গাপুরে। অবনী মুখার্জীর একটি নোটবই থেকে শ্যামদেশের প্যাকো শহর নিবাসী অমর সিং এর নাম পাওয়া যায়। মান্দালয় জেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।৪

৩। *ibid.*, 121-22.

৪। মুখোপাধ্যায় যাদুগোপাল, *op. cit.*, 36-39.

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি বাঘাযতীন নামেই প্রসিদ্ধ) ছিলেন এই বিপ্লব প্রচেষ্টার মুখ্য নায়ক। 'হ্যারি এন্ড সন্স' নামক ছদ্ম-প্রতিষ্ঠানটি চালাতেন হরিকুমার চক্রবর্তী, এবং ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা ছিল বালেশ্বরে। ১৯১৫র ৭ই আগস্ট পুলিশ 'হ্যারি এন্ড সন্স'-এ অনুসন্ধান চালায় এবং হরিকুমার চক্রবর্তী ও তাঁর ভাই মাখনলাল চক্রবর্তী, এবং তাঁদের সহকারী শ্যামসুন্দর বসুকে গ্রেপ্তার করে। শ্যামসুন্দর বসুর ভাই শৈলেশ্বর বসু, যিনি বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' চালাতেন, এবং তাঁর সহকারী নিমাই চক্রবর্তী ওরফে তারাপদকে বালেশ্বরে গ্রেপ্তার করা হয়। বালেশ্বরে অনুসন্ধানকালে 'গোপাল' নামক জনৈক ব্যক্তির পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। জানা যায় যে এই 'গোপালের' সঙ্গে শৈলেশ্বরের বিশেষ যোগাযোগ ছিল, এবং গোপাল ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কপ্তিপদায় কিছু জমির বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কপ্তিপদায় অনুসন্ধান চালিয়ে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে একটি বাড়ীর সন্ধান পায়, যেখানে কিছু বুলেট, বারুদ, এক বোতল বিষ, হ্যারি এন্ড সন্স-এর ঠিকানা, সুন্দরবনের মানচিত্র এবং ম্যাভেরিক সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র পায়। গোপাল ওই অঞ্চলের সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত তালদিহাতে তাঁর একটি দোকানও ছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুরপাল গ্রামের একদল লোক পাঁচজন ভ্রমণক্লান্ত বাঙালীকে ঘেরাও করে এবং তাঁদের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কৈফিয়ত চায়। তাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য ওই পাঁচজন রিভলবার চালান, এবং পলায়নের চেষ্টা করেন। সংবাদ পেয়ে পুলিশ স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহ সেখানে আসে এবং গ্রামবাসীদের সাহায্যে তল্লাসী শুরু করে। অকস্মাৎ একটি ধানক্ষেতের মধ্যে পুলিশবাহিনী আক্রান্ত হয় এবং কুড়ি মিনিট ধরে উভয় পক্ষে গুলি-বিনিময় চলে। এরপর দুলটি ধরা পড়ে, পাঁচজনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুপথযাত্রী, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী নিহত, জ্যোতিষ পাল আহত অবস্থায় এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্ত অল্প আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন।

পুলিশ রিপোর্টে যা আছে তা এখানে তুলে দেওয়া হল। আসলে যতীন্দ্রনাথের খোঁজে গিয়েছিলেন বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, ডেনহ্যাম, বার্ড ও টেগার্ট। আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাঙালী ডাকাত এসেছে, তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রতিটি লোক পিছু দুশো টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্রামে গ্রামে চাঞ্চল্য পড়ে গেছল। বালেশ্বর স্টেশন থেকে পাঁচজন হাঁটাপথে হরিপুর আসেন, তারপর বুড়িবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুর পৌঁছান। সেখান থেকে নদী পার হয়ে জঙ্গলের দিকে যাবার

সময়, কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁদের ধরার চেষ্টা করে, এবং গ্রামের দফাদারের একজন লোক বালেশ্বরে এই খবর দেবার জন্য ছুটে যায়, এবং বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত গুলি চালিয়ে নিজেদের পথ করে নিলেন। দু-চারজন লোক তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখল। পথে একটি গ্রাম্য খাবারের দোকানে তাঁরা কিছু খেয়ে নিয়ে আবার চললেন, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর আর একদল গ্রামবাসী তাঁদের ঘেরাও করল। অনুরোধে যখন কোন কাজ হল না, তখন মনোরঞ্জন গুলি ছুঁড়লেন যার ফলে একজন নিহত হল, এবং কয়েকজন আহত হল। অতঃপর তাঁরা আরও এগিয়ে চাষখন্দ গ্রামে পেঁছে একটি নদী পার হলেন। তারপর আর একটু এগিয়ে একটি প্রকাণ্ড উইঢিবির পিছনে বসে বিশ্রামের চেষ্টা করলেন। এদিকে পিছু পিছু ততক্ষণে তাঁদের ধরবার জন্য একটি গোটা বাহিনী আসছিল, সংবাদ পেয়ে। চিন্তামণি সাহু নামক একজন দারোগা খুব সতর্কতার সঙ্গে এঁদের অনুসরণ করেছিল। বিরাট বাহিনী এল লেফটন্যাণ্ট রদারফোর্ডের নেতৃত্বে, সঙ্গে রইলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি, পুলিশ সাহেব খোদাবক্স এবং ডি. আই. জি. রাইল্যাণ্ড সহ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। চিন্তামণি সাহু নামক দারোগাটি তাঁরা কোন স্থানে থাকতে পারেন তা দেখিয়ে দিল। এরপর শুরু হল বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, প্রথমে সরকারী তরফে পরে উভয় তরফে। যুদ্ধ হয়েছিল তিন ঘণ্টা, কুড়ি মিনিট নয়। গুলি ফুরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ থামেনি। মনোরঞ্জন ও নীরেন আত্মসমর্পণ করেছিলেন বলে পুলিশ রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল তা ঠিক নয়। নিহত দুজন ছাড়া বাকি তিনজনের মধ্যে যতীশ পালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয়। ঘটনাস্থলে টেগার্ট ছিলেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে টেগার্ট বালেশ্বরে অপেক্ষা করছিলেন, পক্ষান্তরে কিলবির সাক্ষ্যে দেখা যায় যে টেগার্ট ঘটনাস্থলে ছিলেন।

•

বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি ১৯১৫ সালে তুঙ্গে উঠেছিল। এখানে আমরা তারিখ অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দিচ্ছি। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিহত হয়েছিলেন নীরোদ হালদার যিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী নিহত হয়েছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জী, ৩০শে মার্চ কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ২৫শে আগস্ট মুরারি মিত্র, ১৯শে অক্টোবর পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, ২১শে অক্টোবর সাব-ইনস্পেক্টর গিরীন ব্যানার্জী, ১৯শে ডিসেম্বর ধীরেন্দ্র বিশ্বাস।

ডাকাতির ঘটনা নিম্নরূপ : ২৩শে জানুয়ারী রংপুরের কুরুলে, ৫০,০০০ টাকা; ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার গার্ডেন রীচে, ১৮,০০০ টাকা; এই ডাকাতির সঙ্গে নরেন ভট্টাচার্য জড়িত ছিলেন; ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজশাহীর ধারাইলে, ২৫,০০০ টাকা; ২২শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার বেলেঘাটায়, ২০,০০০ টাকা; ২৩শে এপ্রিল নদীয়ার পরাগপুরে, ২,৩০০ টাকা; ৬ই জুন বাখরগঞ্জের গাজীপুরে, ১৫,০০০ টাকা; ২৬শে জুন কলকাতার গোপী রায় লেনে, ১২,৫০০ টাকা; ১৪ই আগস্ট ত্রিপুরার হরিপুরে, ১৮,০০০ টাকা; ৭ই সেপ্টেম্বর মৈমনসিংহের চন্দ্রকোণায় ২১,০০০ টাকা; ৩০শে সেপ্টেম্বর নরেন ঘোষের নেতৃত্বে নদীয়ার শিবপুরে, ২০,০০০ টাকা; ২রা ডিসেম্বর কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীটে, ২৫,০০০ টাকা। পাঞ্জাবে গদর পার্টি প্রভাবিত লোকেদের দ্বারা ফেব্রুয়ারীর পর থেকে নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্ডগুলি হয়েছিল : ২০শে ফেব্রুয়ারী, হেড কনস্টেবল মাসুম আলি শাহ, এবং সাব-ইনস্পেক্টর মোহম্মদ মুসা; ২৫শে এপ্রিল, চন্দ্র সিং জেলদার; ২রা আগস্ট, লাহোর চক্রান্ত মামলার সাক্ষী কাপুর সিং। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাচীন ওহাবী আন্দোলনের ধারক একটি গোষ্ঠী ছিল যাদের বলা হত মুজাহিদিন। ১৯১৫ সাল থেকে, অর্থাৎ মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজদের যোগদান দেখে, এরা বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল।৫

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি বার্লিনে অবস্থিত ইন্দো-জার্মান সোসাইটির গঠনতন্ত্রের আগাগোড়া পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর সমস্ত সদস্যই গ্রহণ করা হয় ভারতীয়দের থেকে এবং প্রতিষ্ঠানের নামও বদলে রাখা হয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি। অতঃপর আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে তার চলতি নাম বার্লিন কমিটি বলেই উল্লেখ করব। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বার্লিন কমিটি যে পরিকল্পনা করেছিল তা হচ্ছে নিম্নরূপ : স্থির হয়েছিল যে শ্যামদেশস্থ জার্মানরা সেখানকার ভারতীয়দের সহযোগে মৌলমিনের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করবে। তিন জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষে পাঠানো হবে, একটি জাহাজে ৫০০ জন জার্মান অফিসার এবং ১০০ জন সৈন্য আন্দামান দখল করে সেখানকার রাজবন্দীদের মুক্ত করে দেবে, আর একটি জাহাজ কলকাতায় আসবে, এবং তৃতীয়টি ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাবে। যে মুহূর্তে ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বিপ্লব শুরু হবে, এবং একই সময় আফগানিস্তান ও

৫। Rowlatt, 174.

বেলুচিস্তান দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা হবে। এই পরিকল্পনার কথা যে ভারতীয় বিপ্লবীরা বেশ ভাল করেই জানতেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে তৈরীও হয়েছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু জার্মান সাহায্য কার্যত কোনদিনই আসেনি, এবং সন্দেহ হয় যে মৌখিক উৎসাহ জার্মানরা যত দেখিয়েছে, কার্যক্ষেত্রে তারা সত্যই ততদূর অগ্রসর হয়নি। এ বিষয়ে নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) তাঁর স্মৃতিকথায় যা উল্লেখ করেছেন তা রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে হেলফেরিষ এবং তাঁর প্রভাবশালী ভাই-এর সঙ্গে কথাবার্তায় স্থির হয়েছিল যে ডাচ বন্দরসমূহ থেকে জার্মান জাহাজগুলি আন্দামান আক্রমণ করবে, কিন্তু মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে জার্মানরা বিষয়টিতে কোন গুরুত্ব দেয়নি, এবং যেদিন ওই আদেশ জারি করার কথা সেই দিনই জার্মান কনসাল রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছিলেন। ম্যানিলার জার্মান কনসালও তাঁকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জার্মান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন যে, অস্ত্র দিতে যদি সত্যই অসুবিধা থাকে তাহলে অস্ত্রের বদলে টাকা দিলেও চলবে যা নিয়ে চীন অথবা জাপান অথবা আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র কেনা যাবে। আমেরিকার জার্মান দূতাবাসে এই প্রস্তাব গেলে সেখান থেকে নরেন ভট্টাচার্যকে বলা হয় যে তিনি যেন চীনের জার্মান রাজদূত অ্যাডমিরাল হিনৎসের সঙ্গে দেখা করেন। ইতিপূর্বেই সান-ইয়াৎ-সেন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে উনান ও সেচুয়ানের বিদ্রোহীদের বশ করার মত পর্যাপ্ত টাকা পেলে ওই দুই স্থান দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত অস্ত্র পাঠিয়ে দিতে পারবেন। এই প্রস্তাব অ্যাডমিরাল হিনৎসের কাছে রাখা হলে, তিনি গোড়াতে প্রচুর আগ্রহ দেখালেও, পরে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলেন।৬

আবার বার্লিন কমিটির কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯১৫ সালের মে মাসে বার্লিন কমিটি ভিনসেণ্ট ক্রাফট নামক জনৈক ব্যক্তিকে বাটাভিয়ায় পাঠায় আন্দামান আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে। এই পরিকল্পনার যুক্তি-যুক্ততা ভারতীয় বিপ্লবীরা অনুমোদন করেন। যতীন মুখার্জীর লোক হিসাবে নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ক্রাফটের সাক্ষাৎকারে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরে বার্লিনে এই রিপোর্ট পৌঁছয় যে এ বিষয়ে কিছুই করা হয়নি এবং ভিনসেণ্ট ক্রাফট সিঙ্গাপুরে ইংরাজদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আন্দামান আক্রমণের আদেশ দেওয়ার দিন জার্মান কনসাল যে অন্তর্ধান করেছিলেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ১৯১৫র জুলাই মাসে

৬। এই বিষয়ে এম. এন. রায়ের *Memoirs* দ্রষ্টব্য।

বার্লিন কমিটি ডঃ দউস দেক্কারকে জাভাস্থ ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র চালান দিতে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেয়। ডঃ দউস দেক্কার ছিলেন জাভার জাতীয়তাবাদী দলের নেতা। তিনি চীনে ইংরাজদের হাতে গ্রেপ্তার হন, এবং রাজসাক্ষী হয়ে তাঁদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার কথা ফাঁস করে দেন। ওই বছরেরই ১৫ই থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই তিন দিন সিঙ্গাপুরে কার্যরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তা সহজেই দমন করা হয়।৭

ইরাণে একটি বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়েছিল যার সদর দফতর ছিল বার্লিনে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ইরাণে বৃটিশ ও রুশবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলা। ইরাণ অভিমুখে কিছু ভারতবাসী ও ইরাণীয় এই উদ্দেশ্যে জার্মানী থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা ১৯১৫র ফেব্রুয়ারী-মার্চে তুরস্কে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের একটি দল যায় বাগদাদে এবং অপর একটি দল যায় দামাস্কাসে। এই সকল স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের বৃটিশবিরোধী করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও সেই চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। ১৯১৫র গোড়ার দিকে বরকতুল্লা, কেরসাম্প ও তারক দাস ইস্তাম্বুলে আসেন, এবং আনওয়ার পাশা তাঁদের স্বাগত জানান। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি।

চম্পকরামণ পিল্লাই, যিনি সুইজারল্যান্ড থেকে প্রো-ইণ্ডিয়া নামক একটি পত্রিকা বার করতেন এবং বার্লিন কমিটির সৃষ্টি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যুদ্ধের সময় জার্মান সরকারের সহ-যোগিতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ভোলাণ্টীয়ার কোর নামক একটি বাহিনী গঠন করেন ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে। পিল্লাই-এর পরিকল্পনা ছিল তাঁর এই বাহিনীতে যুদ্ধবন্দীদের গ্রহণ করার, এবং তাদের কাছে তিনি ব্যাপক প্রচার কার্যও চালিয়েছিলেন। তিনি গোড়ায় মেসোপোটা-মিয়াতে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থির করেছিলেন ইংরাজবিরোধী যুদ্ধ চালানোর জন্য। চম্পকরামণের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী ছিল, এবং তিনি এমডেন নামক জাহাজে অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন যে জাহাজ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের কয়েক জায়গায় গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলভূমি সম্পর্কে জার্মান নৌবাহিনীকে অবহিত করে-ছিলেন, এবং নিজেও ছদ্মবেশে দু-একবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করে-ছিলেন। চম্পকরামণ বার্লিন কমিটির নির্দেশে কাজ করেছেন না জার্মান

৭। MacMunn G., *The Turmoil and Tragedy in India, 1914 and After*, 106 ff.

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা কাজ করেছেন সেকথা বলা শক্ত। পদস্থ জার্মান কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম ছিল এবং কাইজারও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তাঁর মস্তকের জন্য মোটা অংকের পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল।

বার্লিন কমিটির কাজকর্মের কিছু সংবাদ তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন জানা যায় যেখানে বলা হয় যে বার্লিন কমিটি সক্রিয়ভাবে বৃটিশবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত থেকে বৃটিশ রাজত্বকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। গদর পার্টির কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে যে বিখ্যাত সানফ্রান্সিস্কো মামলা হয়েছিল সেখানে যে সব নথিপত্র পেশ করা হয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে ১৯১৫ সালে হেরম্ব গুপ্তকে জার্মান কর্তৃপক্ষ ৪০ থেকে ৫০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। ১৯১৫র অক্টোবরে হরদয়াল বের্কমানকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁদের কার্যক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্মার মান্দালয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে চারজনের একটি বিচারকালে জনৈক ভারতীয় সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি বার্লিনে ১৯১৫ সালের বসন্তকালে হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেখানে তিনি আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম করেন যাঁদের তিনি ব্যারন ওপেনহাইমের বাড়ীতে দেখেছিলেন। তিনি পরে আমেরিকাতেও এসেছিলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে হেরম্ব গুপ্তের সাক্ষাৎ হয়, এবং গুপ্ত তাঁকে শ্যামদেশ অভিযানে যেতে প্ররোচিত করেছিলেন। নিউইয়র্কে তিনি মাকাডে নামক জনৈক জার্মান শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হন যিনি বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে ২০,০০০ ডলার নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই সাক্ষ্যটি সানফ্রান্সিস্কো মামলায় একটি নথি হিসাবে প্রদর্শিত হয়। ওই মামলায় আরও জানা যায় যে ব্যারন কুর্ট ফণ রাইসভিৎস, চিকাগোর প্রাক্তন জার্মান কনসাল, ১৯১৫র ২রা জুন তারিখে কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে ভারতে বিপ্লব ঘটানোর একটি চক্রান্ত করেছিলেন, এবং এই বিষয়ে ওই ব্যারন ২০,০০০ ডলার ব্যয় করেছিলেন। এর পূর্বে মার্চ মাসে জর্জ পল বোহেম একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং ভেডে ও স্টেরনেকের সঙ্গে মে মাসে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সানফ্রান্সিস্কো মামলা ছাড়াও অন্যান্য সূত্রেও কিছু সংবাদ আছে। হেরম্ব গুপ্ত, আমরা আগেই দেখেছি, কিছু-কালের জন্য জাপানে গিয়েছিলেন। রাসবিহারীও তখন জাপানে বাস করতে শুরু করেছেন। এটা ১৯১৫ সালের শেষের দিকের ঘটনা। নরেন ভট্টাচার্য সেই সময় জাপানে হেরম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে স্থির করেছিলেন যে তাঁরা আমেরিকায় এসে প্রথমে সেখানকার জার্মান

রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এবং সেখান থেকে তাঁরা বার্লিনে যাবেন। ইতিপূর্বে হেরম্ব ক্যাপ্টেন ফণ পাপেনের কাছ থেকে ১৬,০০০ ডলার পেয়েছিলেন, কিন্তু তা দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করা সম্ভবপর হয়নি। দুজনে পৃথকভাবে আমেরিকায় আসেন, ১৯১৬ সালের বসন্তকালে, কিন্তু নরেন ভট্টাচার্যের জীবনের গতি ঘটনাচক্রে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তিনি ধীরে ধীরে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং নিজের নামও বদলে ফেলে মানবেন্দ্রনাথ রায় রাখেন। পক্ষান্তরে হেরম্ব গুপ্ত বার্লিন কমিটির বিরাগভাজন হন, এবং তাঁর স্থলে বার্লিন কমিটি ডঃ চন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে ইন্দো-জার্মান মিশনের কথা উল্লেখ করেছি। মিশন প্রথম আসে তুরস্কে, এবং ইস্তাম্বুল শহরে খোদ তুরস্কের সুলতান রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের কথা যত্নসহকারে শোনেন, এবং আফগানিস্থানের আমীরকে দেবার জন্য একটি পত্র তাঁর হাতে দেন। এদিকে বরকতুল্লা তুরস্কের শেখ-উল-ইসলামের কাছ থেকে একটি ফতোয়া আদায় করেন যাতে মুসলমানদের হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর মিশনটি পারস্যের ভিতর দিয়ে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করে, এবং ইস্পাহান শহরে নীডেরমায়ের পরিচালিত আর একটি মিশনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। উভয় মিশনই অতঃপর একযোগে হাঁটাপথে অগ্রসর হতে থাকে, পথে ইরাণী দস্যুরা তাঁদের উপর হামলা করে যার ফলে অনেক মালপত্র খোয়া যায়, বিশেষ করে কয়েকটি মূল্যবান দলিলপত্র। ২রা অক্টোবর ১৯১৫ তারিখে মহেন্দ্রপ্রতাপের মিশন কাবুলে প্রবেশ করে। আমীর হবিবুল্লা তাঁদের খুব যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করেন, এবং অনেকগুলি বৈঠকের পর আফগানিস্থানে একটি প্রবাসী ভারতীয় সরকার স্থাপনের অনুমতি দেন। এই প্রবাসী সরকারের প্রেসিডেণ্ট হন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা এবং ওবেদুল্লা যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সরকারের সঙ্গে আফগান সরকারের একটি সন্ধিচুক্তি হয়, এবং সরকার একদিকে জার্মান সরকার এবং অপরদিকে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থনের জন্য রুশিয়ার জারকেও একটি চিঠি দেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে প্রবাসী ভারত সরকার গঠনের তারিখ ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৫।

কাবুলে একটা শক্ত আশ্রয় পাবার পর ওবেদুল্লা মাহমুদ হাসানকে একটি চিঠি লেখেন যে তিনি যেন তুরস্ক সরকার এবং মক্কার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি মুসলিম বাহিনী গঠনের জন্য তাঁদের উৎসাহিত

করেন। মাহমুদ হাসান তখন আরবে ছিলেন। ওবেদুল্লা তাঁকে চিঠি পাঠান ১৯১৬র ৯ই জুলাই তারিখে। একটি সিল্কের কাপড়ের উপর এই চিঠি লেখা হয়েছিল বলে বিষয়টি 'সিল্ক-লেটার' চক্রান্ত নামে খ্যাত। কিন্তু মক্কার কর্তৃপক্ষ ছিলেন বৃটিশ ঘেঁষা ও তুরস্কবিরোধী, ফলে, কোন কিছুই করা সম্ভবপর হয়নি।৮

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডঃ চন্দ্র চক্রবর্তী বার্লিন কমিটি কর্তৃক আমেরিকায় হেরম্ব গুপ্তের স্থলাভিষিক্ত হন। চক্রবর্তী একটি প্যান-এশিয়াটিক লীগ সংগঠন করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিবাসী ভারতীয়দের এবং জাপানীদের এই লীগে টানবার চেষ্টা হয়। জার্মানী এই উদ্দেশ্যে চক্রবর্তীকে ১৯১৬র মে মাসে ৫০,০০০ ডলার দিয়েছিল, এবং আগস্টে আরও ১৫,০০০ ডলার। চক্রবর্তীর সহযোগী রামচন্দ্র জার্মান কনসুলেট থেকে মাসিক ১,০০০ ডলার করে পাচ্ছিলেন। কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে এঁরা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেন নি। চক্রবর্তী নিজেই একটি রিপোর্টে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁরা মোট ৫০০ পিস্তল প্রশান্তমহাসাগর পথে পাচার করতে পেরেছিলেন। জাপানের সমর্থনলাভের জন্য প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটাও বিশেষ ফলবতী হয়নি। সর্বোপরি প্রবাসী ভারতীয়দের ঘরোয়া কোন্দলও, বিশেষ করে শিখেদের অসহযোগ, চক্রবর্তীকে অসুবিধায় ফেলেছিল। তাঁর সহযোগী গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্রের প্রতিও তাঁর দলের লোকেরা খুশি ছিলেন না। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সংহতি ১৯১৬ সালে প্রায় ভেঙে গিয়েছিল।

এবারে ভারতের অভ্যন্তরে আসা যাক। বাংলাদেশে যথারীতি রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতির ঐতিহ্য ১৯১৬ সালেও বর্তমান ছিল। জানুয়ারী মাসেই চারজন নিহত হয়েছিল, শশী চক্রবর্তী বাজিতপুরে, সাব-ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য মেডিকাল কলেজের সামনে, পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের সামনে এবং রেবতী নাগ সিরাজগঞ্জে। ওই বছরে রাজনৈতিক ডাকাতি মোট হয়েছিল চারটি, তার মধ্যে তিনটিই ত্রিপুরায় এবং চতুর্থটি মৈমনসিংহে। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সমঝোতা ১৯১৬ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়, যিনি শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছিলেন সেই ফিরোজশা মেটার মৃত্যুর পর আর কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। আরও

৮। O'Dwyer, *op. cit.*, 180-82.

একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, তথা হিন্দু ও মুসলিম সহযোগিতা। কংগ্রেস এবং লীগ একই জায়গায় এবং একই সময়ে বার্ষিক অধিবেশন বসানোর ব্যবস্থা করেছিল। ১৯১৫র কংগ্রেস অধিবেশনে যখন অ্যানি বেশান্তের হোমরুল নিয়ে আলোচনা চলছিল, লীগ সেখানে পর্যবেক্ষক হিসাবে একদল প্রতিনিধি পাঠায়। ১৯১৬ সাল জুড়ে কংগ্রেস এবং লীগের প্রতিনিধিরা একযোগে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধানে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে-ছিলেন, যার ফলে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হয় যা লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট নামে পরিচিত। মুসলিম লীগের অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যানি বেশান্ত নিজের উদ্যোগেই হোমরুল লীগ পাকাপাকিভাবেই গঠন করেন, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার শাখা গড়ে ওঠে বোম্বাই, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, মথুরা, কালিকট, আহমদনগর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে। শ্রীমতী বেশান্তের বক্তৃতা ও রচনাবলী রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।৯ গোটা ১৯১৬ সাল জুড়ে তিলক হোমরুলের পক্ষে ব্যাপক প্রচার কার্য চালান, এবং তিলকের কয়েকটি বক্তৃতা সরকারের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হবার ফলে তাঁকে ২০,০০০ টাকার দুটি ব্যক্তিগত বন্ড দিতে, এবং তার জন্য দুজন জামিনদার রাখতে বাধ্য করা হয়। শ্রীমতী বেশান্তের নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার উপরেও সরকারী দমননীতি নেমে আসে।

হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা সম্পর্কে বৃটিশ সরকার রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। ১৯১৭র ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের হোম-মেম্বার একটি গোপন রিপোর্টে লিখেছিলেন যে এই আন্দোলনের ফলে নরমপন্থী নেতাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, জনসাধারণ এখন তিলক ও বেশান্তের পিছনে।১০ বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশে শ্রীমতী বেশান্তের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়, মধ্যপ্রদেশ সরকারও তাই করে। পাঞ্জাব সরকার তিলক ও বিপিন পালের পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, এবং ১৯১৭র ১৫ই জুন তারিখে মাদ্রাজ সরকার শ্রীমতী বেশান্ত এবং তাঁর দুজন সহকারী জি. এম. অরুন্দালে এবং বি. পি ওয়াদিয়াকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীমতী বেশান্তের গ্রেপ্তারের সংবাদে ভারতে এমন কি খোদ ইংলণ্ডেও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। কংগ্রেসও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ১৯১৭র কলকাতা অধিবেশনে শ্রীমতী বেশান্তকে

৯। Chintamani, *op. cit.*, 102

১০। Karmarkar, *Tilak*, (1956) 260.

সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত করে। ২৯শে জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে মুসলিম লীগের কাউন্সিলের একটি বৈঠক বসে এই বিষয়ে কি করা যায় তা নির্ধারণ করার জন্য। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তাব করে, এবং শ্রীমতী বেশান্ত সহ আরও কয়েকজন অন্তরীনের মুক্তির দাবি জানায় যাঁদের মধ্যে ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং আবুল কালাম আজাদ। এই উত্তেজনার মুহূর্তে নূতন ভারতসচিব ই. এস. মণ্টাগু ঘোষণা করেন যে বৃটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার স্থাপনকেই তার আশু লক্ষ্য মনে করেছে, এবং সেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চলেছে। বস্তুত হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতাই সরকারকে এই রকম ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল। এই ঘোষণায় নরমপন্থী শ্রেণী খুশি হন, কংগ্রেস ও লীগের একটি যুক্ত বৈঠকও হয় এলাহাবাদে ৬ই অক্টোবর তারিখে, এবং তাঁরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন পরিত্যাগ করে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। সি. ওয়াই. চিন্তামণিকে সেক্রেটারী করে বারোজনের একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁরা বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ও ভারতসচিব মণ্টাগুর সঙ্গে নভেম্বর মাসে সাক্ষাৎ করেন।[১১] তিলক হোমরুল আন্দোলনকে শিথিল করার প্রস্তাবে সায় দেন নি, এবং জনসাধারণ ছিলেন তিলকেরই পক্ষে। সর্বোপরি মুসলিম নেতাদের মধ্যে মোহম্মদ আলি জিন্না এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতসচিব মণ্টাগু ২৭শে নভেম্বর তারিখে তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু সংস্কারের টোপ তাঁকে তিনি গেলাতে পারেন নি। তাঁর সরকারী রিপোর্টে মণ্টাগু লিখেছেন, শ্রীমতী বেশান্ত ও তিলক কংগ্রেস দখল করে নিয়েছেন, নরমপন্থীরা খতম হয়ে গেছে, কংগ্রেস হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। ১৯১৭র কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীমতী বেশান্ত সভানেত্রীর ভাষণে জোরাল ভাষায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করলেন, যা ছিল চরমপন্থীদের দাবি। ১৯০৭ সালে চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, দশ বছর পরে তাঁরাই কংগ্রেস দখল করে নিলেন।

১৯১৭ সাল ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের আশা ভঙ্গের কাল হিসাবে চিহ্নিত। ৬ই মার্চ তারিখে নিউ ইয়র্কে চন্দ্র চক্রবর্তী গ্রেপ্তার

১১। Sitaramayya P., *History of the Congress,* (1935) I, 135.

হলেন, এবং ৭ই এপ্রিল তারিখে, অর্থাৎ মহাযুদ্ধে আমেরিকার অবতরণের পরের দিনই, সানফ্রান্সিস্কোয় রামচন্দ্র এবং আরও ষোলজন গ্রেপ্তার হলেন। ৭ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হলেন আরও ১০৫ জন। ১৪ই আগস্ট তারিখে ধীরেন সরকার গ্রেপ্তার হন। ২০শে নভেম্বর তারিখে বিখ্যাত সানফ্রান্সিস্কো মামলার সূত্রপাত হয়। মামলার শেষ দিনে রামচন্দ্র কোর্টের মধ্যেই রাম সিং নামক অপর একজন ভারতীয়ের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। হত্যাকারীকেও জনৈক মার্শাল গুলি করে মারে। হত্যাকারীর খুব সম্ভবত ধারণা হয়েছিল যে রামচন্দ্র তাঁর ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহার করেছেন। চন্দ্র চক্রবর্তীর এক মাস কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা হয়, এ ছাড়া আরও ২৯ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। বিচারের রায় বেরোয় ১৯১৮র ২৩শে এপ্রিল তারিখে। পাশাপাশি আরও একটি বিচার হয় সাহায্যকারী জার্মানদের, যে বিচারের রায় বেরোয় ১৯১৮র ৩০শে এপ্রিল তারিখে। এতেও কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। এই ঘটনার পরই কার্যত আমেরিকায় গদর পার্টির কাজকর্ম ও ভারত-জার্মান চক্রান্তের অবসান হয়।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে স্টকহলমে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা সেখানে সমবেত হওয়ায় বার্লিন কমিটি সেখানে প্রচারের সুযোগ নেয়, এবং ব্রেস্ট লিটোভস্কে ট্রটস্কির কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে যেন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা সম্মেলনে তোলেন। ট্রটস্কি এই অনুরোধ রেখেছিলেন বলা যেতে পারে কেননা তিনি তাঁর বক্তৃতায় মিত্রশক্তি এবং অক্ষশক্তি উভয় পক্ষেরই অধিকৃত দেশগুলির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করেন। অনুরূপ অনুরোধ ফিলিপ স্নোডেনকেও বার্লিন কমিটির তরফ থেকে করা হয় যাতে তিনি ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি তোলেন। ১৯১৭ সালের পর থেকেই বার্লিন কমিটি ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটানোর সংকল্প পরিত্যাগ করেছিল। বার্লিন কমিটির অভ্যন্তরেও মতভেদ ঘটেছিল। লালা হরদয়ালের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদির গণ্ডগোল হয়েছিল। জার্মানদের উপর হরদয়াল বিশেষ চটেছিলেন, এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েই মন্তব্য করেছিলেন যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শতগুণে শ্রেয়।

বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ত্রিমূল আচার্য স্টকহলমে এসেছিলেন। শোনা যায় চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যেটা অবশ্য তখন হয়নি। তিনি ইতিপূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের কাছে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। স্টকহলমেও তিনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হয়নি। ১৯১৭র ৩০শে মে তারিখে বার্লিন কমিটির কাছে লেখা একটি চিঠিতে চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমাদের সকলেরই মনোভাব এই যে পদানত জাতিগুলির প্রশ্নকে সমাজতন্ত্রীরা সচেতনভাবে উপেক্ষা করছে বা ঠেকিয়ে রাখছে।' এদিকে জার্মানীর উপর ভরসা করার দিন প্রবাসী ভারতীয়দের ফুরিয়ে গিয়েছিল। রুশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের পর সঙ্গতভাবেই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অতঃপর তাঁদের আশ্রয়স্থল জার্মানী নয় সোভিয়েট রুশিয়া। কিন্তু জার্মানীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হতে অনেকেরই সময় লেগেছিল। কমিউনিস্ট আদর্শকেও গ্রহণ করতে বেশির ভাগ বিপ্লবীই রাজি ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী, এবং তাঁদের লক্ষ্য ছিল রুশ সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের কতদূর বাধিত করেছিল তা আমরা পরে দেখব।

ক্রান্তিলগ্ন (১৯১৮-২০)

১৯১৫ সালে সরকার ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট চালু করে বিনা বিচারে ব্যাপক গ্রেপ্তারী ও অন্তরীণ করে রাখার অধিকার লাভ করেছিল, এবং এই কাজে গোখলে প্রমুখ নরমপন্থী নেতাদের সমর্থন পেয়েছিল।১ বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যই সন্দেহভাজন ব্যক্তি-মাত্রকেই বিনা বিচারে গ্রেপ্তার এবং নির্জন কারাকক্ষে পাশবিক নিপীড়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অসংখ্য লোকের উপর চরম অত্যাচার করা হয়েছিল। সে নৃশংসতার দু-একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। দৌলতপুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ শেঠকে ১৯১৭র ২৮শে আগস্ট তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং উৎপীড়নের চোটে জেলখানার মধ্যেই তিনি প্রাণ হারান ১৯১৮র ১৬ই জানুয়ারী তারিখে। হুগলীর অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষকে ১৯১৭র ৩রা জানুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করা যায় নি, কিন্তু তাঁর উপর এমন উৎপীড়ন চালানো হয়েছিল যে তিনি সারা জীবন অকর্মণ্য হয়ে যান।২ অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা সহ্য করতে না পেরে অনেকে জেলখানার মধ্যে আত্মহত্যাও করেছিলেন। বস্তুত তথাকথিত সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে গিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধকালে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশে যে কাণ্ড করেছিল, সেই কাণ্ডের তুলনা করলে পরবর্তীকালে হিটলারের লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

১৯১৬ সালের এপ্রিলে লর্ড চেমসফোর্ড লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থলে বড়লাট হয়ে আসেন। যুদ্ধ প্রাক্তন পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে-ছিল, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ভারতসচিব অস্টিন চেম্বারলিন নরমপন্থী নেতাদের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। তিনি পদত্যাগ করে চলে গেলে তাঁর স্থলে ই. এস. মণ্টাগু ভারতসচিব নিযুক্ত হন। মণ্টাগু একটি সংস্কার পরিকল্পনা বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট দাখিল করেছিলেন এবং অনেক আলোচনার পর মন্ত্রিসভা তা গ্রহণও করেছিল, এবং সেই কথা মণ্টাগু হাউস অফ কমনসে বলেছিলেন ১৯১৭র ২০শে আগস্ট তারিখে।

১। Hardinge, *op. cit*, 115-17.
২। *Modern Review,* (1918), 224-27, 336-41, 688.

এরপর মণ্টাগ্ন জানান যে পরিকল্পনাটি নিয়ে তিনি ভারতে যাবেন ও বড়লাটের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। ভারতবাসীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বৃটিশ সরকার কয়েকটি ব্যবস্থাও নেয়। সেনাবাহিনীর রাজকীয় কমিশনে অতঃপর ভারতীয়দের যাবার বাধা অপসৃত হয়। শ্রীমতী বেশান্ত ও অপরাপর হোমরুল আন্দোলনের নেতাদের, যাঁদের অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল, মুক্তি দেওয়া হয়। এগুলিকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে মনে করে কংগ্রেস এবং লীগ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তাব তুলে নেয়।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বৃটিশ নীতির আসলে কোন পরিবর্তন হয়েছিল। লর্ড চেমসফোর্ড, ভারতের তৎকালীন বড়লাট যিনি মণ্টাগুর সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর দমননীতি বিন্দুমাত্র শিথিল করেন নি। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই বিনা বিচারে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জেলে পুরে রাখার জন্য এবং তাঁদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য আর একটি আইনের প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে বিচারপতি রাওলাটকে সভাপতি করে একটি কমিশন বসানো হয়। এই কমিশন যে রিপোর্ট দেয় ১৯১৮র ১৫ই এপ্রিল তারিখে (রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৮র ১৯শে জুলাই) তা সিডিশন কমিটির রিপোর্ট নামে পরিচিত। বলাই বাহুল্য, এই রিপোর্টে উৎকট দমননীতির সুপারিশ করা হয়েছিল, এবং এটা ইচ্ছাকৃত কি দৈব ঘটনা বলা যায় না, এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা প্রকাশের মাত্র এগারো দিন পরে। এক হাতে সংস্কারের আশ্বাস এবং অপর হাতে পীড়নের খড়গ, ভারতে বৃটিশ নীতির সঠিক পরিচয় যেন এই দুটি রিপোর্টে সমকালীন প্রকাশের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়েছিল। সন্দেহ করার কারণ আছে, বৃটিশের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, কেননা রাওলাট রিপোর্ট নিয়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঘটবে সেটা জানা কথাই ছিল। সরকার কি চেয়েছিল যে মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনার যে কয়টি সামান্য প্রগতিশীল সুপারিশ ছিল সেগুলি প্রবল বিক্ষোভে চাপা পড়ে যাক, এবং গণ্ডোগোলের সুযোগে পুরোনো ব্যবস্থাই চলুক?

এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব. এখন মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রসঙ্গে আসা যাক। আমরা আগেই বলেছি যে ১৯১৭র ২০শে আগস্ট তারিখে মণ্টাগু বৃটিশ পার্লামেণ্টে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। মণ্টাগুর এই ঘোষণার মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে দেখা গিয়েছিল। নরমপন্থীরা মণ্টাগুর ঘোষণাকে প্রবলভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন, কিন্তু

চরমপন্থীদের মতে এই ঘোষণা তাঁদের প্রত্যাশার অনেক নীচে। ১৯১৭র কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রতিক্রিয়ার এই দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। এদেশে বসবাসকারী ইংরাজরা মণ্টাগু ঘোষিত সংস্কারের বিরোধিতা করে। বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহে আসনের সংরক্ষণ দাবি করে। এ বিষয়ে মুসলিম লীগের অভিমতের সঙ্গে আমরা পরিচিত। মাদ্রাজের অব্রাহ্মণরা ডঃ নায়ারের নেতৃত্বে এবং পাঞ্জাবের শিখ নেতারাও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। এই অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে মণ্টাগু তাঁর দলবল নিয়ে ভারতে আসেন ১৯১৭র ১০ই নভেম্বর তারিখে। বিভিন্ন সংস্থার লোকজন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু করেন, এবং মণ্টাগু সুকৌশলে নরমপন্থী নেতাদের সমর্থন আগে থেকেই আদায় করে নেন।৩ ১৯১৮র ২২শে এপ্রিল তারিখে সিমলা থেকে মণ্টাগু এবং লর্ড চেমসফোর্ডের স্বাক্ষরিত প্রত্যাশিত রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত আকারে রিপোর্টটির প্রকাশ ঘটে ৮ই জুলাই তারিখে। এই রিপোর্টে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়: স্থানীয় পরিষদসমূহ এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হবে, কর আদায় ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অধিকার থাকবে; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেট পৃথকভাবে হবে, এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রসমূহ পৃথকভাবে নির্দিষ্ট হবে; প্রাদেশিক শাসন পরিষদ মিশ্র ধরনের হবে, একদিকে গভর্ণর ও তাঁর কার্যপরিষদ, অপরদিকে মন্ত্রিসভা, দু' তরফের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি থাকবে; প্রাদেশিক আইনসভাগুলি নির্বাচন ভিত্তিক হবে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হবে, পাঞ্জাবের শিখদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা প্রসারিত হবে; কয়েকটি বিষয়ে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও, বৃহৎ বিষয়সমূহে গভর্ণর তাঁদের সিদ্ধান্ত মানতে নাও পারেন, মন্ত্রীদের কর্মক্ষেত্র 'হস্তান্তরিত বিষয়' এবং গভর্ণরের কর্মক্ষেত্র 'সংরক্ষিত বিষয়' হিসাবে রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে; আইনসভা গভর্ণরকে কোন অধিকার দিতে বাদ সাধলে গভর্ণর অন্যভাবে তাঁর অনুকূলে আইন পাশ করিয়ে নিতে পারেন; 'সংরক্ষিত বিষয়সমূহকে' ধীরে ধীরে 'হস্তান্তরিত বিষয়ে' রূপান্তরিত করা হবে, এবং এইভাবেই 'পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের' দিকে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে; কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থাৎ ভারত সরকারের ক্ষেত্রে, বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদে ভারতীয়দের যাবার পথের বাধা অপসৃত হবে, একশোজন সদস্যকে নিয়ে রচিত হবে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে নির্বাচিত এবং

৩। Montagu, *An Indian Diary,* (1930), 134.

অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ হবে মনোনীত; বড়লাট যাতে প্রয়োজনীয় আইনের অভাবে বিড়ম্বিত না হন সেই উদ্দেশ্যে 'কাউন্সিল অফ স্টেট' নামক একটি পাল্টা সংস্থারও ব্যবস্থা হবে যার মারফৎ বড়লাট মনোনীত আইন পাশ করিয়ে নিতে পারেন; ভারতসচিবের মারফৎ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের যে খবরদারির সুযোগ প্রচুরভাবে ছিল, তা কিয়দংশে খর্ব করা হবে; ভারতবর্ষের জন্য একটি প্রিভিকাউন্সিলের সৃষ্টি করা হবে; দেশীয় রাজ্যগুলির রাজাদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠিত হবে যার সভাপতিত্ব করবেন বড়লাট।

মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে অনেক গালভরা বুলি থাকলেও কার্যত তা অন্তঃসারশূন্য। এখানে একটি দ্বৈতশাসনের সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতার মূল চাবিকাঠিটি বড়লাট ও গভর্ণরদের হাতে রাখা হয়েছে। উভয় তরফই আইনসভা ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, এবং নিজেদের মনোমত আইন খিড়কি পথে পাশ করিয়ে নিতে পারেন। প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরই মন্ত্রিসভার হাতে রাখা হয়নি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা ইত্যাদি গৌণ বিষয়গুলিকেই 'হস্তান্তরিত বিষয়ের' তালিকায় রাখা হয়েছে। এই কারণেই চরমপন্থী নেতারা মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।৪ নরমপন্থীরা পক্ষান্তরে এই সংস্কার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন, এবং এই বিষয়টিকেই উপলক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেস বোম্বাই শহরে ২৯শে আগস্ট (১৯১৮) একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। এর পূর্বে ১৭ই আগস্ট তারিখে নরমপন্থীরা কলকাতায় একটি সম্মেলন আহ্বান করে আসন্ন বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মডারেটদের এই রকম সিদ্ধান্তের পিছনে মণ্টাগুর যথেষ্ট হাত ছিল। বোম্বাই অধিবেশনে মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টকে নিন্দা করা হয় এবং ভারতবাসীর জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক অধিকারসমূহ দাবি করা হয়। এখানে বলা হয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতবাসীরা পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সমর্থ, এবং দাবি করা হয় যে খিড়কী পথে বড়লাট ও ছোটলাটদের নিজেদের মনোমত আইন পাশ করিয়ে নেবার ক্ষমতা লোপ করতে হবে, 'হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহের' মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহকে আনতে হবে, এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা ১৫০ জনকে নিয়ে গঠিত হবে যার চার-পঞ্চমাংশ সদস্য হবে নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি কংগ্রেস-লীগ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ওই সময় মাহমুদাবাদের রাজার

৪। Athalye, *op. cit.*, 251-52.

সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশনে মুসলিম লীগও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলার নরমপন্থী নেতারা ইতিমধ্যেই পৃথক হয়ে 'ন্যাশানাল লিবারেল লীগ' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন, এবং নভেম্বরে বোম্বাইতে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহবান করে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯১৮র ডিসেম্বরে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে, যার সভাপতি হয়েছিলেন মদনমোহন মালব্য, এ তরফ থেকেও বিচ্ছেদটাকে পাকা করে দেওয়া হয়, এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ যে দু'চারজন নরমপন্থী এতে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস যে সকল দাবি তুলেছিল, এই অধিবেশনে সেগুলিকে আরও একটু চড়িয়ে দেওয়া হয়, দাবি তোলা হয় যে অন্ততপক্ষে প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে আগাগোড়া ভারতীয়দের দ্বারাই অবিলম্বে দায়িত্বশীল সরকারের পত্তন করিয়ে দেওয়া হোক। ওই অধিবেশনে এটাও স্থির হয় যে ইংলণ্ডে এই উদ্দেশ্যে একটি ডেপুটেশন পাঠানো হবে, এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে দাবি জানানো হবে যেন ভারতীয়দের এমন একটি জাতি বলে ঘোষণা করা হয় যাদেব উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করা উচিত।

১৯১৭র হোমরুল লীগের বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে প্রচার-কার্যের জন্য প্রভাবশালী লোকেদের ইংলণ্ডে পাঠানো হবে, এবং ওই বছরের জুলাই মাসে জোসেফ ব্যাপিস্টা সেখানে প্রেরিত হয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দফায় নরসিংহ আয়ার সহ আরও বারজনকে ১৯১৮ মার্চ মাসে পাঠানো হয়, কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে তাঁদের জিব্রাল্টার থেকে ফেরত পাঠানো হয়। এই খবর জানার আগেই তিলকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের ইংলণ্ডে গিয়ে প্রতিবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন তিলক, খাপার্দে, করণ্ডিকার, কেলকার ও বিপিন পাল। তাঁরা বোম্বাই পরিত্যাগ করেন ১৯১৮র ২৭শে মার্চ এবং ১লা এপ্রিল মাদ্রাজে উপনীত হন যেখানে শ্রীমতী বেশান্তসহ অসংখ্য মানুষ তাঁদের অভিনন্দন জানান। মাদ্রাজ থেকে কলোম্বোয় উপনীত হবার পর তাঁরা জানতে পারলেন যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁদের পাশপোর্ট বাতিল করেছেন, এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা তাঁদের সফর নিষিদ্ধ করেছেন। ভারত সরকারের পক্ষে যে কাজটা খুব গর্হিত হয়েছিল তা মণ্টাগুও স্বীকার করেছিলেন।[৫] এই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর মুখরিত হয়েছিল। আসলে তিলক সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আতঙ্ক ছিল, যে কারণে বড়লাটের আহবানে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-সম্মেলনে তিলককে

৫। Montagu, *op. cit*, 345-46.

আহ্বান করা হয় নি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এর প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন যে তিলক, শ্রীমতী বেশান্ত ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে আমন্ত্রণ জানানো না হলে, তিনিও ওই সম্মেলনে যোগদান করবেন না, কিন্তু পরে ভাইসরয়ের পরামর্শে তিনি মত বদলেছিলেন। 'ভারতের বৃহত্তম নেতাকে আহ্বান না করার জন্য মণ্টাগুও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অনুরূপ একটি সম্মেলন ১০ই জুন তারিখে বোম্বাইতে হয়েছিল, এবং বাধ্য হয়েই তিলককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বক্তৃতাকালে তিলক বলেন যে সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা সর্তাধীনেই হতে পারে, হোমরুল ব্যতিরেকে হোম-ডিফেন্স অসম্ভব। তিলককে বক্তৃতাকালে সরকারের তরফ থেকে বার বার বাধা দেওয়া হলে তিনি এবং তাঁর হোমরুল লীগের সহ-যোগীরা সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। ১৯১৮র ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিলক ইংলণ্ড যান, স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের বিরুদ্ধে তিনি যে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন সেই সূত্রে। ওই বছর তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হলেও তাঁর পক্ষে সভাপতিত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি এই কারণেই।

১৯১৯ সালটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়, মূলত পাঁচটি কারণে—রাওলাট বিল ও তার ফলাফলসমূহ, গান্ধীনেতৃত্বের অভ্যুদয়, মণ্টাগু-চেমসফোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, প্যান-ইসলামবাদের পুনরুত্থান, এবং প্রবাসে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থলের পরিবর্তন। বিচারপতি রাওলাটের নেতৃত্বে রচিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে দুটি আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৯১৯ এর ১৮ই মার্চ তারিখে। প্রথমটি হচ্ছে 'অ্যানার্কিকাল এণ্ড রেভোলিউ-শনারী ক্রাইমস অ্যাক্ট' যার দ্বারা যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যত্রতত্র গ্রেপ্তার করা চলবে এবং বিশেষ আদালতে তাদের তড়িঘড়ি বিচার হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টকে তোয়াক্কা না করে (অর্থাৎ সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকেই), এবং বিচারের রায়ের উপর কোন আপীল চলবে না। প্রাদেশিক সরকার যে কোন ব্যক্তির উপর যে কোন ধরনের আদেশ করতে পারে, বলতে পারে এত টাকা সিকিউরিটি হিসাবে দাও, বলতে পারে তুমি অমুক জায়গায় যাবে না, বলতে পারে তোমায় রোজ থানায় হাজিরা দিতে হবে, যে কোন ব্যক্তির বাড়ী বিনা ওয়ারেণ্টে তল্লাসী হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৬] বলাই বাহুল্য এই আইন সারা দেশে প্রবল প্রতিবাদ ও

৬। Singh G. N., *Landmarks of Indian Constitutional and National Development*, 667 ff.

বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই নয়, আইনপরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ একযোগে এই আইনটির বিরোধিতা করেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে চারজন প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেছিলেন। শুধু সরকারী সদস্যদের ভোটেই আইনটি পাশ হয়েছিল। এই আইনটিই সাধারণভাবে রাওলাট আইন নামে কুখ্যাত। তিলক তখন বিদেশে। কংগ্রেসের নেতারা এই কুখ্যাত আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সমবেত হলেন। মোহন-দাস করমচাঁদ গান্ধীর সভাপতিত্বে একটি 'সত্যাগ্রহ সভা' গঠিত হল, যার সদর দপ্তর হল বোম্বাইতে। অজস্র প্রচারপুস্তিকা ছড়ানো হল, এবং জনসভাও অনুষ্ঠিত হল অসংখ্য। স্থির হল যে ৩০শে মার্চ (১৯১৯) তারিখে দেশব্যাপী হরতাল হবে। পরে দিন বদলে ৬ই এপ্রিল হরতালের দিন ধার্য করা হয়। দিল্লীতে কিন্তু পূর্ব ঘোষিত ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল ঘটে গেল, এবং পুলিশ একটি নিরস্ত্র মিছিলের উপর গুলি চালালো। অনুরূপ ঘটনা ঘটল লাহোরে ও অমৃতসরে। ৬ই এপ্রিল সংঘটিত হল ভারতজোড়া হরতাল, এবং তার ব্যাপক সাফল্য গান্ধীর মর্যাদাও জনসাধারণের মধ্যে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। ৭ই এপ্রিল রাত্রে গান্ধী দিল্লী ও অমৃতসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে পালওয়াল স্টেশনে তাঁকে পাঞ্জাব যেতে বিরত হবার জন্য সরকারী নিষেধাজ্ঞা এল এবং গান্ধী তা মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে একরকম গ্রেপ্তার করেই বোম্বাই-এর ট্রেনে তুলে দেওয়া হল। এটা ঘটেছিল ১০ই এপ্রিল তারিখে। গান্ধী বোম্বাই-এ এলে সেখানে উত্তেজিত জনগণের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়, এবং আমেদাবাদের সত্যকারের হাঙ্গামা বেধে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণী কর্মবিরতি পালন করে, পথেঘাটে সংঘর্ষ শুরু হয়, পুলিশ গুলি চালায় এবং আমেদাবাদ শহরটির উপর সামরিক আইন জারি হয়। নদিয়াদ স্টেশন অঞ্চলে প্রচুর সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা হয়। বিরামগামে একজন সরকারী অফিসার নিহত হন। গণআন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হচ্ছে এই কারণে গান্ধী পূর্বে গৃহীত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন, যে কথায় আমরা পরে আসছি।

কিন্তু ঘটনাচক্র আরও দ্রুত আবর্তিত হচ্ছিল। পাঞ্জাবের লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর মাইকেল ও'ডোয়ার যুদ্ধের জন্য সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের অছিলায় এক ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছিলেন।[৭] ৬ই এপ্রিলের হরতালের এক সপ্তাহের মধ্যে পাঞ্জাবে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ১০ই এপ্রিল গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্র লাহোর শহরে স্বতস্ফূর্ত হরতাল

৭। *ibid.*, 664.

ঘটে, এবং ছাত্ররা একটি মিছিল বার করে যার উপর পুলিশ গুলি চালিয়ে তিনজনকে নিহত এবং আরও কয়েকজনকে আহত করে। লহরী গেটে একটি জনসভার শেষে লোকেরা যখন ফিরে যাচ্ছিল, তাদের প্রতি গুলি-বর্ষণ করা হয়, যার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। ১২ই এপ্রিল তারিখে বাদশাহী মসজিদে একটি সমাবেশের উপর পুলিশ ও মিলিটারী নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে যাতে লালা খুশিরাম নামক একটি ছাত্রসহ অনেকে নিহত হন।[৮] গুজরাণওয়ালাতে ১৪ই এপ্রিল ব্যাপক হাঙ্গামা হয়।[৯] কসুরে ১২ই এপ্রিল জনতা প্রধান পোস্ট অফিস পুড়িয়ে দেয়, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়, রেলওয়ে স্টেশন ধ্বংস করে এবং দুজন ইউরোপীয় সৈন্যকে হত্যা করে।[১০] অমৃতসরে ৩০শে মার্চ ও ৬ই এপ্রিলের ধর্মঘটের পরে অবস্থা রীতিমত শান্ত ছিল, বিশাল রামনবমী উৎসবের মিছিল শান্তিতে পথপরিক্রমা করেছিল,[১১] কিন্তু ১০ই এপ্রিল তারিখে ও'ডোয়ারের সরকার পাঞ্জাবের দুজন শ্রদ্ধেয় নেতা ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুকে আকস্মিক গ্রেপ্তার করে ঝড়ের সূত্রপাত করে। এই দিনই দুপুরে খবর আসে যে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং সেই উপলক্ষে অমৃতসরে হরতাল হয়ে যায়। হলগেট ব্রীজ নামক একটি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর নিকট একটি নিরস্ত্র বিক্ষোভ মিছিলের উপর অকস্মাৎ গুলি চালান হয় যার ফলে বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। এরপরেই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তারা পাঁচজন ইউরোপীয়কে হত্যা করে, দুটি ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টাউন হল ও একটি গীর্জার ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু এই হাঙ্গামার প্ররোচনা, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এসেছিল সরকারের তরফ থেকে, হলগেট ব্রীজের ঘটনার পর।[১২]

পরদিন অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল শান্তিপূর্ণভাবেই কেটেছিল, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের আগমনের পর থেকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ১২ই এপ্রিল ডায়ার সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ করার আদেশ দিলেন, কিন্তু হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে যা প্রকাশ, এই নিষেধাজ্ঞা শহরের সর্বত্র প্রচার করা হয়নি, হয় স্বেচ্ছাকৃতভাবে, না হয় ভুলক্রমে। আগে থেকেই ঘোষিত ছিল যে ১৩ই এপ্রিল বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। ডায়ার তা জানা সত্ত্বেও আগে থেকে তা বন্ধ করার কোন চেষ্টা করেন নি, এবং সভা অনুষ্ঠিত হবার মুহূর্তেও কোন বাধা

৮। Sraddhananda, *Young India*, II, 155.
৯। Sitaramayya, *op. cit.*, I, 164.
১০। *ibid.*, 163.
১১। Singh G N., *op. cit.*, 679.
১২। Horniman B. G, *Amritsar and Our Duty to India*, (1920), 89-92.

দেননি। কিছুক্ষণ সভা চলার পর ডায়ার তাঁর লোকজন নিয়ে সভাস্থলটি ঘিরে ফেলেন, এবং কোন রকম সংকেত বা সাবধানবাণী উচ্চারণ না করে, আচমকা নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেন। ৫০টি রাইফেল গর্জে ওঠে এবং গুলিবর্ষণ চলে পুরো দশ মিনিট যতক্ষণ না পর্যন্ত গুলি ফুরিয়ে যায়। নিহতের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি হয়েছিল, যদিও সরকারী হিসাবে তা ৩৭৯ জন, এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সরকারী হিসাবে ১২০০ জন। হাণ্টার কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদানকালে ডায়ার বলেছিলেন যে সমস্ত পাঞ্জাবকে ভীতসন্ত্রস্ত করাই ছিল এই গুলিবর্ষণের অভিপ্রায়।১৩ আহতদের ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, ঘটনার পর সান্ধ্য আইন জারি করে কোন লোককে ঘর থেকে বার হতে দেওয়া হয়নি। এরপরেই অমৃতসরসহ পাঞ্জাবের পাঁচটি জেলায় সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে শহরাঞ্চলে ইলেকট্রিক ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যত্রতত্র মানুষকে ধরে বেত্রাঘাত করা হয়, মার্শাল ল কমিশনের সামনে ২৯৮ জন লোককে হাজির করা হয় যাদের মধ্যে ৫১ জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। শুধু অমৃতসরেই নয়, সরকারী নিপীড়ন পাঞ্জাবের অপরাপর স্থানেও একই মাত্রায় প্রযুক্ত হয়েছিল। কসুরে ক্যাপ্টেন ডোভেটোনের নির্দেশে গ্রামের পর গ্রামে হামলা করা হয়, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও বেত্রাঘাত করা হয়, ১০৭ জন লোককে খাঁচায় পুরে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়। লায়ালপুরে ইউরোপীয়দের সামনে গাড়ীঘোড়া চড়া নিষিদ্ধ করা হয়, লাহোরে ছাত্রদের ধরে ধরে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে উনিশ মাইল পথ হাঁটানো হয়, সেখানে কর্ণেল ও'ব্রায়েনের নির্দেশে একটি ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তোলা হয়। গুজরাণওয়ালায় বোমা-বর্ষণ করা হয়।১৪

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ইংরাজদের অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা দেশ ঘৃণা, ক্রোধ, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্যার' খেতাব পরিত্যাগ করেন, এবং সেই উপলক্ষে ভাইসরয়কে যে চিঠি দেন তা একটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। গান্ধীর আচরণ এক্ষেত্রে একটু রহস্যময় ছিল, ১৩ই এপ্রিল ঘটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, তার মাত্র চারদিন পরে ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন, এবং ২১শে জুলাই তারিখে ওই আন্দোলন পাকাপাকিভাবেই প্রত্যাহার করে নেন। মদনমোহন মালব্য অক্লান্ত পরিশ্রমে পাঞ্জাবে বৃটিশ সরকারের

১৩। Chirol V., *India Old and New*, (1921), 177-78.
১৪। Horniman, *op. cit.*, 120 ff: Chintamani, *op. cit.*, 121-22.

সমুদয় কুকীর্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং ৯২টি প্রশ্নের আকারে সেগুলিকে রাজকীয় আইনপরিষদে পেশ করতে চান, কিন্তু ভাইসরয় তা না-মঞ্জুর করেন। ইতিমধ্যেই যাতে ওই নারকীয় কাণ্ডসমূহের নায়কেরা পার পেয়ে যায় তার জন্য ভাইসরয় ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সে যাই হোক জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত একটা তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, যার সভাপতি হয়েছিলেন হাণ্টার, এবং অপরাপর সদস্য ছিলেন র‍্যাঙ্কেন, রাইস, জর্জ বারো, টমাস স্মিথ, চিমনলাল শীতলবাদ, সুলতান আহমদ এবং জগত নারায়ণ। তদন্ত কমিশন কাজ শুরু করে ৩১শে অক্টোবর থেকে, কমিশন গঠন নিয়ে তার নিরপেক্ষ চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ খোদ ইংলণ্ডেই উঠেছিল। কংগ্রেস একটি পাল্টা তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল যাতে ছিলেন গান্ধী, জয়াকর, চিত্তরঞ্জন দাশ, ফজলুল হক এবং আব্বাস তায়েবজি। কংগ্রেস নিয়োজিত কমিশন প্রস্তাব দিয়েছিল হাণ্টার কমিশনের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করার, যাতে এক তরফের সাক্ষীকে অপর তরফ জেরা করার সুযোগ পায়, কিন্তু এই প্রস্তাব রক্ষিত হয়নি। ১৯২০র ২৬শে মার্চ কংগ্রেস নিয়োজিত কমিশন তাঁদের রিপোর্ট প্রদান করেন, যাতে ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণের দ্বারা সরকারী নীতিকেই সর্বতোভাবে দোষী করা হয়, এবং ও'ডোয়ার, ডায়ার, জনসন, ও'ব্রায়েন, বসওয়ার্থ স্মিথ, রাম সুদ এবং সাহিব খানকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়। পক্ষান্তরে সরকারী কমিশন, যাঁরা রিপোর্ট হাজির করেছিলেন ২৬শে মে তারিখে, দুটি মতে ভাগ হয়ে যান, ইউরোপীয় সদস্যগণ ইংরাজ কর্মচারীদের দোষ ঢেকে রিপোর্ট দেন, ভারতীয় সদস্যগণ পৃথক রিপোর্ট দাখিল করেন, বলাই বাহুল্য এই রিপোর্ট ইংরাজদের অনুকূল ছিল না। কতিপয় বিবেকবান ইংরাজ, যেমন মিঃ হাইণ্ডমান, পাঞ্জাবে বৃটিশ আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। স্থানীয় ইংরাজেরা জেনারেল ডায়ারের প্রশংসা করেছিলেন, ডায়ারের নামে একটি ফাণ্ডও তোলা হয়েছিল ভারতে এবং ইংলণ্ডে এবং তাঁকে সেই টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাঞ্জাবের বিষয়টিকে লঘুভাবে নিয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেভ্রের সন্ধি অনুযায়ী তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের প্রতি ইংরাজদের এই ব্যবহারে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবং তাদের দাবি ছিল যে তুরস্কের প্রতি বৃটিশ নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এবং তুরস্কের সুলতানকে তাঁর পূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। পরবর্তীকালে এই দাবিই খিলাফৎ আন্দোলনের

রূপ নিয়েছিল। মুসলমানদের এই দাবি গান্ধী সমর্থন করেছিলেন, এবং ভাইসরয়ের সঙ্গে লেখালেখি করে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, দুই ভাই মহম্মদ আলি ও সওকৎ আলিকে জেল থেকে মুক্ত করেন। গান্ধী খিলাফৎ সমস্যাকে হোমরুলের দাবির সঙ্গে একই পর্যায়ে টেনে এনেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এবং গান্ধী তার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলন তাঁদের দাবি না মেটা পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা করে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, এবং মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের পূর্বে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিলাভ খিলাফৎ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গান্ধীর বিশেষ স্নেহ ছিল, এবং তার সুযোগও তাঁরা প্রচুর নিয়েছিলেন।

১৯১৯-এর ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে। মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সংবিধান রচিত হয়েছিল। কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষ আইনসভা স্থাপিত হয়েছিল, এবং বাহ্যত এই দুটি আইনসভাকে সকল আইন প্রণয়নের অধিকারী হিসাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও, আসল চাবিকাঠিটি গভর্ণর-জেনারেলের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে আইন পাশের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও আইনসভার সিদ্ধান্ত গভর্ণরের সম্মতি সাপেক্ষ ছিল। গণতান্ত্রিক প্রশাসনের একটা কাঠামোর আড়ালে প্রদেশে গভর্ণর এবং কেন্দ্রে গভর্ণর-জেনারেলের উপরই সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছিল। মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী 'হস্তান্তরিত বিষয়গুলিই' তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল। এই নতুন ব্যবস্থাকে কোন তরফই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি। নরমপন্থী নেতারা অবশ্য, খুব প্রসন্ন না হলেও, ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁদের কলকাতা অধিবেশনে এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান। তিলক, যিনি অমৃতসর কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ইতিমধ্যেই যাত্রা করেছিলেন, এই ব্যবস্থাকে সমর্থনও করেন নি, বাতিলও করেন নি। তিনি জানিয়েছিলেন যে এই প্রসঙ্গে সরকারের সঙ্গে 'প্রত্যুত্তরমূলক সহযোগিতা' করা চলতে পারে, 'যেমন তোমরা করবে, তেমন আমরা করব।' ডিসেম্বরের কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে বলা হয়েছে যে এই নতুন ব্যবস্থা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে ভারতবাসীদের দ্বারা গঠিত

পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার দাবি করা হয়। কিন্তু সমস্যা ওঠে, এই নতুন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কর্তব্য কি হবে, কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কিনা। চিত্তরঞ্জন এর সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক না রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু গান্ধীর মত ছিল উল্টো, তিনি সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বিত হয়,১৫ যা কার্যত তিলকের 'প্রত্যুত্তরমূলক সহযোগিতার' অনুরূপ।

(১৯১৮র নভেম্বরে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজয় স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায় জার্মান সাহায্য ভারতে বিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টায় যে ইতি পড়ে যায় সেকথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি। ১৯১৮র গোড়ার দিকেই আমেরিকায় আগনেস স্মেডলী, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিনবিহারী বসু, তারকনাথ দাস, ভাই ভগবান প্রভৃতিরা গ্রেপ্তার হন এবং বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বার্লিন কমিটিও শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় এবং প্রবাসী বিপ্লবীরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। জার্মানীর পরাজয়ের পর ভারতীয় বিপ্লবীদের দৃষ্টি স্বাভাবিক-ভাবেই রুশিয়ার উপর পড়ে, এবং ১৯১৭র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীর বহু মুক্তিকামী দেশেরই বিপ্লবীদের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।) (কিন্তু রুশিয়ার মাটিতে সচেতনভাবে যে ভারতীয় বিপ্লবী প্রথম পদার্পণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়। ১৯১৯-এর নভেম্বরে মানবেন্দ্রনাথ রুশিয়া যাত্রা করেন, মস্কোয় অনুষ্ঠিতব্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য। তিনি মেকসিকোর প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর একটি স্বচ্ছ ধারণা ছিল এবং মেকসিকোয় তিনি একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি সোভিয়েট রুশিয়ায় সহজেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আগেও ১৯১৯ সালের মে মাসে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, এবং তাঁর দলে ছিলেন আবদুর রব পেশোয়ারী ও ত্রিমূল আচার্য।) ওই বছরেই জুন মাসে রহমত করিম এলাহি জাকারিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে যান। তিনি তুর্কীস্থান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলেন। ওবেদুল্লা সিন্ধি, যিনি কাবুলে মহেন্দ্রপ্রতাপ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন,

---

১৫। *Indian Annual Registar* (1920) I, 379, 384। অতঃপর *IAR* বলে উল্লিখিত হবে।

মস্কো গিয়েছিলেন অক্টোবর মাসে (১৯১৯) নিজের চোখে রুশ বিপ্লবের ফলাফল দেখার জন্য। সেখানে তিনি তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য কামনা করে-ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ বিতাড়নের কাজে। বরকতুল্লা রুশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে। বরকতুল্লার মতে ইংরাজরাই ছিল এশীয় ধনতন্ত্রের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি এবং তাদের শেষ করতে কমিউ-নিস্টদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। বরকতুল্লা আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে সোভিয়েট দেশে গিয়েছিলেন। (দলীপ সিং গিল নামক একজন পাঞ্জাবী বিপ্লবীও ১৯১৯ সালে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।)

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মনোভাব কি ছিল তার কিছু উল্লেখ এখানে করা দরকার। (সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করার পর দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট-ইণ্টারন্যাশনাল, সংক্ষেপে কমিণ্টার্ণ, নামক একটি সংস্থার সৃষ্টি করা হয়।) উক্ত কমিউনিস্ট-ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে একটি কলোনিয়াল কমিশন গঠিত হয় যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মত উপনিবেশবাদের শিকার দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামে কমিণ্টার্ণের ভূমিকা কি হবে তা নির্ণয় করা। (এই কলোনিয়াল কমিশনে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও লেনিন উভয়েই পৃথকভাবে দুটি থিসিস দাখিল করেন।[১৬] দুটি থিসিসের পার্থক্য ছিল উপনিবেশবাদের শিকার দেশগুলিতে জনসাধারণের কোন্ অংশকে কমিউ-নিস্টরা সাহায্য করবে তা নিয়ে। লেনিনের মতে ভারতের মত দেশে যেখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন চলছে, যেমন কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে, তাকেই সমর্থন করা উচিত, পক্ষান্তরে রায়ের থিসিসের প্রতিপাদ্য ছিল যে উপনিবেশগুলিতে কার্যত দুটি সংগ্রাম চলছে, একটি হচ্ছে বুর্জোয়া শক্তি পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যা পরিণামে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চায়, এবং অপরটি হচ্ছে সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দরিদ্র শ্রেণীর গণসংগ্রাম। এই দুটি সংগ্রামের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসানে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে, সেজন্য কমিণ্টার্ণের কর্তব্য শ্রমিক-কৃষকের পার্টিগুলির পিছনেই মদত দেওয়া, এবং কমিউ-

---

১৬। Lenin V. I., *Selected Works* (1947), II, 654-58; d'Encausse H. C. and Schram S. R., *Marxism and Asia* (1969), 149-167; North R. C. and Eudin X, *Soviet Russia and the East*, 65-67

নিস্ট পার্টির মাধ্যমে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় দীক্ষিত করা। দুটি থিসিসে গুরুত্বের কেন্দ্র বিভিন্নমুখী হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত দুটি ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের' পরিবর্তে পাকা দলিলে 'বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনসমূহ' কথাটি বসানো হয়।১৭ কিন্তু এতে বিভ্রান্তির অবকাশ ছিল যা পরবর্তী যুগের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে।)

১৯২০র ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের খিলাফতীরা ভাইসরয়ের কাছে একটি স্মারকলিপি দাখিল করে যাতে, গান্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি হিন্দু নেতারাও সই করেছিলেন। ভাইসরয় তাঁদের জানান যে তুরস্কের বিষয়ে তিনি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম।১৮ ঠিক তার আগের দিন ১৮ই জানুয়ারী তারিখে গান্ধী দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের একটি সভায় অসহযোগ আন্দোলনের একটি বিস্তৃত প্রোগ্রাম পেশ করেছিলেন। তিলক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই প্রোগ্রামে যদিও কোন আপত্তি জানান নি,১৯ তথাপি মনে হয় কংগ্রেসের নীতি হিসাবে অসহযোগকে মেনে নিতে তাঁর কিছু আপত্তি ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে তিলক সর্তসাপেক্ষে মণ্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন, এবং অমৃতসর কংগ্রেসের কিছু পরেই, যাতে আইনসভায় প্রবেশ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে 'কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠন করে তার তরফ থেকে ১৯২০র এপ্রিলে একটি ইস্তাহার জারি করেছিলেন।২০ আসলে অসহযোগ আন্দোলন কি রূপ পরিগ্রহ করবে তা তিলক বুঝে উঠতে পারেন নি। ৩০শে মে তারিখে বারাণসীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি খিলাফত প্রস্তাব অনুমোদন করলে তিলক তাতে আপত্তি জানান নি। আনসারী এবং চৈতরামকে তিনি জানিয়েছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে যা কিছু করবে তাতেই তাঁর সমর্থন আছে। গান্ধী এবং সওকত আলি বোম্বাই-এ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি অসহযোগের সাফল্য কামনা করে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। অ্যানি বেশান্তকে তিলক জানিয়েছিলেন যে গান্ধীর প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে।২১

১৭। Degras J., *The Communist International, Documents*, I, 138-44.
১৮। *IAR* (1921), 156.
১৯। Bapat S. V. (ed.), *Reminiscences of Tilak*, III, 142
২০। Sitaramayya, *op. cit.*, I, 193 ff.
২১। Bapat, *op. cit.*, I, 253.

কার্যত তিলকের শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং তিনি আর কিছুকাল মাত্র বেঁচেছিলেন।

১০ই মার্চ (১৯২০) তারিখে গান্ধী খিলাফতীদের উদ্দেশ্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। যদি সরকার তাঁদের দাবি না মানে তাহলে এই আন্দোলন করা হবে। এই ঘোষণাপত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যাত হয়।২২ ১৭ই মার্চ তারিখে খিলাফতীরা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়, কিন্তু লয়েড জর্জ তাঁদের হতাশ করেন। ফলে ১৯শে মার্চ মুসলমানরা একটি শোকদিবস পালন করে। ১৭ই এপ্রিল তারিখে খিলাফতীরা মাদ্রাজে একটি সম্মেলনে গান্ধী-পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। চারদফা এই কর্মসূচীর বিষয়বস্তু ছিল অবৈতনিক পদসমূহ, উপাধি ও কাউন্সিলের সদস্যপদ বর্জন, সরকারী চাকরী ত্যাগ, পুলিশ ও সামরিক বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং করদানে অস্বীকার। ১২ই মে তারিখে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির একটি জরুরী বৈঠক হয়, যাতে গান্ধী যোগদান করেন, এবং খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দু সমর্থনের পুরোপুরি আশ্বাস দেন। গান্ধী, চোতানি, মৌলানা আজাদ, আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং সিদ্দিক খাত্রেকে নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়।২৩

খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর অত্যুৎসাহ সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। গান্ধীর বক্তব্য ছিল যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বার্থেই তিনি এই আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন,২৪ কিন্তু এই আন্দোলন যে প্যান-ইসলামীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভূত, যার সঙ্গে ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই, সেটা গান্ধী উপলব্ধি করেন নি, তাঁর অনুগামীরাও নয়। যে কোন মূল্যে মুসলমানদের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসবার অতি আগ্রহে গান্ধী এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই মুসলিম নেতাদের হিন্দুদের প্রতি মনোভাবের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন নি। খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি মাদ্রাজের একটি জনসভায় বলেছিলেন, তিনি প্রথমে মুসলমান পরে অন্য কিছু, এবং আফগানিস্তানের আমীর যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং হিন্দুরা যদি সেটা সমর্থন না করে তাহলে তিনি হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন।২৫

২২। Sitaramayya, I, 191.
২৩। *IAR* (1921), I, 103.
২৪। De Bary (ed.) *Sources of Indian Tradition*, (1958), 770.
২৫। *IAR* (1922), 206-12; Nair Sankaran, *Gandhi and Anarchy* (1922), 38.

মোহম্মদ আলির এই বক্তব্যকে কংগ্রেস এড়িয়ে গিয়েছিল, এবং গান্ধী ওই বক্তব্যকে যুক্তিসহ করার চেষ্টা করেছিলেন।২৬ চিত্তরঞ্জন দাশ খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর অতি আগ্রহে আশংকিত হয়ে লজপত রায়কে চিঠি লিখেছিলেন,২৭ কিন্তু প্রতিবাদ জানান নি। যে দুজন ব্যক্তি প্যান-ইসলামবাদের নিকট গান্ধীর আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন স্যার শংকরণ নায়ার এবং ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর।

কিন্তু ঘটনাচক্র নিজের পথ নিজে কেটে চলে, এবং গান্ধীর সৌভাগ্যক্রমে বলা যায়, এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যেগুলির ফলে খিলাফতের জন্য নির্দিষ্ট অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। ১৫ই মে (১৯২০) তারিখে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধির শর্তাবলী প্রকাশিত হল, এবং বলাই বাহুল্য সেই সব শর্তাবলী ভারতীয় মুসলিমদের পক্ষে সুখকর হয়নি। ২৮শে মে তারিখে বোম্বাই শহরে খিলাফতীরা অতঃপর একটি বিরাট জনসভা আহবান করে। ওই একই দিনে প্রকাশিত হয়েছিল হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট যা জালিয়ানওয়ালাবাগসহ পাঞ্জাবের ঘটনাবলীকে লঘু করে দেখে সরকার পক্ষের ভূমিকাকেই প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছিল। ৩০শে মে তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বারাণসীতে একটি সম্মেলন আহবান করে হাণ্টার রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে, মাইকেল ওডোয়ার, জেনারেল ডায়ার প্রভৃতির শাস্তি দাবি করে, রাওলাট আইন প্রত্যাহার ও ভাইসরয়ের পদচ্যুতি দাবি করে।২৮ তুরস্কের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার দাবিও জানানো হয়।২৯ এখানে অবশ্য গান্ধীর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রস্তাব নেওয়া হয়নি, তা সেপ্টেম্বরের কলকাতা অধিবেশনের জন্য রাখা হয়েছিল। তিলক কংগ্রেস কমিটির এই বারাণসী সম্মেলনে যোগদান করেন নি। ২রা জুন তারিখে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে একটি হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসভা হয়, যাতে গান্ধী, মতিলাল নেহরু, লজপত রায়, তেজবাহাদুর সপ্রু, বিপিন পাল, মালব্য, সত্যমূর্তি, রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি যোগদান করেন। তার আগের দিন নেতাদের নিয়ে একটা ছোট বৈঠক হয়েছিল যেখানে অ্যানি বেশান্ত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সে যাই হোক ২রা জুনের সভায় আগস্ট মাস থেকে সর্ববিষয়ে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে

২৬। Ambedkar, B. R , *Pakistan,* (1946) , 72-73.
২৭। *ibid.*
২৮। *IAR* (1921) , I, 105 ff.
২৯। *ibid.,* 108.

অসহযোগিতার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।৩০ জওহরলাল নেহরু এই সভায় মুসলিম নেতাদের উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন, সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জনতার ভয়ে তাঁরা আন্দোলনের তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।৩১ বস্তুত জনসাধারণ রীতিমত রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, এবং তার প্রভাব যে কত তীব্র হয়েছিল তার প্রমাণ ১২ই জুন তারিখে নরমপন্থী নেতারা, যাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল লিবারেশন ফেডারেশন গঠন করেছিলেন, কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবসমূহের অনুরূপ প্রস্তাব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২রা জুনের সভায় খিলাফৎ কমিটি কর্তৃক একটি অসহযোগ কমিটি গঠিত হয়। শেষোক্ত কমিটি জুলাই মাসে একটি ইস্তাহার জারি করে ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।৩২ ১লা আগস্ট তারিখে ভারতব্যাপী একটি সর্বাত্মক হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, এবং ওই দিন গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত পদক ফেরত দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন।৩৩ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীর এই অসহযোগ আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল খিলাফৎ, পাঞ্জাবের ঘটনাবলী ইত্যাদি ছিল গান্ধীর নিকট গৌণ বিষয়। খিলাফতের দাবি নিঃসন্দেহে ছিল অযৌক্তিক, তার প্রবক্তারা ছিলেন সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, যে মনোভাব ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছিল, সেই মনোভাব অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ছিল সামঞ্জস্যহীন, এমনকি খোদ তুরস্কের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও তার কোন মিল ছিল না। তিলক যদি বেঁচে থাকতেন, এবং সক্রিয় থাকতেন তাহলে হয়ত পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়াত। ১লা আগস্ট তারিখেই তিলক মারা যান, এবং তাঁর শোকাবহ অনুপস্থিতির মধ্যেই ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসে গান্ধীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়নি। কলকাতায় গান্ধী তাঁর সমর্থন পাবার উদ্দেশ্যে অ্যানি বেশান্তের দল থেকে বেরিয়ে আসা হোমরুল লীগের সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।৩৪ লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগের কর্মসূচী

৩০। *ibid.*, 194 ff.
৩১। Nehru J., *Towards Freedom,* (1941), 52-53.
৩২। *IAR,* (1921), I, 116.
৩৩। *ibid.*, 206.
৩৪। Sitaramayya, I, 205.

পেশ করেন, এবং এই প্রস্তাবের মধ্যেই সর্বপ্রথম 'স্বরাজ্যের' দাবি উত্থিত হয়, যদিও এই স্বরাজ্যের কোন সংজ্ঞা তখনও দেওয়া হয় নি। অসহযোগের সাতদফা কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সরকারী খেতাব বর্জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকার মনোনীত সদস্য থাকা থেকে বিরতি, সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, ছাত্রছাত্রীদের সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগ, আইনজীবীদের আদালত বর্জন, কয়েকটি বিশেষ ধরনের চাকুরীর সুযোগ গ্রহণ না করা, আইনসভা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ না করা এবং বিদেশী পণ্য বর্জন। কিন্তু গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং আলি-ভ্রাতৃদ্বয়সহ সমগ্র মুসলিম ব্লকের সমর্থনপুষ্ট হলেও এই অসহযোগ কর্মসূচী বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধী জয়লাভ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে পড়েছিল ১৮৮৬টি ভোট, বিপক্ষে পড়েছিল ৮৮৪টি ভোট। কতদূর বিশ্বাস্য বলা শক্ত, কিন্তু আম্বেদকর লিখেছিলেন, বহু সংখ্যক প্রতিনিধি যাঁরা অসহযোগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, ছিলেন ভাড়া করা লোক।৩৫

(কলকাতা অধিবেশনে অসহযোগ-কর্মসূচী গৃহীত হলেও তা পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়েছিল ১৯২০র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নাগপুর কংগ্রেসে যার সভাপতিত্ব করেছিলেন বিজয়রাঘবাচারিয়া। এই উপলক্ষে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল এবং চোদ্দ হাজার ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন, অধিকাংশই মুসলমান, যে কারণে খলিকুজ্জমান এটিকে মুসলিম সম্মেলন বলেই অভিহিত করেছিলেন। আশা করা গিয়েছিল যে নাগপুর সম্মেলনে অসহযোগের বিষয় নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে গান্ধীবিরোধীদের শক্তির পরীক্ষা হবে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের রাতারাতি ডিগবাজি খেয়ে যাওয়াতে গান্ধীর বড় বাধা অপসৃত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন, যিনি গান্ধীর বিরুদ্ধে লড়বেন বলে তৈরী হয়ে এসেছিলেন, রাতারাতি তাঁর মত এক রহস্যময় কারণে বদলে ফেলেছিলেন তাঁর দল ও নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, যে কারণে বিপিন পাল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দাবি করেছিলেন।৩৬ সুভাষচন্দ্র বসু চিত্তরঞ্জনের মতবদলের একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন,৩৭ যা কারুরই সন্তোষ উৎপাদন করতে পারেনা। কিন্তু চিত্তরঞ্জন গান্ধীর পক্ষে এলেও, মালব্য, অ্যানি বেশান্ত, জিন্না ও বিপিন পাল সর্বপ্রকারে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধীর উদ্দেশ্যে জিন্না বলেছিলেন: "দেশের সামনে যে

৩৫। *Pakistan*, 141.

৩৬। দাশগুপ্ত, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, (1947), III, 37.

৩৭। *The Indian Struggle*, 1, 67.

নূতন জীবনের আবির্ভাব হয়েছে তাতে আমার অংশ গ্রহণের জন্য আপনার সদয় প্রস্তাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।)(কিন্তু 'নূতন জীবন' বলতে যদি আপনি আপনার পদ্ধতি ও কর্মসূচী বুঝে থাকেন, আমি আশংকার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি তা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ আমি নিশ্চিত যে এটা বিপর্যয়ের দিকেই আমাদের নিয়ে যাবে...আপনার নীতি ইতিমধ্যেই দেশের জনজীবনে ভেদ ও বিভ্রান্তি এনেছে, তা শুধু হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়, হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের, এমন কি পিতার সঙ্গে পুত্রের। জনসাধারণ সর্বত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং আপনার চরমপন্থী কর্মসূচী অনভিজ্ঞ তরুণদের, অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের কাছেই ক্ষণিক উন্মাদনার কারণ হয়েছে।"৩৮ তিলকের সহযোগী খাপার্দেও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এর মধ্যে রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টির কোন পরিচয় নেই।৩৯ এই সব আপত্তি সত্ত্বেও নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন, এবং লালা লজপত রায় তা সমর্থন করেন।)

খিলাফৎ আন্দোলনের পিছনকার প্যান-ইসলামীয় মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিছু সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান, বিশুদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্থানে পাড়ি দেয়। এই স্থানান্তরগমন হিজরত নামে পরিচিত। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে প্রায় ১৮,০০০ হিজরত-কারী আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু আফগান সরকার ভারতীয় হিজরতকারীদের (যাদের মুহাজির বলা হত) প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। এদের সঙ্গে আফগান বাহিনীর সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।৪০ শেষ পর্যন্ত অনেক ধনপ্রাণের ক্ষতি স্বীকার করার পর অধিকাংশই আবার ভারতে ফিরে আসে। হিজরতকারীদের ভিতর নানান ধরনের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে যাঁরা কাবুলে পোঁছাতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একদল কাবুল থেকে জবলুস সিরাজ নামক স্থানে হাজির হন। এটা ১৯২০ সালের মে মাসের ঘটনা। এঁদের মধ্যে অনেকেই খোদ তুরস্কে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন। জবলুস সিরাজ থেকে তাঁরা কয়েকটি যাত্রীদলে বিভক্ত হয়ে আমুদরিয়া অতিক্রম করে তিরমিজ নামক স্থানে উপস্থিত হন। তিরমিজ ছিল সোভিয়েট এলাকা (এখন

৩৮। Iswari Prasad, *Modern India,* 408.
৩৯। *ibid.*
৪০। Sitaramayya I, 199.

উজবেকিস্তান রিপাবলিকের অংশ), সেখান থেকে অধিকাংশই আনাতোলিয়ার দিকে যাত্রা করেন। সে যাত্রাপথে অনেক বাধাবিঘ্নের তাঁরা সম্মুখীন হলেন, অনেকে তুর্কমেন দস্যুদের হাতে নিগৃহীত হন, অনেকে মারাও যান। কিছু সংখ্যক মুহাজির সোভিয়েট দেশে যেতে চেয়েছিলেন, এবং সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে পেঁাছাতেও পেরেছিলেন। তিরমিজ থেকে তাঁরা প্রথমে আসেন কির্কিতে, কির্কি থেকে তাঁরা স্টীমারে করে যান চারজো নামক স্থানে। চারজো একটি রেলওয়ে জংশন। আনাতোলিয়ার যাত্রীরা সেখান থেকে তাঁদের অভিপ্রেত পথে যাত্রা করেন, অল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি ট্রেনযোগে তাসকন্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, তাসকন্দ যাত্রীদলের মধ্যে কেউ কেউ সোজা তাসকন্দেই গিয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ বোখারায় নেমে পরে ভিন্নপথে তাসকন্দে যান। (এটা ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। বোখারা এবং তাসকন্দ উভয় স্থানে কমিণ্টার্ণের তরফ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় মুহাজিরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের বোঝানো হয়েছিল যে কামাল পাশা খিলাফৎ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছেন না, তিনি লড়াই করছেন তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য। রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে মুহাজিরদের অধিকাংশই ছিলেন রীতিমত পশ্চাৎপদ। এঁদের মধ্যে যাঁরা একটু অগ্রগামী ছিলেন তাঁদের গোঁড়া খিলাফতী থেকে গোঁড়া কমিউনিস্টে পরিণত করতে কিন্তু বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, তার কারণ, মানবেন্দ্রনাথ রায় যা লিখেছেন, তাঁরা আদর্শানুরক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক শিক্ষালাভের ফলে মুহাজির তরুণদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে সেই প্রস্তাব তুলেছিলেন। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত (১৯২০ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ তাসকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।)

অসহযোগের দিনগুলি

মণ্টাগ্ন-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত ন্তন ভারত শাসন আইন চাল্ন হয়েছিল ১৯২১ সালের ৩রা জান্নয়ারী থেকে। এই উপলক্ষে সম্রাটের পিতৃব্য, রাণী ভিক্টোরিয়ার প্নত্র, ডিউক অফ কনট ভারতবর্ষে এসে-ছিলেন। কংগ্রেস তাঁকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ১০ই জান্নয়ারী তারিখে ডিউক মাদ্রাজে অবতরণ করার পর সেখানে হরতাল পালিত হয়, ডিউক-বিরোধী মিছিল নগরের পথপরিক্রমা করে। ডিউক কলকাতায় এসেছিলেন ২৮শে জান্নয়ারী তারিখে, দিল্লীতে ৮ই ফেব্রন্নয়ারী তারিখে এবং বোম্বাই-এ ২৩শে ফেব্রন্নয়ারী তারিখে। সর্বত্রই মাদ্রাজের দ্নশ্যের প্ননরাভিনয় হয়, ডিউক-বিরোধী হরতাল, মিছিল বিক্ষোভ ও জনসভা অন্নষ্ঠিত হয়। ডিউক অফ কনট অবশ্য অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই প্রতিক্নল পরিবেশের মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি ভাষণেই, অতীতে যা ঘটে গেছে তার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে, পারস্পরিক ক্ষমা-প্রার্থনা ও ভুলে যাবার নীতির ভিত্তিতে, নতুন করে ইঙ্গ-ভারতীয় সহ-যোগিতার স্নর ধ্বনিত হয়েছিল।

সরকারী স্কুল কলেজ বর্জনের যে নীতি নাগপ্নর কংগ্রেসে গ্নহীত হয়ে-ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১-এর ১২ই জান্নয়ারী তারিখে কলকাতায় ছাত্রদিবস প্রতিপালিত হয়। এরপর ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে স্কুল কলেজ বর্জন করে, শ্নধ্ন কলকাতায় নয় ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও একই দ্নশ্যের অভিনয় দেখা যায়। যদিও প্রচ্নর সংখ্যক ছাত্র শিক্ষায়তনসম্নহ বর্জন করেছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই বর্জন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, ফেব্রন্নয়ারীর মধ্যেই দেখা গিয়েছিল যে ছাত্ররা প্নরাতন স্কুল-কলেজগ্নলিতে ফিরে আসছে। অবশ্য কিছ্ন সংখ্যক ছাত্র আর ফিরে যায় নি, আর তাদের থেকেই বলতে গেলে রাজনৈতিক কর্মী গড়ে উঠেছিল। সরকারী খেতাব বর্জন ও সরকারী চাকুরী ত্যাগের কর্মস্নচী মোটেই সাড়া জাগাতে পারে নি, এবং আইনসভাসম্নহ বর্জনের আহ্বানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে-ছিল। কংগ্রেসের থেকে অবশ্য কেউ নির্বাচন প্রার্থী হননি, কিন্তু কোন আসনই শ্নন্য থাকেনি। আদালত বর্জন অপেক্ষাকৃতভাবে সাফল্য লাভ করেছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহর্নর দ্নষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হয়ে অনেক আইনজীবি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেছিলেন। মাদক বর্জনের কর্মস্নচী

প্রচণ্ড পিকেটিং-এর জোরে বহুলাংশে সফল হয়েছিল, কিন্তু সর্বদাই মদের দোকানগুলির সামনে পিকেটিং করা সম্ভব ছিল না, ওই কার্যে ভাঁটা পড়তেই দোকানগুলি আবার খরিদ্দারে পূর্ণ হতে শুরু করেছিল।

জানুয়ারী মাসে উত্তরপ্রদেশের রায় বেরিলী ও ফৈজাবাদে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহীদের পিছনে অসহযোগী কর্মীদের কিছু হাত ছিল। '২রা থেকে ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে বহু গ্রামে প্রচণ্ড রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছিল। ৫ই জানুয়ারী তারিখে একটি জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল ফুরসতগঞ্জ নামক স্থানে, এবং তার দুদিন পরে মুন্সীগঞ্জে একটি জনতা জেল ভাঙার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে তারা বাজার লুণ্ঠন করে এবং কয়েকটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে গোসাইগঞ্জে এক হাজার লোকের একটি জনতা রেললাইন অবরোধ করে। নেতারা প্রকাশ্যভাবেই হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।১

২৪শে মার্চ তারিখে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যেহেতু শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেওয়া, কাজেই সরকারও এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। গোড়ার দিকে সরকার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করলেও বেশি দিন তা বজায় রাখতে পারেনি। ওই মাসের ৩১শে তারিখে বেজওয়াদাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বৈঠকে স্থির হয় যে তিলক-মেমোরিয়াল-স্বরাজ্য-ফাণ্ডের জন্য এক কোটি টাকা তোলা হবে, এক কোটি সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করা হবে এবং বিশ লক্ষ চরকার প্রবর্তন করা হবে। প্রথমটি রীতিমত সাফল্যলাভ করেছিল, তিলক-ফাণ্ডের প্রস্তাবিত লক্ষ্যের চেয়ে পনের লক্ষ টাকা বেশি উঠেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় দুটিও প্রায় সাফল্যলাভ করেছিল, এক কোটি না হোক পঞ্চাশ লক্ষ সদস্য সংগৃহীত হয়েছিল, চরকার লক্ষ্যও প্রায় পূর্ণ হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি একান্ত অহিংস ছিল না, এবং অসহযোগীদের জবরদস্তিও বহু ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করেছিল। গিরিডিতে জনৈক ব্যক্তি অসহযোগীদের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করায় তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়, এবং জনৈক খিলাফৎ কর্মী তার কন্যার উপর অসম্মানজনক আচরণ করে। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে ৫০০০ লোকের একটি জনতা ২৫শে এপ্রিল তারিখে থানা আক্রমণ করে, শেষ

১। *IAR*, (1921), I, 156.

পর্যন্ত সেখানে সশস্ত্র বাহিনীকে তলব করতে হয়। ওই এপ্রিল মাসেই বোম্বাই-এর নাসিক জেলার অন্তর্গত মালেগাঁও নামক স্থানে কিছু সংখ্যক খিলাফতীকে পুলিশ অস্ত্রবহনের দায়ে গ্রেপ্তার করলে উত্তেজিত মুসলিম জনতা জনৈক সাব-ইনস্পেক্টর ও দুজন কনস্টেবলকে পিটিয়ে হত্যা করে, এবং তারপর শুরু করে ব্যাপক লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও হত্যা। ২৯শে এপ্রিল তারিখে আহমদনগর থেকে সৈন্যবাহিনী এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে।২

বস্তুত অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীর প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখেই হিংসার পথে অগ্রসর হয়েছিল, এবং এতে প্রকাশ্যভাবেই ইন্ধন জুগিয়েছিলেন গান্ধীর দুই বিশ্বস্ত কমরেড মহম্মদ আলি ও সওকত আলি। মে মাসের ১৩ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে ভাইসরয় লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে গান্ধীর কয়েকটি সাক্ষাৎকার ঘটেছিল যেখানে লর্ড রীডিং গান্ধীকে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনান যেখানে কুৎসিত ভাষায় সাম্প্রদায়িক সহ সব রকমই হিংসাশ্রয়ী আচরণে রীতিমত উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীর কর্তব্য ছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের ওইরূপ ভাষণের অংশ শোনার পর তাঁদের মতিগতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া এবং তাঁদের সঙ্গ পরিহার করা, কেননা যে ব্যক্তিরা প্রকাশ্যভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নারী ধর্ষণের উস্কানি দেয় তারা সমাজবিরোধী যাদের হাতে রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বনাশের পথে যাবে, কিন্তু গান্ধী বড়লাটকে ধরে কয়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি আদায় করে নিলেন, এবং সেই সঙ্গে বড়লাটও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে তাঁদের অপরাধ কবুল করিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক একটি পত্র লিখিয়ে তা পকেটস্থ করলেন। এই চিঠিই পরে গান্ধী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাল হয়েছিল, অসহযোগ-খিলাফৎ-আন্দোলনের নেতাদের চরিত্র-হননের পক্ষে চিঠিখানি সঙ্গতভাবেই পর্যাপ্ত ছিল। গান্ধী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মানমর্যাদা এই ঘটনার পর অনেকখানি নীচে নেমে গিয়েছিল।৩

১৯২১-এর মে মাসের আরও একটি বড় ঘটনা সুভাষচন্দ্র বসুর সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদান। ওই মাসের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে চাঁদপুরে কুলিদের উপর সরকারী হামলা। আসামের বিভিন্ন চাবাগান থেকে প্রায় ১২,০০০ স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক স্বদেশাভিমুখে পাড়ি দিয়েছিল।) যাত্রাপথে তারা 'গান্ধী মহারাজের' জয়ধ্বনি দিয়েছিল। চাঁদপুরে তদের আটক করা হয়, এবং তাদের উপর গোর্খা সৈন্যবাহিনী রীতিমত অত্যাচার করে। এই ঘটনায়

২। *ibid.*, (1922), 190-92.
৩। *ibid.*, 223 ff.

বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চার্লস এণ্ডরুজ, যিনি ওই ঘটনার প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলা যেতে পারে, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক এই অযৌক্তিক নিপীড়নের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। এই ঘটনার পিছনে ইউরোপীয় চাবাগান মালিকদের হাত ছিল। (চাঁদপুরের ঐ ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে সাধারণ ধর্মঘট ছাড়াও চিত্তরঞ্জন দাশ ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল রেল ও স্টীমার স্ট্রাইক চলেছিল, ২৪শে মে থেকে, যার ফলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগটিই কার্যত যোগাযোগবিহীন হয়ে পড়েছিল।) সরকারীভাবে চাঁদপুরের ঘটনার তদন্ত করেছিলেন শাসন পরিষদের সদস্য সার হেনরী হুইলার, যিনি সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারকে সমর্থন করেছিলেন। ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে বেসরকারী তদন্ত করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যাঁর মতে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল অযৌক্তিক এবং দুর্বুদ্ধিপ্রসূত।[৪]

২রা জুন তারিখে গুজরাটের ব্রোচ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত গুজরাট প্রাদেশিক খিলাফৎ সম্মেলনে মহম্মদ আলি যে কোন মূল্যে তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁদের ক্ষমাপ্রার্থনার ঘটনাটি বড়ই বেকায়দায় ফেলেছিল, এবং জনতার উত্তেজনাকে চাঙ্গা রাখবার জন্য তিনি ওই ক্ষমাপ্রার্থনার স্বপক্ষে অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা দিলেন, এবং গান্ধীকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করলেন পরোক্ষভাবে। ৮ই থেকে ১১ই জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনেও তিনি হিন্দু নেতাদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়লেন এবং প্রকাশ্যেই হিংসাত্মক ও সাম্প্রদায়িক কাজকর্মে উৎসাহ দিয়ে সমবেত উলেমাদের সমর্থন আদায় করলেন এবং নেতৃত্ব বজায় রাখলেন।[৫] খিলাফৎ সম্মেলন প্রস্তাব নিল যে সৈন্যবাহিনী থেকে প্রতিটি মুসলমানকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই প্রসঙ্গে আলি ভ্রাতৃদ্বয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন যার ফল তাঁদের পরে রীতিমতই ভোগ করতে হয়েছিল।

৫ই জুলাই তারিখে আলিগড়ে যখন মালকান সিং নামক জনৈক রাজনৈতিক কর্মীর বিচার চলছিল, একটি উত্তেজিত জনতা আদালত আক্রমণ করে এবং ট্রেজারীসহ কতকগুলি সরকারী গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। ২১শে জুলাই তারিখে সিন্ধুর হায়দরাবাদের অন্তর্গত মতিয়ারীতে উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়।[৬] এই রকম ঘটনা ভারতের নানাস্থানেই ঘটেছিল।

৪। *ibid.*, 755, 772.

৫। *ibid.*, 238.

৬। *ibid.*, (1922-23), 64-65, 803-06.

২৮শে জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার পরিকল্পনা নেয়, এবং তার ফলে যে ঘাটতি হবে তা খদ্দর দিয়ে পূর্ণ করার প্রস্তাব থাকে। এই পরিকল্পনা সফল হয়নি, কেননা পর্যাপ্ত খাদি উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়নি, পক্ষান্তরে বিদেশী কাপড়ের বহ্নুৎসব একটা জুলুমের আকারে দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের কাছে। ৩১শে জুলাই তারিখে বোম্বাই-এ নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে ঘটা করে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী কাপড় পোড়ানো হয়,৭ এবং ভারতের সর্বত্রই এই দৃশ্যের অভিনয় হয়। (এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন অর্ধনগ্ন, এবং অনেক কষ্ট করে নিছক লজ্জাটুকু আবরণের জন্য তাদের এই কাপড়গুলির অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়েছে, তখন এই স্বদেশীয়ানার জুলুম সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কার্যত তাই ঘটেছিল।)

১৯২১-এর আগস্ট মাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা মালাবার অঞ্চলের মোপলা বিদ্রোহ। মোপলারা ছিল ধর্মান্ধ মুসলমান যারা খিলাফৎ আন্দোলন ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিল। ২০শে আগস্ট তারিখে কালিকটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মারাত্মক ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভিযোগে যখন তাদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করেন, তখনই মোপলা-বিদ্রোহ শুরু হয়, এবং সেই বিদ্রোহ কয়েক মাস স্থায়ী হয়। মোপলারা আলি মনসুরের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তারপর থেকেই তাদের উন্মত্ততার বলি হয় হিন্দুরা। ব্যাপকভাবে হিন্দুহত্যা, সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নারী[illegible] চলে। খিলাফতী নেতারা তাদের অভিনন্দিত করেন, এবং গান্ধী বলেন যে "বীর ঈশ্বর বিশ্বাসী মোপলারা তাদের ধর্মীয় আদর্শ অনুযায়ী যা ন্যায়সঙ্গত মনে করছে তার জন্য সংগ্রাম করছে।" কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকেও এই আন্দোলন নৈতিক সমর্থন লাভ করেছিল। নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার দিক থেকে, মোপলা বিদ্রোহীরা যে আচরণ করেছিল, তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত নায়ক ডায়ারের লজ্জা পাবার কিছুই ছিল না। পাইকারীভাবে তারা হিন্দু নরনারী ও শিশুদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল, ধর্মস্থানসমূহ অপবিত্র করেছিল,

৭। *ibid.*, (1922), 250.

গর্ভবতী নারীদের হত্যা করেছিল পেট চিরে দিয়ে, এছাড়া লুণ্ঠন ও ধর্ষণ তো ছিলই। সরকারী রিপোর্টেই এই সব ঘটনাকে স্বীকার করা হয়েছে। গান্ধী ও কংগ্রেস নেতারা উটের মত বালিতে মুখ গুঁজে কিছু দেখতে চান নি, এবং কোন যুক্তি দিয়েই মোপলা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁদের মনোভাব সমর্থন করা যায় না।৮ দুর্ভাগ্যক্রমে গান্ধী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রক্ষার তাগিদে মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে এসেছিলেন যে অংশটি ছিল সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মোন্মাদ, এবং এই উৎকট চরমপন্থীদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাদের দুষ্কার্যসমূহকেও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করেছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যকে গান্ধী বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না, কারণ সে ঐতিহ্য সমালোচনামুখী, যে কারণে জিন্নাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ই তাঁর আপনজন হয়েছিলেন।

ভারতের বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর একটা বড় অংশ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি, অনুরূপভাবে গান্ধীর অহিংসাবাদও বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি, এবং তাঁরা খোলাখুলিভাবেই তাঁদের আচরিত পথের যুক্তিযুক্ততার কথা বলছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছেই অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুনরারম্ভ করার কথা তাঁরা ভাবছিলেন। (চিত্তরঞ্জন দাশ এঁদের কংগ্রেসে পেতে চাইলেন, এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীর সঙ্গে বিপ্লবী নেতাদের একটি সাক্ষাৎকার হয়। গান্ধী এবং দাশ উভয়েই বিপ্লবীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে অসহযোগ আন্দোলন জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা এনেছে, কাজেই সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে তাঁরা যেন কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করেন। অনেক বিতর্কের পর বিপ্লবীরা এতে রাজী হন।৯)

সেপ্টেম্বর মাসে আলি ভ্রাতৃদ্বয়সহ আরও চারজন মুসলমান নেতা গ্রেপ্তার হন, এবং ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁদের প্রত্যেকের দুবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের সংবাদে ঝিমিয়ে পড়া অসহযোগ আন্দোলন কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এবং ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তরপ্রদেশের বহু স্থানে অনেকগুলি জনসভা হয়। মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াবার যে

৮। Nair S., *Gandhi and Anarchy,* (1922) App. III, V.

৯। Bose, *The Indian Struggle* II, 89-90। অতঃপর গ্রন্থটি শুধু Bose নামেই উল্লিখিত হবে।

অভিযোগে আলি ভ্রাতৃদ্বয় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সেই খিলাফতের করাচী অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিটি লাইন সমর্থন করে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে গান্ধী এবং ৪৬ জন অসহযোগী নেতা একটি ইস্তাহার জারি করেন। পরদিন ৫ই অক্টোবর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে ওই একই প্রস্তাব গৃহীত হয়।১০ ওই অধিবেশনেই বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করা হয়, এবং মোপলা বর্বরতার দায়িত্ব দুষ্কৃতকারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই যথারীতি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্লোগান দেওয়া হয়।

২০শে অক্টোবর তারিখে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৭ জন সহকারী সহ গ্রেপ্তার হন। পুলিশ যখন তাঁদের স্টেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, একটি বিশাল জনতা শোভাযাত্রা করে তাঁদের অনুগামী হয়। জনতা স্টেশনে হাজির হলে, অকস্মাৎ একটি গুর্খাবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যার ফলে শতাধিক লোক আহত হয়।১১

১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত সফরে আসেন এবং ওইদিন তিনি বোম্বাই-এ অবতরণ করেন। এই সফরের মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, অন্তত সরকারীভাবে সেই কথাই বলা হয়েছিল। যুবরাজকে বয়কট করার প্রস্তাব কংগ্রেস পূর্বেই নিয়েছিল, এবং সেই হিসাবে ওইদিন ভারতবর্ষের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। এক বোম্বাই ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্রই শান্তিপূর্ণ এবং সর্বাত্মক সফল হরতাল হয়েছিল।১২ কলকাতার সাফল্য ছিল দেখবার মত।১৩ কিন্তু বোম্বাই-এ এই হরতাল উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যায়। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ও পার্শীদের একাংশ রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখতে গিয়েছিল। তাদের উপর প্রচণ্ড রকম হামলা করা হয়, এবং তারই ফলে পার্শী ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা দলবদ্ধভাবে প্রতিশোধ নেয়। দাঙ্গা থামাবার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করতে হয়। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এই ঘটনায় ৫৩ জন মারা গিয়েছিল এবং ৪০০ লোক আহত হয়েছিল।১৪ এই হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধী অনশন করেন। ২৩শে নভেম্বর তারিখ থেকে বারদোলিতে যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়।

১৭ই নভেম্বরের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতীদের

১০। Sitaramayya, I, 217-18.
১১। *IAR,* (1922 23), 793.
১২। *ibid*, (1922), 307.
১৩। Pradhan R G, *India's Struggle for Swaraj*, (1930) 183
১৪। *IAR* (1922), 377, 384.

কাজকর্মকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে। বাংলার গভর্ণর রোনালডসে কলকাতা ও গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে তিন মাসের জন্য জনসভা ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।১৫ নভেম্বরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়.এবং চিত্তরঞ্জন দাশের উপর এ বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়। চিত্তরঞ্জন পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে গঠিত এক একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করার জন্য পাঠান কিন্তু জনচিত্তে তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। দ্বিতীয় দফায় তিনি নিজ পুত্র চিররঞ্জনকে পাঠান, এবং তৃতীয় দফায় পাঠান সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীকে। এইবার ম্যাজিকের মত কাজ হয়, বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশ মুখর হয়ে ওঠে, এবং দলে দলে মানুষ আইন অমান্য করে জেলে যাবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখায়। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের জেলগুলি পূর্ণ হয়ে যায়।১৬

যুবরাজের কলকাতা আগমনের দিন ধার্য হয়েছিল ২৪শে ডিসেম্বর। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলকাতায় অশান্তি হওয়াটা লর্ড রোনালডসে বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি, তাই তিনি চিত্তরঞ্জনকে প্রস্তাব দিলেন যে সরকার তার দমনমূলক নীতি প্রত্যাহার করবে যদি কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট করার মতলব ত্যাগ করে। চিত্তরঞ্জন জানালেন এটা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ব্যাপার, তিনি একতরফা কিছু করতে অক্ষম। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন, এবং তাঁর সঙ্গে বাংলার অপরাপর প্রভাবশালী নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাপর প্রদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। মতিলাল নেহরু ও লজপত রায়কেও জেলে পোরা হল, এবং এই সকল কার্যের ফলে জনসাধারণের বৃটিশবিরোধী উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। নেতাদের দেখাদেখি দলে দলে লোক আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করতে লাগল।

চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তারের দিনেই আইনসভার সদস্য রেজা আলি ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে সরকারী নীতি উত্তেজনা দমন করার পরিবর্তে নতুন করে উত্তেজনা ডেকে আনছে। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর লিবারেল লীগ ওই একই আশংকা জানিয়ে বড়লাটকে টেলিগ্রাম করেন। একই ধরনের টেলিগ্রাম যায় মাদ্রাজ লিবারেল লীগের তরফ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে, ন্যাশনাল লিবারেল লীগ এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান

১৫। Bose, II, 94 ff.
১৬। *Ibid.*, 97-98.

অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সরকারী নীতির সমালোচনা করে দেখান যে পুলিশ এবং মিলিটারীর তাণ্ডবে জনমনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নরমপন্থী নেতাদের, যাঁরা শাসকশ্রেণীর মোটামুটি অনুগামী ছিলেন, এই প্রতিক্রিয়ার ফল হয়, এবং বিষয়টির গুরুত্ব বড়লাট লর্ড রীডিং বুঝতে পারেন। যুবরাজের আগমনের এক সপ্তাহ আগে তিনি কলকাতায় আসেন এবং একথা জেনে মর্মাহত হন যে তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত ভোজসভা কলকাতার বার অ্যাসোসিয়েশন চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্জন করেছে। ফলে লর্ড রীডিং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইলেন। মধ্যস্থ হিসাবে মদনমোহন মালব্য ও আবুল কালাম আজাদ চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করলেন। মালব্য জানালেন যে যদি কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে এবং যুবরাজের পরিদর্শন বয়কট না করে তা হলে সরকার তার দমননীতি প্রত্যাহার করবে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকে বসবে। চিত্তরঞ্জনকে এটাও বোঝানো হল যে গান্ধী এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা পূর্ণ হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, এবং এতে জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের ইমেজও বজায় থাকবে না। ৩১শে ডিসেম্বরের আগে একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারলে জনগণকে এটা বোঝানো যাবে যে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই বৃটিশ সরকার ভয় পেয়ে বৈঠক ডেকেছে, এবং এর দ্বারা জনমনে অসহযোগ আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততাও প্রমাণ করা যাবে, গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতাদের মানমর্যাদাও বজায় থাকবে। বিষয়টি চিত্তরঞ্জনের নিকট ঈশ্বর প্রেরিতের মতই এসেছিল, এবং এই প্রস্তাবটি সত্যই ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যাতে সবদিকই রক্ষা পেত। গান্ধীকে বিষয়টি বোঝানো হল, কলকাতা থেকে সবরমতীতে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম গেল, কিন্তু গান্ধী গোঁ ধরে বসলেন যে, সমস্ত কিছুর আগে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া হোক, তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে। এই রকম একটি সুযোগ গোঁয়ার্তুমির জন্য নষ্ট হওয়ায় চিত্তরঞ্জন হতাশায় ভেঙে পড়লেন।১৭ পরে গান্ধী ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে।

সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল।

১৭। *ibid.*, 99-101.

৪০,০০০ কংগ্রেস কর্মী তখন জেলে, কাজেই মাত্র ৪,৭২৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন জেলে থাকার দরুণ হাকিম আজমল খান সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়, এবং আঠারো বছরের উপরের ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের জন্য এবং আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই অধিবেশন কার্যত ছিল গান্ধীরই একচেটিয়া অধিকারে, কেননা অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা তখন কারাগারে। এই সুযোগে তাঁর উপর সর্বময় ক্ষমতা অর্পণের একটি প্রস্তাব তিনি পাশ করিয়ে নেন। মৌলানা হসরৎ মোহানী এই অধিবেশনে প্রস্তাব এনেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রস্তাবটি অনেকেরই সমর্থন পেয়েছিল, কিন্তু গান্ধী তা সরাসরি নাকচ করে দেন।

এবারে আমরা একটু অন্যদিকে দেখবার অবসর নেব। আমরা আগেই দেখেছি যে (১৯২০ সালের শেষের দিকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টায় তাসকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২১ সালেই কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মস্কোতে 'প্রাচ্যের মেহনতী জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। সতেরজন মুহাজির যুবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৯২১ সালেই শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ প্রভৃতিরা প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।১৮)

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরই বার্লিন কমিটি খতম হয়ে গিয়েছিল। বার্লিন কমিটির ভারতীয় সদস্যরা অতঃপর মস্কোর দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলেন। ১৯২১ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও কয়েকজন নির্বাসিত ভারতবাসী জার্মানী থেকে মস্কো যাত্রা করেছিলেন। এঁদের নেতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তার আগে তাঁরা কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য(১৯২০ সালে স্টকহলমে একটি সম্মেলন ডেকেছিলেন। এই সম্মেলনে পাণ্ডুরং খানখোজে, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডেনমার্ক থেকে বিশ্বামিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। এখানে স্থির হয়েছিল যে যাঁরা জাতীয়তাবাদী থাকতে চান তাঁরা একটি দল গঠন করে কাজ করে.

১৮। Overstreet and Windmiller, *Communism in India* (1966), দ্রষ্টব্য।

যাবেন, এবং যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করবেন তাঁরা পৃথক সংস্থা তৈরী করবেন, কিন্তু দুপক্ষই কাজ করবেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য। এর আগে মানবেন্দ্রনাথ রায় চট্টোপাধ্যায়কে মস্কোতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মস্কোয় চট্টোপাধ্যায়রা এই বক্তব্য রাখেন যে ভারতবর্ষে কৃষক-শ্রমিক বিপ্লব সম্ভব নয়, কেবল ইংরাজবিরোধী জাতীয় আন্দোলনই চলতে পারে, এবং সেইজন্য কমিণ্টার্ণের কর্তব্য একটি বৈপ্লবিক কমিটি স্থাপন। তাঁদের জানানো হয় যে ইতিপূর্বেই একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে, তাঁরা সেই পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা সেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন নি।১৯)

(বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। ১৯২১-এ সাপুরজি সকলতওয়ালা নামক জনৈক ভারতীয়, যিনি টাটা কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার ছিলেন, ওই পার্টিতে যোগদান করেছিলেন, নিজের শ্রেণীর বাইরে গিয়ে। পরে সকলতওয়ালা বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছিলেন।২০)

চিত্তরঞ্জনের মারফৎ গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের একটা সমঝোতার যে চেষ্টা মালব্য প্রমুখ নেতারা করেছিলেন, তাঁরা সেই আশা তখনও ত্যাগ করেন নি। বিভিন্ন মতের প্রায় ৩০০ জন নেতা, যাঁরা অসহযোগ আন্দোলন চলাটা পছন্দ করছিলেন না, ১৯২২ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইতে মিলিত হন, এবং সরকারের সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন, এবং তার ফলাফল জানিয়ে ভাইসরয়কে চিঠি লেখেন। এদিকে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধী বড়লাটকে একটি চরমপত্র দিয়ে জানান যে সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করছেন। গান্ধীর দাবি ছিল, সমস্ত রকম সরকারী দমননীতি তুলে নিতে হবে, মিছিল, জনসভা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে, সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, এবং সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে পরিচালিত অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের উপর থেকে সরকারী হাত ওঠাতে হবে। সাতদিনের মধ্যে তা না হলে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে।২১ গান্ধীর এই চিঠি সরকারকে যেমন একদিকে চঞ্চল করে তুলেছিল, জনসাধারণের মধ্যে তা অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল। এটা ছিল কার্যত ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে

১৯। দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস।
২০। Saha P., *Sapurji Saklatwala*, (1971).
২১। Sitaramayya, 1, 233-35.

যুদ্ধ ঘোষণা। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীকে অভিনন্দিত করেছিল, এবং গান্ধীর আহ্বানে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে জয় নিশ্চিত। ভারতবর্ষে এরকম চাঞ্চল্য আর দেখা যায় নি।

কিন্তু যে যুদ্ধ ঘোষণা এত বীরদর্পে করা হয়েছিল, যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাদের নেতার আদর্শে আত্মদানের সংকল্প নিয়েছিল, তারা ভুলেও ভাবতে পারেনি যে যুদ্ধারম্ভের আগেই আত্মসমর্পণ করা হবে। গান্ধী জনগণের ইচ্ছার চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন, এবং সেই ঈশ্বরেচ্ছার প্রকাশ ঘটল উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরিচেরা নামক একটি গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার পর, যার ফলে গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে সকল প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটালেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। চৌরিচেরায় একটি মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে তাদের গুলি ফুরিয়ে গেলে তারা একটি গৃহে আশ্রয় নেয়। উত্তেজিত জনতা গৃহটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, এবং আগুনের ভয়ে পুলিশেরা যখন একে একে বেরিয়ে আসছিল তখন তাদের হত্যা করে ওই আগুনেই নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে, আন্দোলন হিংসার পথ ধরছে এই আশংকায়, গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধীর সঙ্গে মালব্য, জয়াকর, নটরাজন ও জিন্না, যাঁরা সরকারের সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকের চেষ্টা করছিলেন, গান্ধীকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন, এবং গান্ধী তাঁদের সেই অনুরোধ রাখেন। ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বরদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং সিদ্ধান্ত পাকা হয় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদ ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। তাঁর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা বোধ হয় গান্ধী নিজেও ভেবে দেখেন নি। সারা দেশে দেখা যায় ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভ। গান্ধী প্রকৃতই গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছিলেন। গান্ধীভক্ত লুই ফিশার লিখেছিলেন : গান্ধীর একটি কথাতেই ভারতবর্ষ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারত। সেই কথাটি বলা হল না, আর তার পরিবর্তে সমস্ত আগ্রহ ও আত্মদানের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দেওয়া হল, বা বলি দেওয়া হল অহিংসা মতবাদের যুপকাষ্ঠে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন এই ঘটনার পর কার্যত গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, গান্ধীর সহকর্মীরা—চিত্তরঞ্জন দাশ,

মতিলাল নেহরু, লজপত রায় প্রভৃতি দুঃখে, ক্রোধে, ক্ষোভে ও হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। (লালা লজপত রায় গান্ধীর এই কাজের নিন্দা করে তাঁকে জেল থেকে ৭০ পাতার একটি চিঠি দিয়েছিলেন।২২ এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে সুদূর ফ্রান্স থেকে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছিলেন একটি ব্যক্তির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হলে তার যে কতখানি অমর্যাদা হতে পারে এই ঘটনাই তার প্রমাণ।২৩) বস্তুত অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই তো তার সঙ্গে হিংসা জড়িয়েছিল, মোপলা বিদ্রোহের মত ব্যাপকতম হিংসাকেও গান্ধী বরদাস্ত করেছিলেন, চৌরিচেরার ঘটনা সেগুলির তুলনায় এমন কি ভয়ানক ছিল? মতিলাল নেহরু খলিকুজ্জামানকে বলেছিলেন, একটা বিরাট দেশে অহিংস আন্দোলন চালাতে দু-একটা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবেই, বরং না ঘটাটাই অসম্ভব, এটা বুঝতে পারার মত কি স্বাভাবিক বুদ্ধি গান্ধীর ছিল না?

গান্ধীকে বৃটিশ সরকার দীর্ঘকাল ধরেই গ্রেপ্তার করার তালে ছিল, কিন্তু তা করছিল না এই কারণে যে তা করতে গেলে দেশে এমন বিক্ষোভ জাগবে যা আয়ত্তে আনা মুস্কিল। এখন গান্ধীর জনপ্রিয়তাহানির সুযোগে ১০ই মার্চ তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ১৮ই মার্চ তারিখে তাঁর বিচার হল। গান্ধী দোষ স্বীকার করলেন এবং সেই সঙ্গে একটি বিবৃতি দিলেন, কেন এবং কিভাবে তাঁর মত একজন রাজভক্ত এবং বৃটিশের সঙ্গে সহযোগী মানুষ সরকার বিরোধিতা ও অসহযোগ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বিচারে গান্ধীর ছয় বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায়।

গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর ১৯২২-এর ৭ই থেকে ৯ই জুন লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বৈঠক বসে। যদিও নেতাদের অনেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, তখনও পর্যন্ত ইংরাজ সরকারের দমননীতি অব্যাহত ছিল. কাজেই তার প্রতিকারার্থে আর একটি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা যায় কিনা সেজন্য মতিলাল নেহরু, রাজাগোপালাচারী, এম. এ. আনসারী, ভি. জে. প্যাটেল এবং কস্তুরিরঙ্গ আয়েঙ্গারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় যা 'আইন অমান্য অনুসন্ধান কমিটি' নামে পরিচিত। এই কমিটির পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান ছিলেন হাকিম আজমল খান, যিনি কংগ্রেস সভাপতিরূপে কাজ চালাচ্ছিলেন। এই কমিটি বহু স্থান পরিদর্শন করে এবং বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্তে আসেন যে বর্তমান অবস্থায় বৃহদাকার কোন আইন অমান্য আন্দোলন সম্ভব নয়। তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন ১৯২২-এর অক্টোবরে।

২২। Bose, II, 108.
২৩। Pradhan, *op. cit*, 196.

এদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার নীতি থেকে সরে আসার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। অনেকেই মনে করছিলেন আইনসভা বর্জন করার যে নীতি পূর্বে কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল, নতুন পরিস্থিতিতে সেই নীতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, আইনসভায় ঢুকেই সরকারের বিরোধিতা নব উদ্যমে করা যেতে পারে, বিশেষ করে যখন নতুন করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার অবস্থা তখন নয়। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তাঁরা থাকাকালীনই চিত্তরঞ্জনের মাথায় এই পরিকল্পনা আসে। জেলে তাঁদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা হত এবং সেখানেই দুটো মত দেখা গিয়েছিল, একদল সম্পূর্ণ অসহযোগিতার পক্ষপাতী, অপরদল কাউন্সিলে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। পরবর্তীকালের ভাগাভাগির সূত্রপাত এখানেই। ১৯২২-এর মে মাসে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী হিসাবে চিত্তরঞ্জন-পত্নী বাসন্তী দাশ যে ভাষণ দেন তাতে আইনসভায় অংশ গ্রহণের পক্ষেই তিনি মৃদুভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন। বলাই বাহুল্য এটা চিত্তরঞ্জনের ভাবনার ফল।২৪ অক্টোবরে 'আইন অমান্য অনুসন্ধান কমিটির' রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরই আইনসভায় অংশ গ্রহণের পক্ষে একটি অভিমত বেশ দানা বেধে ওঠে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে। নভেম্বরের ২০-২৪ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এই নিয়ে কথা ওঠে এবং তা ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস অধিবেশনে আলোচনার জন্য রাখা হয়।২৫

২৬শে ডিসেম্বর (১৯২২), গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখেন। সাবজেক্টস কমিটিতে এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলে, যার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ হয়ে যায়। যাঁরা কাউন্সিল বয়কটের পক্ষপাতী তাঁরা অপরিবর্তনকামী (নো-চেঞ্জার)রূপে চিহ্নিত হন, এবং এই অধিবেশনে তাঁদেরই জয়লাভ হয়। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন প্রমুখেরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হন। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়। পরদিন, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে চিত্তরঞ্জন তাঁর কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে, যেহেতু কংগ্রেসের মধ্যে দুটি চিন্তাধারা দেখা গেছে, এবং যেহেতু তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি

২৪। Bose, II, 115-17.
২৫। Sitaramayya I, 249.

মনের সঙ্গে মানতে পারছেন না, তাঁর পক্ষে সভাপতিত্ব ত্যাগ করাই শ্রেয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করছেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আইনসভায় প্রবেশকামী কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই 'কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টি' নামক একটি দল গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন এই দলের নেতা নির্বাচিত হন, এবং মতিলাল নেহরুসহ তিনজন সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এই দলের ১০০ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার জারি করা হয়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন হাকিম আজমল খান, ভি. জে. প্যাটেল, কেলকার, সত্যমূর্তি, জয়াকর প্রভৃতি। এরপর এই দল একটি বিরাট প্রচার অভিযানে নামে, উত্তর ভারতে মতিলাল নেহরু, বোম্বাই-এ ভি. জে. প্যাটেল এবং বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে চিত্তরঞ্জন প্রচারাভিযানের দায়িত্ব নেন।

১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারীতে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। যে সব মুহাজির তরুণ খিলাফৎ লড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট দেশে গিয়েছিলেন এবং প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রফীক আহমদ প্রমুখ কয়েকজন প্রত্যাবর্তনের পথে ধৃত হন, এবং দু-একজন ছাড়া কারো কারো দু বছর এবং কারো কারো এক বছর কারাদণ্ড হয়ে যায়। মে মাসে এই মামলার রায় বেরোয়। এইটি ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা, এবং সেই হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশ সরকার যে সমস্ত কিছুরই খোঁজখবর রাখত এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সদ্যোবিভক্ত দুটি শাখার মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। ওই মাসেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার অকংগ্রেসী সদস্যগণ ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে একটি সংবিধানের কাঠামো রচনা করেন। নতুন 'কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টির' নেতারা ব্যাপক প্রচারাভিযানের পর মার্চ মাসে এলাহাবাদে একটি বৈঠকে মিলিত হন, এবং নিজেদের দলের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এরপর চিত্তরঞ্জন মাদ্রাজে গমন করেন এবং সেখানে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের নূতন দলের আদর্শ প্রচার করেন। এদিকে আবুল কালাম আজাদ উভয় তরফের মধ্যে যে সমঝোতার চেষ্টা করছিলেন তার ফলে ৩০শে এপ্রিল তারিখে স্থির হয় যে একটা পাকাপাকি ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দু তরফ কতকগুলি বিশেষ আচরণবিধি মেনে চলবেন।

১৯২৩-এর মে মাসে কলকাতায় একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল খিলাফৎ ইস্যু খতম হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কেও চিড় ধরেছিল। ওই মাসেই বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (যাতে রক্ষণশীলেরাই ছিলেন) কৌশলে আইনসভা বয়কটের প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। কিন্তু এর ফলে গণ্ডোগোল বাঁধে এবং ওয়ার্কিং কমিটির নতুন সদস্যেরা যাঁরা তখনও পাকাপাকিভাবে কোন গ্রুপে যোগদান করেন নি, এবং দুটি গ্রুপের মধ্যে মিলন কামনা করতেন, অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস অধিবেশনে পেশ করা হবে।

এই বিশেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনটি বসেছিল দিল্লীতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আবুল কালাম আজাদ যিনি আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু এই অধিবেশনে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন গান্ধীর প্রিয় বন্ধু মোহম্মদ আলি যিনি ২৯শে আগস্ট তারিখে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। অধিবেশনে যোগদান করেই সুচতুর মোহম্মদ আলি বুঝতে পেরেছিলেন যে হাওয়া চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের অনুকূলে বইছে। ফলে তিনি একটি ধাপ্পা দিলেন যে য়ারাবদা জেল থেকে তিনি গান্ধীর বার্তা পেয়েছেন যাতে গান্ধী আইনসভা বর্জনের বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি তুলে নিয়েছেন। এই ঘোষণায় রীতিমত চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ফলে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, যদিও কংগ্রেস মনেপ্রাণে অসহযোগ নীতিতে অবিচল, তথাপি আইনসভায় অংশ গ্রহণের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান কোন ধর্মীয় গোঁড়ামির মত মনোভাব গ্রহণ করবে না। কিন্তু মোহম্মদ আলি গান্ধীর মত বলে যা রটিয়েছিলেন তা যে আসলে গান্ধীর মত ছিল না, এটা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ফাঁস করে দেন, কেননা তিনি নিজেই এই বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, এবং মোহম্মদ আলিকে এই বিষয়ে চেপে ধরা হলে তিনি যা বলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা শুনে গান্ধী তাঁর পুত্র দেবদাসকে বলেছিলেন যে, এই সকল বিষয়ে মোহম্মদ আলি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। মোহম্মদ আলি আসলে সেই সুযোগে নিজের মতকে গান্ধীর মত বলে চালিয়েছিলেন।

অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন চলাকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে উন্নতি ঘটেছিল, ১৯২৩ সাল থেকে তার অবনতি দেখা দিয়েছিল। ১৯২৩ সালেই ভারতের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিয়েছিল। মুসলমানেরা তানজিম ও তাবলিখ নামক সাম্প্রদায়িক আন্দোলন শুরু করেছিল, আবার হিন্দুরাও সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন মারফৎ মুসলমানদের

হিন্দু করার চেষ্টা করেছিল। হিন্দু মহাসভারও সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়। আগস্ট মাসে মালব্যের সভাপতিত্বে বারাণসীতে এই দলের অধিবেশন বসে। এই সকল ঘটনার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল। প্ররোচনামূলক ঘটনাবলী এখানে ওখানে ঘটেছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই অবনতির কথা ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে অত্যন্ত করুণভাবে ফুটে উঠেছিল।২৬ ওই মাসেই চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি হিন্দু-মুসলমান চুক্তি হয়, যাতে উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং এও বলা হয় যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী চাকরী মুসলমানদের দেওয়া হবে।

১৯২৩ সাল থেকেই আবার বৈপ্লবিক কার্যকলাপসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। ১৯২০ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, এবং গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায় তাঁরা হিংসাত্মক কাজকর্ম ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২২ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সুযোগে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীরাও পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, এবং অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর নতুন করে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিপ্লববাদের গুণকীর্তন শুরু হয়, ১৯২৩-এর জুলাই থেকে বিপ্লবীদের পুস্তিকা ও প্রচারপত্রসমূহ দেখা দিতে আরম্ভ করে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলগুলির পুনর্জাগরণ হয়। ১৯২৩-এর শেষের দিকেই চট্টগ্রামে সূর্য সেন বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ওই দলের দ্বারা চট্টগ্রামের আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অফিস থেকে ৭৭,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। সূর্য সেন তাঁর কতিপয় সহযোগী সহ ধরা পড়েন, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাঁরা সকলেই ছাড়া পান। বাংলাদেশ ছাড়া উত্তরপ্রদেশেও বিপ্লববাদের পুনরুজ্জীবন হয় ১৯২৩ সালে। শচীন্দ্র সান্যালের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আরও তিনজন বাঙালী যাঁরা উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চালিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং সতীশচন্দ্র সিংহ।

১৫ই সেপ্টেম্বরের কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন পন্থীদের (যাদের আমরা অতঃপর স্বরাজ্য দল বলে অভিহিত

২৬। *IAR* (Supplement 1923), 59; *Congress Presidential Address, Second* Series, Natesan & Co, 673 ff.

করব) জয়লাভের পর শীঘ্রই তাঁদের নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রস্তুতির জন্য মাত্র দু'মাস সময় তাঁরা পেয়েছিলেন, এবং কংগ্রেসের সামগ্রিক সমর্থন তাঁরা পান নি, গোঁড়া গান্ধীবাদীরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ১৯২৩-এর ১৪ই অক্টোবর তারিখে তাঁরা নির্বাচনী ইস্তাহার জারি করেন।২৭ নভেম্বরের অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। নরমপন্থী নেতারা, যাঁরা আগে আইনসভাগুলি একচেটিয়া করে রেখেছিলেন, শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, এবং কার্যত তাঁরা ভারতীয় রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য দল অধিকাংশ আসন দখল করে, বাংলাদেশে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও আসামেও তারা রীতিমত সাফল্য লাভ করে, তবে মাদ্রাজে ও পাঞ্জাবে তাদের সাফল্য তেমন হয় নি, বিহার ও উড়িষ্যায় নির্বাচনে তারা কোন প্রার্থী দেয়নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন ৩৯ জন, এবং বাকি ১০৫টি আসনের মধ্যে স্বরাজ্য দল দখল করেছিল ৪৮টি আসন, আর জিন্নার প্রভাবাধীন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা পেয়েছিল ২৪টি আসন। স্বরাজ্য দল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছিল।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে স্বরাজ্য দল সরকার গঠনের পরিবর্তে বিরোধী দল হিসাবে থাকার রণনীতি গ্রহণ করেছিল এবং বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এই নীতি সাফল্যলাভ করেছিল। ১৯২৪-এর ১৪ই জানুয়ারী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আইনসভায় প্রস্তাব এনেছিলেন যে ১৮১৮র কুখ্যাত তিন নম্বর রেগুলেশনটি তুলে নেওয়া হোক, এই প্রস্তাব ৭৬—৪৫ ভোটে গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে নানা বিষয়ে সরকার পক্ষকে পরাজিত করার ও বেকায়দায় ফেলার নীতি স্বরাজ্য পার্টি সাফল্যের সঙ্গে চালাতে পেরেছিল। কিন্তু ১৯২৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধী অসুস্থতার কারণে কারামুক্ত হন, এবং জেলখানা থেকে বেরিয়েই ঘোষণা করেন যে আইনসভায় অংশ গ্রহণ করার নীতি অসহযোগ নীতির বিরোধী। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গান্ধী কোন অবস্থাতেই তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না।

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯২৪) মতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রস্তাব তোলেন যে ভারতবাসীদের পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রদান করার উদ্দেশ্যে একটি গোলটেবিল বৈঠক হোক, এবং তিন দিন বিতর্ক চলার পর ৭৬—৪৮ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাক-

২৭। *IAR*, (1923), II, 219-20.

ডোনালড, যিনি শ্রমিক দলের নেতা ছিলেন এবং পূর্বে ভারতবাসীর দাবি সম্পর্কে অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারতীয় আইনসভা অনুমোদিত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

এদিকে গান্ধী ২২শে মে (১৯২৪) তারিখে একটি বিবৃতিতে জানালেন যে আইনসভায় অংশ গ্রহণকারীরা বিপথচালিত হয়েছে এবং সৎ কংগ্রেসীরা যেন তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে বরং গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করে। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল পাল্টা বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে আইনসভায় অংশ গ্রহণ অসহযোগের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়, এবং প্রয়োজন হলে দেশের স্বার্থে তাঁরা অসহযোগকেও বর্জন করতে প্রস্তুত।২৮ গান্ধী পাল্টা একটি ঘোষণায় জানালেন যে যারা অক্ষরে অক্ষরে অসহযোগের ঘোষিত আদর্শগুলি পালন করেনা তাদের কংগ্রেসের কোনরকম কর্ম-পরিষদেরই সদস্য করা যাবে না। গান্ধীর এই ঘোষণা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ২৭শে জুন তারিখে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে গান্ধী প্রস্তাব করে বসলেন যে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেককে দৈনিক সুতা কাটতে হবে, এবং তার নিদর্শন প্রত্যেক মাসে দেখাতে হবে। মতিলাল নেহরু এই প্রস্তাবকে কংগ্রেস-সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। তথাপি ৮২—৬৮ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় মতিলাল, চিত্তরঞ্জন ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার অনুগামীদের সহ সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। গান্ধীর এই প্রস্তাবে একটি পেনাল-ক্লজও ছিল, অর্থাৎ রাজি হবার পরেও সুতা না কাটলে কিরকম শাস্তি হবে তা নিয়ে। কেউ কেউ বললেম যে গান্ধীর প্রস্তাব থেকে এই ধারাটি বাদ দেওয়া হোক, কিন্তু গান্ধী রাজি না হওয়ায় এই বিষয়টি নিয়ে যে ভোটাভুটি হল তাতে ৬৭—৩৭ ভোটে গান্ধী জয়লাভ করলেন। ৩৭ জন স্বপক্ষের ভোট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পড়ায় গান্ধী হুঁসিয়ার হলেন, বুঝতে পারলেন যে তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠছে। ফলে তিনি উপরিউক্ত প্রস্তাবাবলী নিয়ে বিশেষ গোঁড়ামি রাখলেন না, ওগুলি নতুন-ভাবে রচনা করলেন সকলের গ্রহণের উপযোগী করে।২৯ উক্ত বৈঠকে আরও একটি ঘটনা গান্ধীকে সাবধানী করে তোলে। গোপীনাথ সাহা নামক এক বিপ্লবী যুবক ইংরাজ হত্যা করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাঁর পথকে সমর্থন না করলেও তাঁর দেশপ্রেমের ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে চিত্তরঞ্জন একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। গান্ধী এতে আপত্তি করেন এবং

২৮। *ibid.,* (1924), I, 601-4.
২৯। *ibid.,* II • 132.

চিত্তরঞ্জন ৭৮—৭০ ভোটে হেরে যান।৩০ কিন্তু মাত্র ৮ ভোটে জয়লাভটাকে গান্ধী নিজের জয়লাভ বলে মনে করতে পারেন নি। অতঃপর তিনি স্বরাজীদের সঙ্গে বনিয়ে চলার নীতি নিয়েছিলেন, এবং বলাই বাহুল্য ও তরফ থেকেও সাড়া জুটেছিল।

২৪শে মে তারিখে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে জিন্না বলেন, অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, এখন দরকার এমন কাজ করা যাতে স্বরাজ লাভ ত্বরান্বিত হয়। অবশ্য এই স্বরাজের দাবি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নয়। এই অধিবেশনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসনতন্ত্র দাবি করা হয়, যেখানে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে। সাম্প্রদায়িক হানাহানি সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ১৫ জুলাই তারিখে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়, আগস্টে হয় গুলবর্গায় এবং সেপ্টেম্বরে হয় কোহাটে। কোহাটের হাঙ্গামায় খিলাফৎ কর্মীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।৩১ এই সকল ঘটনায় ব্যথিত হয়ে গান্ধী ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে অনশন শুরু করেন, এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন নেতা ভাববিনিময় করেন এবং কিভাবে সাম্প্রদায়িক শান্তি আনা যায় তার জন্য সচেষ্ট হন। গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন ৮ই অক্টোবর তারিখে।৩২ গান্ধীর অনশনে অবশ্য দাঙ্গাকারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় নি। যেদিন তিনি অনশন শুরু করেছিলেন সেদিন সাজাহানপুরে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তাঁর অনশনের শেষ দিনে দাঙ্গা হয়েছিল এলাহাবাদে, কাঁচড়াপাড়ায় এবং জব্বলপুরের সাগর নামক স্থানে।

১৯২৪-এর এপ্রিলে বিভিন্ন আইনসভার অকংগ্রেসী সদস্যেরা, এবং বিভিন্ন নরমপন্থী সংগঠনের নেতারা একটি কনভেনশন গঠন করেন, এবং তার তরফ থেকে শ্রীমতী বেশান্তের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন পুরাতন হোমরুলের দাবিতে ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, ইংলণ্ডে তাঁরা কয়েকটি সভাও করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে।৩৩ সেপ্টেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীমতী বেশান্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কথা তুললেন। গান্ধীও এইরকম চিন্তা করেছিলেন, এবং সেই হিসাবে নভেম্বরের ২১ ও ২২ তারিখে বোম্বাই-এ একটি সর্বদলীয় সম্মেলন বসল। এই সম্মেলন একবাক্যে (শ্রীমতী বেশান্ত,

৩০। *ibid*,. I, 620-21.
৩১। *ibid*., II, 25, 32, 308, 421, 434, 481; (1925), 97, 106.
৩২। *ibid*., 147-60.
৩৩। Besant, *India Bond or Free*, (1926) 210; *IAR* (1924), I, 74 ff; 703 ff.

এমিলি লুটেনস, যমনাদাস দ্বারকাদাস এবং রতনজি ধরমজি মোরারজি ছাড়া) কুখ্যাত ১৯২৪-এর বেঙ্গল অর্ডিনান্সের নিন্দা করে তা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৮১৮র তিন নম্বর রেগুলেশন, যাতে বিনা বিচারে লোককে জেলে পোরা চলত, তুলে নেবার দাবিও এখানে গৃহীত হয়, এবং সর্বোপরি ঘোষণা করা হয় যে দেশে যে অশান্তিকর পরিবেশ চলছে তার জন্য দায়ী স্বরাজ না পাওয়া।

১৯২৪ সালে বিপ্লবীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন না। জানুয়ারী মাসে গোপীনাথ সাহা টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে অপর একজনকে হত্যা করেছিলেন। তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৭ তারিখে ভারত সরকার কানপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কয়েকজন কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে একটি মামলা রুজু করেন যা কানপুর বলশেভিক মামলা নামে খ্যাত। পেশোয়ারের পর এটি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা। মার্চ মাসে কলকাতায় একটি বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করে। অনুরূপ একটি কারখানা ছিল দক্ষিণেশ্বরে। বিপ্লববাদের এই পুনর্জাগরণের ফলে সরকার অক্টোবর মাসে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করেছিল, যার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। এই আইনের দ্বারা অসংখ্য লোককে নিছক সন্দেহবশেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র বসুকেও কিছুকাল অন্তরীণ করা হয়েছিল। ১৯২৪-এর অক্টোবরে কানপুরে বিপ্লবীদের একটি সভা হয়, এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয় যার শাখা-প্রশাখা বহু দূর বিস্তৃত হয়েছিল। এই সংস্থা বিপ্লবের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল।

প্রাক-আইন-অমান্য পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের কোয়ালিশন হয়েছিল এই সর্তে যে দুতরফই সরকার পক্ষের বিরোধিতা করবে। ১৯২৫-এর জানুয়ারি মাসে যখন কেন্দ্রীয় আইনসভার চতুর্থ অধিবেশন বসল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা আর স্বরাজ্য দলের সঙ্গে একই উদ্যমে সরকার বিরোধিতা করতে রাজি হল না যার ফলে উক্ত কোয়ালিশনের কার্যত অবসান ঘটল। এদিকে ১৯২৪-এর নভেম্বরে বোম্বাইতে যে সর্বদলীয় সম্মেলন বসেছিল, তারই অনুসরণ হিসাবে, ওই সম্মেলন থেকেই উদ্ভূত একটি কমিটি দিল্লীতে গান্ধীর নেতৃত্বে একটি বৈঠকে মিলিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপায় খুঁজে বার করা, আইনসভা ও বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় সকল সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিনিধিদের পদ্ধতি নির্ণয় করা, এবং কি ধরনের স্বরাজ বর্তমান অবস্থায় কার্যকর হবে তার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। কিন্তু কার্যত কোন কিছুই দাঁড় করানো গেল না, এবং সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হল।

ইতিমধ্যে গান্ধী যে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সমঝোতা রক্ষার নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেকথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। চিত্তরঞ্জনের তরফ থেকেও এর প্রত্যুত্তর মিলেছিল। ২৫শে মার্চ (১৯২৫) তারিখে চিত্তরঞ্জন একটি ইস্তাহার জারি করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যের বিরোধিতা করলেন। গান্ধীর সঙ্গে দাশের এই বোঝাপড়ার প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত হয়েছিল। ৩১শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের উপর হাউস অফ লর্ডসে বিতর্ককালে সেক্রেটারি অফ দি স্টেট লর্ড বার্কেনহেড গান্ধীর সঙ্গে দাশের সমঝোতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে উভয়ের মিলিত উদ্যোগের ফলে যদি বাংলাদেশ থেকে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয় তার জন্য অপেক্ষা করা ভাল। ৩রা এপ্রিল তারিখে একটি বিবৃতিতে চিত্তরঞ্জন লর্ড বার্কেনহেডের এই মনোভাবকে স্বাগত জানালেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে হাউস অফ কমন্সে জনৈক আণ্ডার-সেক্রেটারী জানালেন যে চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে লর্ড বার্কেনহেড কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব আশা করেন। প্রত্যুত্তরে চিত্তরঞ্জন ২রা মে তারিখে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ভারতের জন্য নিছক ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাইলেন অন্যান্য দাবির বহরকে অনেক খাটো করে।

এর জন্য অবশ্য চিত্তরঞ্জন তাঁর দলের একাংশের সমালোচনার পাত্র হন, এবং চিত্তরঞ্জনের সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসেন গান্ধী। বস্তুত চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনের নেপথ্য কথাবার্তা দীর্ঘদিন ধরেই হয়েছিল, এবং বৃটিশ সরকার কতখানি দিতে পারে সেটাও তিনি বুঝেছিলেন। এর পর বড়লাট লর্ড রীডিং লণ্ডন চলে যান ভারত সচিব লর্ড বার্কেন-হেডের সঙ্গে আলোচনার জন্য। বস্তুত একটা আপোষের সুর বাতাসে ভাসছিল, এবং প্রত্যেকেই আশা করছিলেন বার্কেনহেড শীঘ্রই ভারত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। কিন্তু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটল ১৬ই জুন তারিখে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরই বৃটিশ সরকার আর অগ্রসর হতে চাইল না। ৭ই জুলাই তারিখে লর্ড বার্কেনহেডেব একটি জরুরী ঘোষণা করার কথা ছিল, তার পরিবর্তে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হল।১ চিত্ত-রঞ্জনের মৃত্যু এবং লর্ড বার্কেনহেডের ঘোষণা গান্ধী ও স্বরাজ্য দলকে পরস্পরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল।

এদিকে শ্রীমতী বেশান্ত নরমপন্থী নেতাদের দ্বারা রচিত কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া বিলের একটি খসড়া ইংলণ্ডে পাঠান। এই খসড়াটি ১৯২৫-এর ১১-১৩ই এপ্রিল তারিখে নরমপন্থীদের কনভেনশনে গৃহীত হয়। মে মাসে এই খসড়াটিকে পাঠানো হয় মেজর গ্রাহাম পোলের কাছে যিনি এটিকে লেবার পার্টির কর্মসমিতির সামনে পেশ করেন। লেবার পার্টি এই খসড়া বিলটি পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছিল। ২৯শে জুন তারিখে চল্লিশজন নেতার স্বাক্ষরিত এই খসড়াটিকে মুদ্রিত করে ভারত-বর্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জুলাই মাসে শ্রীমতী বেশান্ত ইংলণ্ড যান এবং বিলটি যাতে পার্লামেণ্টে ওঠে সেজন্য তদ্বির করেন।২

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও তা রোধ করা যায় নি। উপরন্তু ১৯২৫ সালে তার বিস্তৃতি ঘটেছিল। ওই বছরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল ষোলটি। এগুলির মধ্যে দিল্লী, আলিগড়, এবং শোলা-পুরের দাঙ্গা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মতিলাল নেহরু ও আবুল কালাম আজাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃতি রোধের চেষ্টা করেছিলেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়,

১। Bose, II, 156-57.
২। Besant, *op. cit.*, 210 ff.

সেক্ষেত্রে এই সব ব্যাপারে সুবিধাবাদী নেতাদের নেপথ্য সমর্থন সক্রিয় থাকে, যে কারণে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে রোধ করা যায় নি।৩

ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কানপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল নেহরু আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তখনও ওই আন্দোলনের সময় উপস্থিত হয় নি এই বিবেচনায় কতকগুলি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয় যাতে স্বরাজ্য দলের আইনসভার সদস্যদের আইনসভা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আইনসভা থেকে বেরিয়ে আসার উপলক্ষ্য হিসাবে ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মতিলাল নেহরু যে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের বক্তব্য না পাওয়াটাকেই গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে স্বরাজ্য দলের আইন-সভা থেকে ওয়াক আউটের এই পরিকল্পনাটি গান্ধীর অসহযোগ নীতির অনুগামী, এতে গান্ধী ও গান্ধীপন্থীরা খুশি হলেও, স্বরাজ্য দলের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, কেননা অনেকেই আইনসভার সুপরিচিত পদ্ধতি অনুসরণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। যে কোন প্রসঙ্গেই হোক নিছক সরকার বিরোধিতার নীতি অনেকের কাছেই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

মদনমোহন মালব্য মতিলাল নেহরু আনীত আইনসভা ত্যাগের প্রস্তাবটি গলাধঃকরণ করতে পারেন নি কেননা তাঁর মতে আইনসভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজন তখনও ফুরিয়ে যায় নি। জয়াকর, কেলকার ও মুঞ্জে স্বরাজ্য দলের নবঘোষিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মতানৈক্য ও ক্ষোভ প্রকাশের জন্য আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন, এবং তাঁদের দেখাদেখি স্বরাজ্য দল থেকে অনেকেই পদত্যাগ করেন। ১৯২৬-এর ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই দলত্যাগীরা আকোলা নামক স্থানে মিলিত হয়ে 'রেস্পন্সিভ কো-অপারেশন পার্টি' নামক একটি দল গঠন করেন।৪...মালব্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি ত্যাগ করে এই নতুন দলে যোগদান করেন ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এদিকে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে ১৯২৬-এর ৭ই ও ৮ই মার্চ তারিখে। সেখানে স্বরাজীরা জানান যে ১৯২৪-এ মতিলাল নেহরুর সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারকে যে চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল, তা সরকার প্রত্যাখ্যান করায় তাঁরা ৮ই মার্চ আইনসভা বর্জন করছেন।৫

এদিকে ২৪শে মার্চ তারিখে স্বরাজ্য পার্টি ব্যতীত অপরাপর দলের

৩। ১৯২৩ থেকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য *Statutory Commission's Report*, Vol. IV.

৪। *IAR* (1926), I, 40.

৫। *ibid.*, 17.

১০০ জন নেতা একটি ঘোষণাপত্রের দ্বারা ৩রা এপ্রিল তারিখে বোম্বাইতে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে পূর্বোল্লিখিত 'রেস্পন্সিভ কো-অপারেশন পার্টি'র' প্রত্যুত্তরমূলক সহযোগিতা নীতির ভিত্তিতে বৃহৎ পরিসরে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' নামক একটি দল গড়া হয়। এই দল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকেই তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, এবং আইন অমান্য, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি গণআন্দোলনের নীতিকে নিন্দা করে।৬ ২৩শে জুন তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে। এখানে মালব্য বক্তৃতা দেন, এবং আসন্ন আগস্টের ২৮ তারিখে আরও একটি সম্মেলনের কথা এখানে ঘোষিত হয়।৭ জুলাই-এর শেষের দিকে মধ্যপ্রদেশ আইনসভার সদস্যরা রাঘবেন্দ্র রাও-এর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেন। লজপত রায় স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেন ২৪শে আগস্ট তারিখে। কংগ্রেসের অন্তর্গত এই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে (যথা গান্ধী ও তাঁর গোঁড়া অনুগামীরা, মতিলালের নেতৃত্বাধীন স্বরাজ্য দল যা তখন গান্ধীর অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল যা মূলত নরমপন্থী নেতাদের দ্বারা গঠিত ছিল, নবগঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি যা বৃটিশ সরকারকে সঙ্গে প্রত্যুত্তরমূলক সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী যে নীতি পুরোনো কালের তিলক-প্রস্তাবিত নীতির কাছা-কাছি, ইত্যাদি) এক করার শেষ চেষ্টা করা হয় ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯২৬) দিল্লীতে আহূত একটি সম্মেলনে। এখানে মতিলালের দল প্রস্তাব করে যে প্রত্যুত্তরমূলক-সহযোগিতাবাদীরা এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মসূচী মেনে নিয়ে আসন্ন নির্বাচনে একটি অখণ্ড দল হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। কিন্তু বাকি দলগুলি এতে রাজি হয় না। তারা একটি কোয়ালিশন গঠন করে, নাম দেয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি, এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি ইস্তাহার জারি করে। ১৯২৬-এর নির্বাচনে স্বরাজ্য দল প্রচণ্ড রকম মার খায়।

১৯২৬-এ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের শোচনীয় অবনতি ঘটেছিল। ২রা এপ্রিল তারিখে কলকাতায় একটি ব্যাপক ধরনের দাঙ্গা হয় যা ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত একনাগাড়ে ঘটেছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল ৪৪ জন এবং আহত হয়েছিল ৫৮৪ জনেরও বেশি। ২২শে এপ্রিল তারিখে পুনরায় দাঙ্গা হয় যাতে মারা যায় ৬৬ জন এবং আহত ৩৯১ জন।৮ ২৬ তারিখে তৃতীয়বার দাঙ্গা হয় যেখানে নিহতের সংখ্যা ছিল ২৬ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল ২২৬। কলকাতা ছাড়া

৬। *ibid.*, 50.
৭। *ibid.*, II, 34.

বাংলাদেশের অন্যত্রও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল। বাংলাদেশ ছাড়া রাওলপিন্ডি ও এলাহাবাদে দাঙ্গা ঘটেছিল এবং দিল্লীতে ঘটেছিল উপর্যুপরি পাঁচবার। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ছিল হরিদ্বারের নিকটে গুরুকুলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রোগশয্যায় শায়িত শ্রদ্ধানন্দকে আকস্মিকভাবে ছুরিকাবিদ্ধ করা হয়।৮ ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ৪৫০ জনেরও বেশি নিহত এবং ৫০০০-এরও বেশি লোক আহত হয়েছিল।৯

গান্ধীর মুসলিম-প্রীতি এবং চিত্তরঞ্জন, লজপত রায় প্রমুখের মুসলিম তোষণ কংগ্রেসের গোঁড়া ও স্বরাজ্য উভয় অংশকেই হিন্দুর কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল, যার প্রমাণ মিলেছিল ১৯২৬-এর নির্বাচনের ফলাফলে। পক্ষান্তরে মুসলমান সম্প্রদায় নিছক হিন্দু নেতৃত্বের জন্যই কংগ্রেস-স্বরাজ্য দলের পাশে না দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বকেই পছন্দ করছিল, যার ফলাফল পরবর্তী ইতিহাসে গুরুতর হয়েছিল। ডিসেম্বরে গৌহাটিতে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল তাতে কানপুর অধিবেশনে অবলম্বিত কর্মসূচী বাতিল করা হয়।

প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ভারতের অভ্যন্তরে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল। (স্থানীয়ভাবে অবশ্য বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে—যেমন লেবার-স্বরাজ পার্টি, কৃষক-শ্রমিক দল প্রভৃতি—কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। এই পার্টিগুলির সঙ্গে কমিণ্টার্ণের তরফ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু এগুলির পারস্পরিক সমন্বয় ঘটতে সময় লেগেছিল। যদিও পূর্বে দুটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল—পেশোয়ার ও কানপুর—সেই মামলাগুলির ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল, এবং অভিযুক্তরা সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কমিণ্টার্ণের প্রস্তাবানুযায়ী গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে ফিলিফ স্প্রাট ভারতে আসেন ১৯২৬ সালে, এবং বিভিন্ন কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ঘেঁষা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯২৭-এ তিনি বোম্বাই-গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করেন, এবং ১৯২৮-এ বাংলা-গোষ্ঠীর সঙ্গে। উত্তরপ্রদেশে তাঁর প্রচেষ্টায় 'শ্রমিক-কৃষক দল' গঠিত হয় ১৯২৮র অক্টোবরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লেনিনের মৃত্যুর পর থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত দিকটিতে ভাঁটা পড়ে, কমিণ্টার্ণের কার্যাবলী সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে।)

৮। *ibid.*, 312.
৯। *Satutory Com. Rep.*, IV (1), 106.

বাংলা ও উত্তরপ্রদেশে যে বিপ্লবী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯২৫-এর ৯ই আগস্ট তারিখে উত্তরপ্রদেশে রামপ্রসাদ বিশমিলের নেতৃত্বে একটি চাঞ্চল্যকর রেল-ডাকাতি হয়েছিল। ট্রেণটি কাকোরি থেকে আলমনগর যাচ্ছিল। দশজন বিপ্লবী চেন টেনে গাড়ী থামিয়ে, গার্ডের সামনে রিভলভার উঁচিয়ে মেলভ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করেন। অনেক তদন্তের পর পুরো দলটিই ধরা পড়ে। ৪৪ জনের মধ্যে ১৫ জনকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেওয়া, বাকি ২৯ জনকে একটি বিশেষ আদালতের সম্মুখীন করা হয়। এই মামলা কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা বলে খ্যাত। চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, চারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়, বাকি কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করা হয়, দুজন রাজসাক্ষী সহ চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই দণ্ডাদেশকে উপলক্ষ করে উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়, উত্তরপ্রদেশ আইনসভা আসামীদের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য আবেদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯২৬-এর ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁদের প্রাণদণ্ড কার্যকরী হয়। বাংলাদেশে কিন্তু প্রাথমিক জোয়ারের পরেই বিপ্লব আন্দোলনে ভাঁটার লক্ষণ দেখা যায়। ১৯২৭-এ বাংলাদেশ বৃটিশ সরকারের চোখে কোন বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকর্ম ঘটেনি। ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তি পাবার পর বিপ্লবীরা জনসাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেখে বিশেষ করে তরুণ বিপ্লবীরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। কংগ্রেসের কিছু তরুণ নেতা, যেমন সুভাষচন্দ্র বসু, প্রভৃতি যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করতেন, এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৮-এর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে দুহাজার যুবক সামরিক পরিচ্ছদে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ড্রিল করেছিলেন, তাঁদের একটি মোটা অংশকেই জোগাড় করা হয়েছিল তরুণ বিপ্লবীদের মধ্য থেকে।

১৯২৭-এর ৮ই নভেম্বর তারিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান তৈরী করার জন্য এবং ভারতবাসীকে কতটা রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া যায় তা স্থির করার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের সাতজন সদস্যকে নিয়ে সার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন বসবে। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্যকে না নেওয়ায় সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং সকলেই এই বিষয়টিকে জাতীয় অপমান বলে মনে করেন।১০ ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দলই বিক্ষোভে মুখর হয়

১০। Gweyer M. and Appadorai A., *Speeches and Documents on the Indian Constitution* (1957), I, 208 ff.

এবং এই কমিশনকে বয়কট করার ব্যাপারে সকল দলই একমত হয়। এছাড়া, সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতবাসীকে অবজ্ঞা করার সমুচিত জবাব দেবার জন্যই ভারতীয়দের তরফ থেকে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করার কাজে হাত দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে। অপরাপর দলও এই বিষয়টি অনুমোদন করে।

১৯২৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সাইমন কমিশন বোম্বাই-এ উপনীত হলে বোম্বাই সহ সর্বত্রই ব্যাপক হরতাল পালিত হয়। অসংখ্য কালো পতাকায় লিখিত 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিসহ হাজার হাজার বিক্ষোভ-কারী রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করে। চৌপাট্টিতে ৫০,০০০ লোকের একটি জনসভায় বিভিন্ন দলের বক্তারা সাইমন-কমিশন বিরোধী বক্তৃতা দেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লালা লজপত রায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রস্তাব আনেন যে তাঁরা সাইমন কমিশন বয়কট করবেন, এবং বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে এই প্রস্তাব বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়।

এদিকে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতীয়দের দ্বারা একটি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন দল ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানায়। তদনুযায়ী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে ডঃ এম. এ. আনসারীর সভাপতিত্বে এই সংবিধান-সভার প্রথম বৈঠক বসে। দ্বিতীয় অধিবেশন বসে লক্ষ্মৌ-এ ২৮ থেকে ৩১শে আগস্ট তারিখে, যেখানে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি সংবিধান রচনার মূলসূত্র হিসাবে যে সব সুপারিশ করেছিলেন, তা দলমত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে গৃহীত হয়। নেহরু কমিটির সুপারিশগুলি ছিল নিম্নরূপ : সরকার এবং শাসনব্যবস্থা আইনসভার নিকট তার কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবে। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা যথাক্রমে ২০০ ও ৫০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। উচ্চকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন প্রাদেশিক আইনসভা-সমূহের সদস্যদের দ্বারা সামানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে, এবং নিম্ন-কক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন জনসাধারণের ভোটে। সাম্প্রদায়িক প্রতি-নিধিত্বের ক্ষেত্রে যে নিয়মটি অনুসৃত হবে তা হচ্ছে এই যে, বাংলা ও পাঞ্জাবে কোন আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই, কারণ ওই দুটি প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরাপর প্রদেশে তাদের স্বাভাবিক আসন ছাড়াও, বিশেষ কিছু আসন সংরক্ষিত করা হবে।

লক্ষ্মৌ সম্মেলনে সংবিধান রচনার এই মূল সূত্রকে সকল তরফই সমর্থন করেছিল। ১৯২৮-এর ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় এই উপলক্ষে আর একটি সর্বদলীয় কনভেনশন বসেছিল। এখানে কিন্তু লক্ষ্মৌর ঐক্যমত থাকল না। মহম্মদ আলি জিন্না এখানে মুসলমানদের জন্য আরও

সুবিধা দাবি করলেন। ইতিমধ্যে জিন্নার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়েছিল, এবং দীর্ঘদিনের আচরিত জাতীয়তাবাদ ছেড়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক মূলধন বানিয়েছিলেন। জিন্না বরাবরই ছিলেন নরমপন্থী, কিন্তু কুড়ির দশকের শেষার্ধে নরমপন্থীরা ভারতের-রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছিলেন বলা যায়। সকলের সঙ্গে জিন্নাও হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। নিছক প্রতিষ্ঠার খাতিরে তিনি এবার রং বদলে ফেললেন, এবং অতঃপর মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পেঁাছাতে তাঁর দেরি হয় নি। কিন্তু জিন্নার প্রস্তাব কনভেনশনে গৃহীত না হওয়ায় তিনি দলবল সহ কনভেনশন ত্যাগ করলেন। শিখ নেতারাও কিছু অবান্তর দাবি তুলেছিলেন, এবং তাঁরাও জিন্নার পিছু পিছু কনভেনশন ত্যাগ করলেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ডঃ আনসারী, আলি ইমাম, মামুদাবাদের রাজা প্রভৃতি প্রভাবশালী মুসলমান নেতারা মতিলাল নেহরু কমিটির উদ্ভাবিত মূলসূত্রগুলিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

নেহরু-সংবিধানে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কথা ছিল, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তখনও প্রবীণ নেতারা ভাবতে পারেন নি। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নটি অত্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল, এবং এই সংস্থা পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারকার্যে নেমেছিল।[১১] পূর্ণ স্বাধীনতার এই দাবি ১৯২৮-এর ডিসেম্বরের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে, যেখানে মতিলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেছিলেন, প্রতিফলিত হয়েছিল। এখানে গান্ধী বলেছিলেন যে যদি বৃটিশ সরকার এক বছরের মধ্যে মতিলাল নেহরু-সংবিধান মেনে নেয়, তাহলে কংগ্রেসও ডোমিনিয়ন মর্যাদাটুকু নিয়েই খুশি থাকবে। নতুবা আবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে এবং তখন সে আন্দোলনের লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এতে অবশ্য তরুণ সদস্যরা খুশি হন নি, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতাকামীদের তরফ থেকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থিত হয়েছিল যদিও তা ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

১৯২৯-এর ১লা জানুয়ারী তারিখে বিভিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির একটি সম্মেলন হয়েছিল দিল্লীতে। মুসলিম লীগ ছাড়াও এতে যোগদান করেছিল আগা খাঁ ও মোহম্মদ শফি পরিচালিত দুটি অধিকতর সাম্প্রদায়িক দল, কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির সদস্যরা। এই সম্মেলনে জিন্না মুসলমানদের জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত রাজনৈতিক সুবিধা দাবি করেন।

১১। Bose, II, 215.

নেহরু-সংবিধান কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল যা আমরা পূর্বে দেখেছি। আমরা এও দেখেছি যে কলকাতা কনভেনশনে জিন্নার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি কনভেনশন থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন। ২৮শে মার্চ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় জিন্না তাঁর সুবিখ্যাত চোদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। এই চোদ্দ দফার মধ্যে প্রধান প্রধান শর্তগুলি ছিল, ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়; প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে হবে; প্রত্যেকটি আইনসভায় যাতে মুসলমান সম্প্রদায় উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায় তা দেখতে হবে; কেন্দ্রীয় আইনসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে মুসলমান হতেই হবে; পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে; প্রদেশগুলির সীমানাগত পরিবর্তন এমনভাবে করা চলবে না যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে তাদের সংখ্যাধিক্য ক্ষুণ্ণ হয়; এমন কোন আইন বা বিল বা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভায় আনা চলবে না যাতে কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের আপত্তি আছে; সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করতে হবে; কেন্দ্রে বা প্রদেশের মন্ত্রিসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলিম হওয়া দরকার ইত্যাদি।

(১৯২৯ সালে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃতি পুনরায় লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার পর সরকারী তরফ থেকে ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়, নির্বিচার ধরপাকড়, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের উপর অকারণ লাঞ্ছনা নেমে আসে, এবং বিপ্লবীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে গড়ে ওঠে। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার যে আসামী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই চন্দ্রশেখর আজাদ ভাঙা দলকে জোড়া লাগাবার এবং নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুরাতন দলের নাম বদলে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' রাখা হয়, কেননা এই নতুন নেতৃত্ব রুশিয়ার ঘটনাবলী, বোম্বাই, কলকাতা ও কানপুরের শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাবও এঁদের উপর ছিল। 'শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব' ছিল এঁদের লক্ষ্য।) কিন্তু কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতন সন্ত্রাসবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন।[১২] এঁদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ লাহোরের অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সণ্ডার্সকে হত্যা। ১৯২৮-এর ৩০শে অক্টোবর তারিখে লাহোরে সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে লজপত রায় পুলিশের লাঠিতে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তারই ফলে ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি মারা যান। এই ঘটনার প্রতিশোধ হিসাবে

১২। Ghosh A. K., *Bhagat Singh and His Comrades* (1945), 2, 4.

ভগৎ সিং প্রকাশ্য দিবালোকে সণ্ডার্সকে হত্যা করেন এবং গা ঢাকা দিতে তিনি সক্ষম হন।

হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী কাজটি আরও সাহসিকতাপূর্ণ এবং তাৎপর্যময় ছিল। সণ্ডার্সের হত্যার পর পুলিশ প্রচণ্ড দমননীতি চালায় যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে বিপ্লবীরা কাজ হাসিল করে সরে পড়ে আর নিরীহ জনসাধারণ মার খায়। এই ধারণা অপনোদনের জন্য এবং একই সঙ্গে ভারতবর্ষের নিস্তরঙ্গ রাজনীতিতে চাঞ্চল্য আনয়নের জন্য তাঁরা একটি অভিনব পরিকল্পনা খাড়া করেন। স্থির হয় যে, কোন একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার বরণ করবেন। (১৯২৯-এর এপ্রিলে দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় শিল্প-বিরোধ আইন নিয়ে আলোচনা চলছিল যে আইনের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ ছাড়া সরকার তরফ থেকে একটি জননিরাপত্তা বিল আনা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন দমন করার নামে, এবং বিদেশ থেকে যাতে বিপ্লব রপ্তানী হয়ে এদেশে না আসে সেজন্য, পুলিশ ও প্রশাসনের ক্ষমতা বাড়ানো এবং জনগণের অধিকার খর্ব করা।) এই বিলটির সঙ্গে যেহেতু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্ক ছিল, এবং যেহেতু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তখন বিচারাধীন ছিল, আইনসভার অধ্যক্ষ বিঠলভাই প্যাটেল দাবি করেন যে হয় বিলটি প্রত্যাহৃত হোক, না হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হোক। এই দুটি বিষয়—শিল্পবিরোধ আইন ও জননিরাপত্তা বিল—জনমনে প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, প্রত্যেকেই আইনসভার দিকে তাকিয়েছিলেন। এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মধ্যেই আইনসভার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করলে কাজ হবে এটা মনে করে ওই কর্মের দায়িত্ব ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের উপর ন্যস্ত করা হল।

৮ই এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে তাঁরা উভয়ে আইনসভায় প্রবেশ করে দর্শকদের গ্যালারীতে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁদের কাছাকাছি বসেছিলেন স্যার জন সাইমন, যিনি জননিরাপত্তা বিলটি সম্পর্কে অধ্যক্ষের রুলিং শোনার জন্য সেদিন এসেছিলেন। দুজনের কাছে দুটি অল্প শক্তির বোমা ছাড়াও (আগেই বলেছি তাঁদের নরহত্যার উদ্দেশ্য ছিল না) রিভলবার ছিল। সাইমনকে দেখে ভগৎ ও বটুক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। লজপত রায়ের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী এই সাইমনকে তদ্দণ্ডে হত্যা করার একটা মোক্ষম সুযোগ তাঁদের চঞ্চল করে তুলেছিল। নিম্নস্বরে এ বিষয়ে তাঁরা আলোচনাও করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কাজ তাঁরা করতে এসেছিলেন সেটা করাই শ্রেয় বোধ করলেন। যে মুহূর্তে শিল্পবিরোধ আইন গৃহীত হল, তখনই ভগৎ সিং আইনসভার মেঝেতে একটি বোমা নিক্ষেপ

করলেন, এবং তার পাঁচ সেকেন্ড পর বটুকেশ্বর দত্ত দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষেপ করলেন। তারপরেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে আনা কিছু 'লাল ইস্তাহার' ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি সহযোগে সেখানে ছড়িয়ে দিলেন। পালাবার সুযোগ ছিল, কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করেন নি। এই ঘটনায় কেউ নিহত হয় নি, পাঁচজন যৎসামান্য আহত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রচারিত লাল ইস্তাহারের শুরু ছিল এইরকম : "বধিরকে শ্রবণ করানোর জন্য স্বরের উচ্চগ্রাম প্রয়োগ করতে হয়। এইরকম একটি ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী নৈরাজ্যবাদী ও শহীদ ভিলাঁ যে উপরিউক্ত অমর শব্দাবলী উচ্চারণ করেছিলেন, তা দিয়েই আমরা আমাদের এই কাজকে সমর্থন করছি। সরকার জানুক যে জননিরাপত্তা ও শিল্পবিরোধ বিলগুলির, এবং লজপত রায়ের কাপুরোষোচিত হত্যার বিরুদ্ধে অসহায় ভারতীয় জনগণের তরফ থেকে প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি, যার ইতিহাসে বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু তোমরা আদর্শকে হত্যা করতে পার না। বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু নেই। বুর্বোঁ এবং জারেদের পতন হয়েছে, কিন্তু বিপ্লবীরা জয়ী হতে হতে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।" লাল ইস্তাহারের শেষ অংশে বলা হয়েছে, "একথা স্বীকার করতে আমরা দুঃখিত যে, আমরা যারা মানবজীবনের উপর পবিত্রতা আরোপ করি, আমরা যারা গৌরবময় একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি যেখানে মানুষ বিশুদ্ধ শান্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে বাস করবে, সেই আমরাই মানুষের রক্তপাতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু যে বৃহৎ বিপ্লব স্বাধীনতা নিয়ে আসবে এবং ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তির শোষণ বন্ধ করবে তাঁর বেদিমূলে ব্যক্তির বলিদান অনিবার্য। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"[১৩]

৬ই জুন (১৯২৯) তারিখে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত আদালতে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেন যাতে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেন, কেন তাঁরা আইনসভাকেই তাঁদের লক্ষ্য করেছিলেন তারও ব্যাখ্যা সেই বিবৃতিতে ছিল। তাঁদের বিখ্যাত এই বিবৃতিটি ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়েছিল, এবং আইনসভায় বোমা ছোড়ার যে উদ্দেশ্য ছিল তা সার্থক হয়েছিল। ১২ই জুন তারিখে উভয়েরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়, এবং সেই আদেশ তাঁরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির দ্বারা গ্রহণ করেন। যে সময় এঁদের বিচার চলছিল, লাহোরে পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। আরও একটি কারখানা আবিষ্কৃত হয় সাহারানপুরে, (১৯২৯-এর মে মাসে। এই ঘটনার পর হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্য ধরা পড়েন, এবং তাঁদের নিয়ে

১৩। *IAR* (1929), I, 78-80.

বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকেও এই মামলায় নূতন করে আসামী করা হয়। ১০ই জুলাই তারিখ থেকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা অনশন শুরু করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে যেহেতু তাঁদের রাজদ্রোহী হিসাবে বন্দী করা হয়েছে, তাঁদের যুদ্ধ-বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হোক। এই অনশন কোন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য করা হয়নি, করা হয়েছিল সরকার তরফ থেকে বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে। তাঁদের এই দীর্ঘস্থায়ী অনশনের ফলে দেশের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁদের দাবিগুলির অধিকাংশ মেনে নেওয়ায় সকলেই অনশন প্রত্যাহার করেন, একমাত্র যতীন দাস ছাড়া। তাঁকে বোঝাবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখে মারা যান।

যতীন দাসের এই আত্মত্যাগের সংবাদে সারা দেশে ব্যাপক ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর দেহ কলকাতায় আনয়নের পথে প্রতিটি প্রধান স্টেশনে দারুণ শোকদৃশ্যের অবতারণা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পত্রাবলী তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে আসতে শুরু করে, যেগুলির মধ্যে একটি ছিল বিখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবারের তরফ থেকে প্রদত্ত, যে ম্যাকসুইনি ৯৩ দিন অনশন করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই আত্মত্যাগ দেশে-বিদেশে অভিনন্দিত হলেও, গান্ধী এ বিষয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন। এই ঘটনার পরই বৃটিশ সরকার বন্দীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সভ্য মনোভাব গ্রহণ করে। যতীন দাসের মৃত্যু যুব সমাজের মধ্যেও বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছিল। সারা ভারত জুড়ে অজস্র যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে, এবং ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে মালব্যের সভাপতিত্বে লাহোরে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] ওই মাসেই চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে দিল্লীর নিকটে ভাইসরয়ের স্পেশাল ট্রেণের উপর বোমা ছোঁড়া হয়। ট্রেণটি জখম হলেও ভাইসরয় বেঁচে যান, এবং চন্দ্রশেখরও আত্মগোপন করতে সক্ষম হন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার উপর যতীন দাসের অনশন মৃত্যুর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। বন্দীরা আদালতে হাজির হাওয়ায় অস্বীকার করাতে স্বাভাবিকভাবে মামলা চলেনি। যতীন দাসের মৃত্যুর পর দুজন রাজসাক্ষী তাদের পূর্বের বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেয়, এবং সরকার তরফের সাক্ষীরাও সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় অপরাধ প্রমাণ করে আসামীদের শাস্তি দেওয়ার কোন সুযোগ দিল না, ফলে ১৯৩০-এর ২রা

১৪। Bose, II, 223-31.

মে তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা অর্ডিনান্স নামক বিশেষ আইন পাশ করিয়ে, একটি পৃথক ট্রাইবুনাল বসিয়ে, কোনরকম বিচারপদ্ধতির মধ্য দিয়ে না গিয়ে অপরাধ প্রমাণের চেষ্টা না করেই, বিশেষ ঘোষণার দ্বারা ৭ই অক্টোবর (১৯৩০) তারিখে সুখদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিংকে প্রাণদণ্ড, সাতজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এবং অবশিষ্টদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষ করে কেন্দ্রীয় আইনসভায় জননিরাপত্তা বিল সরকার তরফ থেকে আনা হয়েছিল (যে সময় ভগৎ ও বটুকেশ্বর আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন) সেই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত ঘটেছিল (১৯২৯-এর ২০শে মার্চ তারিখে থেকে, যেদিন ৩১ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার তরফ থেকে আদালতে বলা হয় যে মস্কোর কমিণ্টার্ণের নির্দেশে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ রাজত্বের উৎখাত, কৃষক শ্রমিকের বিপ্লব এবং সোভিয়েট ধরনের শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং বোম্বাই, বাংলা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে চারটি শ্রমিক-কৃষক দল সৃষ্ট হয়েছে। এই দলগুলি মস্কো থেকে আর্থিক সাহায্য পায়, এবং মস্কো থেকে নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচী ইউরোপ ও ইংলণ্ড ঘুরে গুপ্তভাবে এখানে আসে। অ্যালিসন, স্প্রাট ও ব্রাডলে এখানে বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশে নানাভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন। সংবাদপত্র, যুব সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক ধর্মঘট, জনসভা প্রভৃতি সকল রকম প্রচার পদ্ধতির সাহায্য তাঁরা নিচ্ছেন। মোট পঁনের দফা অভিযোগ সরকারেব তরফ থেকে দায়ের করা হয় যদিও অভিযুক্তদের সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘস্থায়ী এই মামলায় (রায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩-এর ১৬ই জানুয়ারী তারিখে) জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁদের দীর্ঘ বিবৃতিসমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলে কমিউনিস্ট আদর্শ, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হতে পেরেছিল। আমাদের অনেকেরই কারাদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও, এই মামলার ফলে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রচার অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।)

(১৯২৯-এ যখন একদিকে বিপ্লবী কার্যকলাপসমূহ চলছিল হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে, অপরদিকে কমিউ-নিস্টদের পরিচালনায় ব্যাপকভাবে শ্রমিক ধর্মঘট হচ্ছিল, যাব ফলে একটা অস্থির পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে গিয়েছিল বলা চলে।) এদিকে কংগ্রেস শিবিরেও ঝড় বইতে শুরু করেছিল। মন্ত্রিসভা বারবার পরাজিত হবার ফলে

১৯২৯-এর মে মাসে বাংলাদেশের আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা মতিলাল নেহরুর নির্দেশে নূতন নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে, এবং অনেক বেশি শক্তি নিয়ে পুনরায় আইনসভায় ফিরে আসে। যে সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান ১৯২৬-এর নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবারে নির্বাচিত হন। কিন্তু অকস্মাৎ ১৫ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব নেয় যে কংগ্রেসীদের আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে দলের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ২৬শে জুলাই তারিখে অপর একটি বৈঠকে মতিলাল নেহরু এবং গান্ধী উভয়েই আইন-সভা বয়কটের উপর জোর দেন। গান্ধীর নিকট মতিলালের আত্মসমর্পণ গান্ধী নেতৃত্বের পুনর্জাগরণের ইঙ্গিতবাহী হয়েছিল, এবং এই বৈঠকেই গান্ধী পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিরূপে মতিলাল-পুত্র জওহর-লাল নেহরুর নাম প্রস্তাব করেন। সম্ভবত এই কারণেই মতিলাল তাঁর পূর্বের মত বদলে ফেলেছিলেন। ১৯২৭-এ ইউরোপ ভ্রমণের পর জওহর-লাল নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং সুভাষ বসুর সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করে কংগ্রেসে গান্ধী নীতির বিরোধীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই সভাপতিত্ব পাবার পর থেকেই তিনি গান্ধীর শিবিরে যোগদান করেন, এবং এরই ফলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী অংশের একমাত্র নেতা হিসাবে থেকে যান। বাংলাদেশেও কংগ্রেস শিবিরে ভাগাভাগি হয়ে যায়, গান্ধীবাদী অংশের নেতা হন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

১৯২৯-এর ৩১শে অক্টোবর তারিখে বড়লাট লর্ড আরউইন সাইমন কমিশনের সুপারিশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে একটি ঘোষণা জারি করেন। এই ঘোষণায় জানানো হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিতে বৃটিশ সরকারের নীতিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। এই ঘোষণাটি কংগ্রেস মহলে খুবই আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৮-এর কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধী বলে-ছিলেন যে যদি বৃটিশ সরকার নেহরু-সংবিধান মেনে নেয় এক বছরের মধ্যে তাহলে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন মর্যাদাটুকু নিয়ে খুশি থাকবে। নেহরু সংবিধান মানা যদিও হয় নি, এবং তা হবার উপায়ও ছিল না, তথাপি এক বছরের মধ্যে সরকারী তরফের এই ঘোষণাটিকে কংগ্রেস নিজের জয় হিসাবেই গ্রহণ করল। নভেম্বরে দিল্লীতে সর্বদলীয় নেতাদের একটি সভা বসল, গান্ধী ও মতিলাল নেহরু সহ বড় বড় নেতাদের সই করা একটি স্মারকলিপি বড়লাটের নিকট পাঠানো হল। তাতে সরকারের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে জানানো হল যে, যে গোলটেবিল বৈঠকের কথা

সরকারের ঘোষণায় আছে, সেই বৈঠকে যেন ডোমিনিয়ন মর্যাদাপ্রাপ্ত ভারতের সংবিধান রচনার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়, এবং সম্মেলনের পূর্বে যেন কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের একটি সন্ধি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ অবশ্য বড়লাটের ঘোষণায় খুশি হয় নি, জওহরলাল নেহরু উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরদান করতে গোড়ায় আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গান্ধীর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসু, সৈফুদ্দীন কিচলু (লাহোর) এবং আবদুল বারি (পাটনা) কংগ্রেসের এই নীতির সঙ্গে একমত না হয়ে পৃথক ইস্তাহার জারি করে ঘোষণা করলেন যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও গোলটেবিল বৈঠক তাঁদের অভিপ্রেত নয়।১৫ বড়লাটের ঘোষণায় জিন্না খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কার্যকালে সব কিছুই ভেস্তে গেল। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জিন্না প্রমুখ নেতারা বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু বড়লাট তাঁদের সম্পূর্ণ হতাশ করলেন। তিনি জানালেন যে বৃটিশ সরকার নীতিগতভাবে ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নিয়েছেন এইমাত্র, কিন্তু তা কার্যকরী করার কথাই এখন ওঠে না, আর প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক যে কবে বসবে সে বিষয়েও তিনি কোন আশ্বাস দিতে নারাজ। ভারতীয় নেতারা শূন্য হাতে ফিরে এলেন।১৬ এবার গান্ধী ঘোষণা করলেন যে এবার তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেস অধিবেশন বসল লাহোরে, ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে, সভাপতি হলেন জওহরলাল নেহরু। ৩১শে অক্টোবরের বড়লাটের ঘোষণার পরবর্তী ঘটনাচক্র বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবে বলা হল যে, যেহেতু বৃটিশ সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, অতঃপর কংগ্রেস সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে ওই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যে স্বরাজ বলা হয়েছে, তার অর্থ বোঝাবে পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবেন, এবং অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেও সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেবেন। এছাড়া ভারতের সর্বত্র শুরু করা হবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন, করদান থেকে বিরতি প্রভৃতি। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রিতে ইরাবতী নদীর তীরে জওহরলাল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করলেন।

যদিও লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থিত হয়েছিল, তা অর্জন করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয় নি, এবং বয়কট ইত্যাদি

১৫। *ibid.*, 238-41.
১৬। Sitaramayya, I, 350 ff.

পুরাতন অস্ত্রগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। সুভাষ বসু একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে কংগ্রেসের কর্তব্য একটি সমান্তরাল সরকার স্থাপনের চেষ্টা করা এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের সংগঠন করা, কিন্তু এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।[১৭] লাহোর কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং জওহরলালের মত বামপন্থীদের দলে ভিড়িয়ে গান্ধী বামপন্থী ধারাটিকে দুর্বল করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীর মনোমত লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং সুভাষ বসু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়া হয়েছিল, যদিও ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁদের স্থান দেবার জন্য অনেকেই দাবি তুলেছিলেন। লাহোর কংগ্রেস পূর্বোক্ত মতিলাল নেহরু-সংবিধান পুরোদস্তুর বাতিল করে দেয়, অথচ ওই সংবিধানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলি খুবই যত্নসহকারে তৈরী করা হয়েছিল, এবং মুসলিম নেতাদের একটা প্রভাবশালী অংশ তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমগ্র সংবিধানটা বাতিল করার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছিল, আর উৎসাহের আধিক্যে কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়ে ফেলেছিল যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা অন্যভাবে সমাধান করা হবে, এবং ভবিষ্যৎ সংবিধানে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে এমন কিছু করা হবে না যেখানে সম্প্রদায়গুলির 'পূর্ণ' সমর্থন না থাকবে, এবং তাদের পূর্ণ সন্তোষ না উৎপাদিত হবে। এই জাতীয় বক্তব্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে এমন কোন পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব নয়, যা সংশ্লিষ্ট সকলকে 'পূর্ণ সন্তোষ' দিতে পারে।

১৭। Bose, II, 244.

আইন অমান্য আন্দোলন ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপসমূহ

১৯৩০ সাল থেকে নতুন করে চাঞ্চল্যের যুগের সৃষ্টি হয়। একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন এবং অপরদিকে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপ্তি তিরিশের দশকের প্রথমার্ধকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল। ২রা জানুয়ারী তারিখে (১৯৩০) কংগ্রেস ও ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ বৈঠকে বিভিন্ন আইনসভা ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা থেকে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আরও স্থির হয় যে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সারা ভারতে পূর্ণ-স্বরাজ দিবস পালন করা হবে এবং এই মর্মে একটি ইস্তাহারও জারি করা হয়।[১] এদিকে গান্ধী তাঁর নিজস্ব পত্রিকা মারফৎ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে নামমাত্র কয়েকটি শাসন সংস্কারের বিনিময়ে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার প্রস্তাব করেন।[২] বলাই বাহুল্য এই বিবৃতির সঙ্গে পূর্ণ-স্বরাজের ইস্তাহারের কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। আসলে পূর্ণ-স্বরাজ প্রস্তাবটি গান্ধী দায়ে পড়ে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এতে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না। বৃটিশ সরকার এটাকে উপেক্ষা করেছিল, এদিকে ঘটনাবলীও দেশের মধ্যে উত্তেজিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, এবং গান্ধীর ইচ্ছা থাকলেও, পুরাতন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার কোন উপায় ছিল না। দেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলছিল, সুভাষ বসু সহ এগারোজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়রা আদালতে উঠেছিল, এবং ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই অসংখ্য কংগ্রেস নেতা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী আইনসভাসমূহ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে ৩০ জন এবং প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ থেকে ১৪২ জন। ফেব্রুয়ারীর ১৪-১৬ তারিখে সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আর একটি বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলনের পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়।[৩]

১। Sitaramayya, I. 363-64.
২। *ibid.*, 366.
৩। *ibid.*, 368-69.

২রা মার্চ (১৯৩০) তারিখে গান্ধী ভাইসরয়কে একটি দীর্ঘ পত্রে জানান যে তিনি গুজরাটের সমুদ্র উপকূলে ডাণ্ডি নামক স্থানে লবণ প্রস্তুত করে, প্রকাশ্যে লবণ প্রস্তুতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে মনস্থ করেছেন, কিন্তু বড়লাট যদি ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এগারো দফা শাসন সংস্কার প্রস্তাব মেনে নেন, অন্তত পক্ষে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় রাজি থাকেন, তাহলে তিনি আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন না। কিন্তু বড়লাটের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হল না।৪ ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধী ৭৯ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ডাণ্ডি অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন, এবং ২৪ দিনে ২৪১ মাইল পথ পরিক্রমা করে ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হলেন ৫ই এপ্রিল তারিখে। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, এবং এই ঐতিহাসিক পদযাত্রার প্রচারমূল্য হয়েছিল প্রচণ্ড। গান্ধী বৃটিশ আইন ভঙ্গ করছেন এ সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, যে সকল স্থান দিয়ে গান্ধী গিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিলেন। গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান বৃহত্তর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে কাজ করেছিল। ৬ই এপ্রিল প্রাতঃকালে সমুদ্র থেকে স্নান করে এসে গান্ধী লবণ প্রস্তুত করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। এই ঘটনার পরই শুরু হল অজস্র আইন অমান্যের ঘটনা। বিভিন্ন নগরে ও গ্রামে লবণ প্রস্তুত করে লবণ আইন ভঙ্গ করা হল। কলকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহমূলক নিষিদ্ধ সাহিত্য পাঠ করে সিডিশন আইন অমান্য করলেন। বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশে ব্যাপকভাবে গাছ কেটে অরণ্য আইন লংঘন করা হল। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় করবন্ধ আন্দোলন শুরু হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ পাঠানরাও লালকোর্তা নেতা আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে নেমে পড়ল। আইন অমান্যকারী রাজবন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল ষাট হাজার।৫ এ ছাড়া শুরু হল পুরাতন বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন ও মাদক বর্জন আন্দোলন। ১০ই এপ্রিল তারিখে গান্ধী ভারতের নারী সমাজকে আন্দোলনের সামিল হতে আহ্বান জানালেন, এবং তার ফল হল বিস্ময়কর। তবে লবণ আইন অমান্য করাটাকেই গান্ধী প্রধান অস্ত্র হিসাবে নিয়েছিলেন। সুরাট জেলার ধারসানায় অবস্থিত লবণের গুদাম অভিযানের পরিকল্পনা অতঃপর গান্ধী নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে পূর্বাহ্নেই গ্রেপ্তার করা হয়, ৪ঠা মে তারিখে। গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর

৪। *ibid.*, 377.
৫। *ibid.*, 378; Fischer L., *Life of Gandhi* (1959) II, 15-16.

আব্বাস তায়েবজি লবণ সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব নিলেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হলে সরোজিনী নাইডু ধারসানা অভিযানের নেতৃত্ব করেন। আড়াই হাজার সত্যাগ্রহী অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। ২২শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত এই অভিযানের চিত্তাকর্ষক ও করুণ বিবরণ দিয়েছেন মার্কিণ সাংবাদিক ওয়েব মিলার যিনি সেই অহিংস সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।[৬] পুলিশের লাঠির সামনে অহিংস সত্যাগ্রহীর দল নির্ভয়ে, এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ প্রত্যাঘাত করেন নি। প্রথম দিনেই মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিলেন কমপক্ষে ৩২০ জন লোক, মারাও গিয়েছিলেন অনেকজন। ইমাম সাহেব, প্যারেলাল, মণিলাল গান্ধী ও সরোজিনী নাইডুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধারসানার ঘটনার এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন, আরও বহু স্থানে লবণের গুদামসমূহ দখলের অভিযান হয়, এবং সর্বক্ষেত্রেই যে সেই আন্দোলনসমূহ অহিংস ছিল তা নয়। বোম্বাই-এর নিকটবর্তী ওয়াদলাতে এই আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করেছিল।[৭] ওয়াদলাতে ১৫,০০০ সত্যাগ্রহী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে একলক্ষ লোকের একটি বিক্ষোভ মিছিল রাস্তায় বার হয়, পুলিশ তার গতিরোধ করলেও, শেষ পর্যন্ত তারা বিক্ষোভকারীদের সামনে থেকে চলে যায়।

এদিকে বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে সহিংস বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯৩০-এর এপ্রিলে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, এবং অন্যান্য জায়গার সঙ্গে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে সত্যকারের যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে, এবং একবার এই পদ্ধতি শুরু হয়ে গেলে, স্বাভাবিকভাবেই সারা ভারতই এইরকম বিচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠবে যার মোকাবিলা করা বৃটিশ শক্তির পক্ষে সম্ভবপর হবে না।[৮] তাঁরা যে বাহিনী গঠন করেন তার নাম ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। ১৮ই এপ্রিল তারিখে ওই বাহিনীর তরফ থেকে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একটি ইস্তাহার জারি করা হয়,[৯] এবং ওই দিনই রাত দশটার সময় চারটি দল যথাক্রমে পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অতিরিক্ত আর একটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ইউরোপীয় ক্লাব ধ্বংস ও টেলিফোন-টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দেবার

৬। Miller W, *I found no Peace,* (1936) 192 ff.
৭। *ibid.,* 202-6.
৮। Dutt, K, *Chittagong Armoury Raids, Reminiscences,* (1945) 7.
৯। পূর্ণ ইস্তাহারটি পাওয়া যাবে সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', (1955) 649.

উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইউরোপীয় ক্লাবে তখন লোক ছিল না কাজেই যে দলটি সেখানে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে বাকি তিনটি দলের সঙ্গে যোগ দেয়। অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জনের একটি দল পুলিশ অস্ত্রাগারটি লুণ্ঠন করে, এবং দ্বিতীয় অস্ত্রাগারটিও সহজে লুণ্ঠিত হয়। ঘটনার আকস্মিকতা ও দ্রুততায় আক্রমণকারীদের কোনরকম বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি বলা যায়। কিন্তু তাড়াহুড়োর ফলে একটি বিরাট ভুল হয়ে যায়, রাইফেল এবং লুইস গান প্রচুর পরিমাণে লুণ্ঠিত হলেও আক্রমণকারীরা গুলি নিয়ে যেতে ভুলে যায় যেগুলি অন্য একটি ঘরে ছিল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থাকে আগেই বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে পুলিশও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল প্রাথমিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে। চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা একটি জাহাজ থেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব জানিয়ে বেতারে খবর পাঠানো হয়েছিল স্থানীয় সরকারী তরফ থেকে। ২০শে এপ্রিল তারিখে সরকারী বাহিনী চট্টগ্রামে প্রবেশ করে, এদিকে বিপ্লবীরাও জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২২শে এপ্রিল তারিখে উভয় তরফের সশস্ত্র সংগ্রাম হয়, এবং সরকারী পক্ষের ৬৪ জন তাতে নিহত হয়, বিপ্লবীদের পক্ষে ১১ জন। বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এভাবে যুদ্ধ করা নিরর্থক হবে, তখন তাঁরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই অবস্থায় গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালাবার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবের যবনিকা পড়তে তখনও দেরি ছিল, সূর্য সেন প্রমুখ প্রথম সারির নেতাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি।[১০]

একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন এবং অপরদিকে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান-সমূহের উভয় সংকটে বৃটিশ সরকার পূর্ণোদ্যমে দমনমূলক নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯৩০-এর ১লা এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়, ২৭শে এপ্রিল তারিখে ১৯১০-এর প্রেস অর্ডিনান্সকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য। কংগ্রেসের সংগঠনসমূহকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়, জনসভা ও শোভা-যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়, সরকারী হিসাব অনুযায়ী বন্দীর সংখ্যা হয় ষাট হাজারেরও বেশি। এ ছাড়া আরও বহু সত্যাগ্রহীকে চুরি ইত্যাদি মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জেলে পোরা হয়।[১১] পুলিশের লাঠি ও গুলিতে হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ : সরকারী হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল মাসে নিহতের সংখ্যা ৫৫ এবং আহতের সংখ্যা ১১২ জন, মে মাসে নিহতের সংখ্যা ৫৬ এবং আহতের সংখ্যা ৩০৮। মাত্র দুমাসের হিসাব এই, এবং

১০। দ্রঃ অনন্তলাল সিংহ, 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' ও 'চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ' (১৯৬৮)।
১১। Bose, II. 258.

এ হিসাব সরকারী তরফ থেকে মিঃ হেগ আইনসভায় দিয়েছিলেন, এবং সকলেই জানেন যে সরকারী হিসাবে হতাহতের সংখ্যা কম করেই দেখানো হয়।১২ ২৩শে এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে একটি অহিংস সমাবেশের উপর সৈন্যবাহিনী বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় ফলে ৩৩ জন ব্যক্তি হতাহত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গাহরওয়াল সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র জন-সাধারণের উপর গুলি চালাতে অস্বীকৃত হলে তাদের কোর্ট মার্শাল করা হয়।১৩ ১৯৩০-এর ৩১শে মে তারিখে গঙ্গা সিং কম্বোজ নামক এক ভদ্রলোক টাঙ্গায় চেপে সপরিবারে যখন পেশোয়ার শহরের বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, জনৈক বৃটিশ ল্যান্স কর্পোরাল সেই গাড়ীতে গুলি ছোড়ে যাতে দুটি শিশু নিহত হয় এবং ভদ্রলোকের স্ত্রী গুরুতর আহত হন। শিশু দুটির দেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা বেরোয় তার উপর সামরিক বাহিনী পুনরায় গুলি চালায়, যার ফলে ৯ জন নিহত ও ১৮ জন গুরুতর আহত হয়।১৪ কংগ্রেসের তরফ থেকে এই শোচনীয় ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় বিঠলভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে, কিন্তু সেই তদন্ত কমিটিকে পেশোয়ার যেতে দেওয়া হয় নি। ধারসানার যে বিখ্যাত আন্দোলনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেখানে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর বৃটিশ সরকারের বর্বর উৎপীড়নের একটি নিখুঁত চিত্র ওয়েব মিলার ছাড়াও ম্যাডলিন স্লাডে অংকন করেছিলেন তাঁর রচিত একটি রিপোর্টে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০-এর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার ৬ই জুন সংখ্যায়। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইনও বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছিলেন।১৫ ৩১শে জুলাই তারিখে তিলকের মৃত্যুদিবসে বোম্বাই-এ একটি মিছিলের উপর পুলিশ প্রচণ্ড রকম লাঠিচার্জ করে এবং মদনমোহন মালব্য, ভি. জে. প্যাটেল, কমলা নেহরু, শ্রীমতী মনিবেন ও শ্রীমতী অমৃত কাউরকে গ্রেপ্তার করে।১৬ মাদ্রাজেও অনুরূপ ঘটনাসমূহ ঘটেছিল, এমন কি মিশনারীরাও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পান নি। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বিলাতী কাপড় বয়কট শুরু হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ ও কর্ণাটকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন, এবং এগুলির বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল, বহু লোকের জমি ও সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছিল। বাংলা-দেশের মেদিনীপুরে আদেশ জারি করা হয়েছিল যে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের

১২। Sitaramayya I, 410.
১৩। *ibid.*, 412, 420; Bose, II, 260-61.
১৪। *ibid.*, I, 412.
১৫। Hivale S, *Scholar-Gipsy*, 15, 44, 57.
১৬। Sitaramayya, I, 413.

আশ্রয় দিলে কারাদণ্ড হবে। কাঁথিতে লবণ প্রস্তুতকারীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। বরিশালে ৫০০ জন লোককে লাঠির ঘায়ে জখম করা হয়েছিল। তমলুকে সত্যাগ্রহীদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৭] ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) তারিখে হিজলী আটক শিবিরে বিচারাধীন নিরস্ত্র বন্দীদের উপর পুলিশ নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করে। এ বিষয়ে সরকার পরে একটি তদন্ত কমিটি বসিয়েছিল বিচারপতি মল্লিক ও ড্রুমণ্ডের নেতৃত্বে, এবং সেই কমিটি জানিয়েছিলেন যে বিনা প্ররোচনায় এই অপকর্ম সাধিত হয়েছিল, রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানোর কোন কারণ ছিল না।

চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের সংবাদ তরুণ সমাজকে নতুন করে বৈপ্লবিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মে মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে যুগান্তর দলের নেতারা একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করেন যাতে ছিল ইউরোপীয়দের হত্যা, দমদম বিমানবন্দর পুড়িয়ে দেওয়া, কলকাতায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া, বজবজের পেট্রোলের ডিপো নষ্ট করে দেওয়া, কলকাতার ট্রাম সার্ভিসকে বিকল করে দেওয়া, কলকাতার সঙ্গে অপরাপর জেলাগুলির টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, এবং ডিনামাইট ও গ্রেনেডের সাহায্যে রেল সেতুগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। ২৫শে আগস্ট তারিখে পুলিশ কমিশনার সার চার্লস টেগার্টের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু টেগার্ট বেঁচে যান। এরই সূত্র ধরে পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে, এবং যুগান্তর দলের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। ২৯শে আগস্ট আরিখে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের বিনয় বসু পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান এবং ঢাকার পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হডসনকে গুলি করেন। প্রথম জন নিহত হন, এবং দ্বিতীয় জন আহত হলেও বেঁচে যান। ওই একই বিনয় বসু, তাঁর অপর দুই বন্ধু বাদল ও দীনেশের সঙ্গে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাইটার্স বিলডিংসে প্রবেশ করে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ সিমসনকে গুলি করে হত্যা করেন। গুলির শব্দে মিঃ নেলসন এবং মিঃ টাউন-এণ্ড নামক দুজন পদস্থ কর্মচারী অলিন্দে বেরিয়ে এলে তাঁদেরও গুলি করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী অতঃপর তাঁদের ঘিরে ফেললে বাদল পটাশিয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বিনয় এবং দীনেশ নিজেদের মস্তকে গুলি করেন, বিনয় এর ফলে কদিন পরে মারা যান, দীনেশ গুপ্ত বেঁচে ওঠেন, পরে তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়।

১৭। *ibid.*, 415-18.

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও ১৯৩০ সালে বিক্ষিপ্তভাবে বিপ্লবী প্রচেষ্টা ঘটেছিল। এপ্রিল মাসে বোম্বাই-এ জি. আই. পি. রেলকর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে রেল স্টেশন ও সেতুসমূহ উড়িয়ে দেবার অসফল প্রচেষ্টা হয়। ২২শে জুলাই তারিখে ফার্গুসন কলেজে একটি ছাত্র সেখানে পরিদর্শনরত অস্থায়ী গভর্ণর আর্নেস্ট হটসনকে গুলি করেন। তাঁর বুক পকেটে একটি নোটবই ছিল, এবং সেই পকেটের বোতামে গিয়ে গুলিটি লাগায় তিনি বেঁচে যান। উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ও চন্দ্রশেখর আজাদের ক্রিয়াকলাপের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ৬ই জুলাই তারিখে (১৯৩০) চন্দ্রশেখরের দল একটি ডাকাতি করে ১৪,০০০ টাকা পায়। কিন্তু পরে দলটির অস্তিত্ব পুলিশ জানতে পারে এবং দিল্লীতে তাঁদের একটি বোমার কারখানা, যেখানে ৬,০০০ বোমার মালমসলা ছিল, আবিষ্কৃত হয়। চন্দ্রশেখর অতঃপর পাঞ্জাবে যান, এবং সেখানে বিপ্লবাত্মক কাজে লিপ্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা আনা হয়, দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং নয়াদিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। চন্দ্রশেখরের মাথার উপর ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯৩১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিশ কোন সূত্র থেকে সংবাদ পেয়ে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে চন্দ্রশেখরকে ঘিরে ফেলে। চন্দ্রশেখরের গুলিতে পুলিশের দুজন পদস্থ কর্মচারী তন্দণ্ডেই নিহত হয়, কিন্তু সংঘর্ষে তাঁরও মৃত্যু ঘটে। রাইফেলের গুলি এই মহাবিপ্লবীর সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুতে উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমাধি ঘটেছিল একথা বলা যায়।

১৯৩০-এর ৭ই জুন তারিখে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেই কমিশনের সুপারিশগুলি এতই অসন্তোষজনক ছিল যে আইনসভার অকংগ্রেসী নরমপন্থী সদস্যারা পর্যন্ত সেগুলি মেনে নিতে রাজি হননি। কংগ্রেস নেতারা জেলে ছিলেন, তবে তাঁদের এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং ১৫ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের তরফ থেকে জানানো হয় যে, কোন সমাধানই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বিযুক্ত হবার অধিকারের কথাকে স্বীকার না করে নেওয়া হয়। বৃটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করেনি। ভাইসরয় লর্ড আরউইন ১৯২৯-এর ৩১শে অক্টোবর যে গোলটেবিল বৈঠকের কথা বলেছিলেন, তারই সূত্র ধরে বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহবান করা হয়। ১২ই নভেম্বর তারিখে (১৯৩০) গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন সম্রাট স্বয়ং। এই বৈঠক চলেছিল ১৯৩১-এর ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড-এর সভাপতিত্বে। এতে মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি যোগদান

করেছিলেন, ১৬ জন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলি থেকে, ১৬ জন ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির তরফ থেকে, এবং বাকি ৫৭ জন বৃটিশ-ভারত থেকে। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দেয় নি। সংবিধানের মূলনীতি সম্পর্কে এই বৈঠকে মতৈক্য ঘটেছিল, স্থির হয়েছিল ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে, এবং সরকার বহুলাংশে আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কিন্তু গণ্ডোগোলের সূত্রপাত ঘটল আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, ও বিশেষ সুবিধাদি নিয়ে। সপ্রু এবং জয়াকর বললেন যে একত্রে কাজ করতে করতে সাম্প্রদায়িক বিরোধগুলি মিটে যাবে, অথবা মিটিয়ে ফেলার পথও নির্ধারিত করা সম্ভব হবে। বৃটিশ সরকারের তরফ থেকেও মোটামুটি এই বক্তব্য সমর্থিত হল, কিন্তু বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার ফজল-ই-হাসান বললেন যে মুসলমানদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে পাকাপাকি ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই হতে পারে না। তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে গেলেন মোহম্মদ শফি, মোহম্মদ আলি জিন্না, ফজলুল হক এবং সফাৎ আহমদ খান। শেষ কোপ দিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা এবং গান্ধীর প্রিয় ভাই মোহম্মদ আলি যিনি বললেন যে হিন্দু ও মুসলমান যে পরস্পরের শত্রু সেটা যেন ভুলে না যাওয়া হয়, এবং এও স্মরণ রাখা দরকার যে মুসলমান শুধু ভারতেই নেই, তাঁর আনুগত্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম জগতের প্রতি।১৮

১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড্ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে যে নীতি নির্ধারণ করলেন তার মূল কথা হল যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা-নির্ভর দায়িত্বশীল সরকার ভারতবাসীকে দেওয়া হবে, এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। শাসনযন্ত্রের কাঠামোটি হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়। সরকার কেন্দ্রে এবং প্রদেশে, আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়সমূহ বড়লাটের নিজস্ব এলাকায় থাকবে, এ ছাড়া জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বর্তাবে। এই নীতি নিঃসন্দেহে সাইমন কমিশনের সুপারিশসমূহের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমস্তটাই নির্ভর করছিল কংগ্রেসের মতিগতির উপরে, কারণ কংগ্রেসই বৃহত্তম জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এই বিষয়ে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া খুবই দ্রুত হয়েছিল। ২১শে জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ম্যাকডোনালডের এই নীতিকে অস্পষ্ট ও অকেজো আখ্যা দেওয়া হয়, এবং

১৮। Coupland R., *The Constitutional Problem* in India (1945), I, 117 ff.

একথাও ঘোষণা করা হয় যে এর দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হবে না।[১৯] এই বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলনে সরকারী দমন-নীতির একটা হিসাব-নিকাশ নেওয়া হয়, পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী তুলে ধরে।[২০] এদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সপ্রু ও শাস্ত্রীর কাছ থেকে টেলিগ্রাফ পান যে তাঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং তাঁদের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত কংগ্রেস যেন প্রস্তাব গ্রহণ স্থগিত রাখে। এঁরা উভয়েই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। তদনুসারে কংগ্রেস সরকারীভাবে তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। বৃটিশ সরকারও যাতে কংগ্রেসের নেতারা এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করতে পারেন সেই উদ্দেশে তাঁদের মুক্ত করে দেয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গোলটেবিল বৈঠক ফেরৎ ২৬ জন ভারতের মাটিতে পা দিয়েই কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখেন যে, বৃটিশ সরকার যেটুকু দিতে রাজি হয়েছে, তার সর্বোত্তম ফলটুকু যাতে বিফলে না যায় তা কংগ্রেসের দেখা উচিত। ওই দিনেই মতিলাল নেহেরু মারা গিয়েছিলেন। সপ্রু ও শাস্ত্রী ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং বলেন যে এ বিষয়ে গান্ধী খোলাখুলি বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করুন। তদনুসারে গান্ধী ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাটের সাক্ষাৎ চেয়ে একটি চিঠি লেখেন, এবং ১৬ই তারিখে একটি টেলিগ্রাম মারফৎ বড়লাটের আমন্ত্রণ আসে। কথা-বার্তা চালাবার, এবং এমন কি চুক্তিতে আসবার পুরো অধিকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট লর্ড আরউইনের দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক বসল। প্রতিদিনের বিবরণ সম্পর্কে গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অবহিত রাখতেন। ৫ই মার্চ তারিখে রাত আড়াইটের সময় গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্রের খসড়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের হাতে দিয়ে তাঁদের মতামত চাইলেন, চুক্তির ধারাগুলিকে মানা হবে, না সংশোধন করা হবে, না বাতিল করা হবে, সে বিষয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদের পূর্ণ মতামত চাইলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা চুক্তির ধারাগুলিকে মেনে নিলেন, যদিও পরে জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতিরা ঢোঁক গিলে বলেছিলেন যে তাঁদের এতে সমর্থন ছিল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রধান তিন সর্ত ছিল যে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হবে, গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাবিত মূল নীতি-সমূহের ভিত্তিতেই ভারতের সংবিধান তৈরী হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়,

১৯। Sitaramayya I, 424-25.
২০। *ibid.*, 425.

এবং ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ে আলোচনাকালে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হবে। এ ছাড়া আইন অমান্য আন্দোলনে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁদের বিষয় সরকার অনুসন্ধান চালাবে ও বিবেচনা করবে।২১ সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে রাজী হয়ে কংগ্রেস তার পূর্ব ঘোষিত পূর্ণ-স্বরাজের দাবি বাতিল করেছিল, আইন অমান্য আন্দোলন যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল তা মাঠে মারা গিয়েছিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৯শে মার্চ করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে। তার ছয়দিন আগে ২৩শে মার্চ তারিখে ভগৎ সিং ও তাঁর দুজন সহকর্মীর ফাঁসি হয়ে যায়। ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে বৈঠককালে গান্ধী যাতে ভগৎ সিং-এর প্রাণদণ্ড রহিত করার কথা বলেন সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু গান্ধী এ বিষয়ে কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি, যে জন্য কংগ্রেসের তরুণতর অংশ ভগৎ সিং ও তাঁর দুজন সহকর্মী রাজগুরু এবং সুখদেবের হত্যার জন্য গান্ধীকেই দায়ী করেছিলেন। অধিবেশনে যোগদান করতে আসার সময় একটি স্টেশনে গান্ধী ও প্যাটেলকে কালো পতাকা দেখানো হয়। এই অধিবেশনে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব তোলা হয়। গান্ধী এবং গান্ধীবাদীরা এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপে পড়ে প্রশংসাবাক্যটির সঙ্গে তাঁরা এইটুকু জুড়ে দেন যে কংগ্রেস কোন প্রকার হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিকে অনুমোদন করে না। এই নিয়ে প্রচণ্ড গণ্ডোগোল হয় এবং ওই কটি কথাকে বাদ দেবার জন্য দাবি ওঠে। এ ছাড়া ওই অধিবেশনের দু-একদিন আগেই ২৩শে থেকে ২৫শে মার্চ কানপুরে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল, সরকারী হিসাব অনুযায়ী সে দাঙ্গায় ১৬৬ জন নিহত এবং ৪৮০ জন আহত হয়েছিল। এই উভয় ঘটনার ছায়া কংগ্রেস অধিবেশনের উপর পড়েছিল।২২ এই অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি গৃহীত হল, গৃহীত যে হবেই সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। সভাপতির ভাষণে প্যাটেল পূর্ণস্বরাজের কথাকে এড়িয়ে গিয়ে আবার ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। এটাকে কংগ্রেসের পূর্বতন ঘোষিত নীতি থেকে নির্লজ্জ বিচ্যুতি বলে অনেকেই মনে করে-ছিলেন। কিন্তু গান্ধীর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। করাচী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগে জনসাধারণকে গান্ধীর বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। টিকিটের

২১। *ibid.*, 438-42.
২২। *ibid.*, 456-58.

মূল্য ছিল চার আনা করে, এবং তাতে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার পর ১লা এবং ২রা এপ্রিল তারিখে করাচীতে নতুন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসে, তাতে আসন্ন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কথা ওঠে। স্থির হয় যে পনের-কুড়িজন সদস্য গান্ধীর নেতৃত্বে লন্ডন যাত্রা করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে গান্ধী একাই যাবেন। এখানে আরও একটি মোক্ষম ভুল করা হল, কেননা তথ্যাবলী সম্পর্কে গান্ধীর বিশেষ কোন ধারণা ছিল না, ভারতীয় পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তিনি জানতেন না, এই কারণেই কিছু দক্ষ সহযোগীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভরসা করে গান্ধী গিয়েছিলেন সেই ঈশ্বরই গান্ধীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেস যে সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী সেটাই প্রমাণ করতে পারেন নি। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিই ভারতে প্রধান, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এটাই প্রতিভাত হয়েছিল।

কানপুরের ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটি সুস্পষ্ট পরিচায়ক ছিল, এবং গান্ধী এতে খুবই বিড়ম্বিত বোধ করছিলেন, এবং গোলটেবিল বৈঠকে যাবার আগে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কর্মসূচী প্রণয়ন করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে যদি মুসলমানেরা নূতন সংবিধানে প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর যুক্তভাবে কোন দাবি উপস্থাপিত করে তাহলে তিনি তা মেনে নেবেন। তাঁর এই ঘোষণার ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানেরা প্রশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল।[২৩] তারা বুঝে গিয়েছিল যে আসল চাবিকাঠিটি তাদেরই হাতে। ১৯৩১-এর ২০শে জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়ার একটি পরিকল্পনা পেশ করে যাতে যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থা এবং যে সকল প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেই সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়।[২৪] কিন্তু এ পরিকল্পনা কোন কাজে আসেনি। ২৯শে আগস্ট তারিখে গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য যাত্রা করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়, এবং গান্ধী গিয়ে পৌঁছান ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, সব কিছুই গান্ধী উপেক্ষা করে বলে বসলেন যে এই মুহূর্তে, পরিপূর্ণভাবে, ভারতবর্ষে, কেন্দ্রে ও প্রদেশে, দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করতে হবে, অর্থ, সৈন্য ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে যে

২৩। Bose, II, 299-301.
২৪। Sitaramayya I, 480-81.

সরকারের পূর্ণ অধিকার থাকবে, যে সরকারের উপর বড়লাটের শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রাধান্যই থাকবে, আর কিছু নয়। বলাই বাহুল্য, এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়। এরপর পূর্বে ঘোষিত ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের জন্য সংবিধান রচনার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু র‍্যামজে ম্যাকডোনালড জানান যে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কার্যত কিছু করা সম্ভবপর নয়। এদিকে মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের একাংশ, এবং ভারতের ইউরোপীয় বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা একটি চুক্তিতে এসেছিলেন, যে চুক্তি হিন্দু ও শিখদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল, কেননা সেই চুক্তিতে প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আসন সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্থান যৎসামান্যই ছিল। গান্ধী বললেন যে সংবিধান রচনার ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সংবিধান রচিত হয়ে যাবার পর কার্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়া হয়ে যাবে, এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে একটি বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনালের মারফৎ তার সমাধান করা হবে। এই প্রস্তাবটিকে গ্রহণযোগ্য করা যেত যদি গান্ধী প্রমাণ করতে পারতেন যে কংগ্রেসই একমাত্র ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দল, যে দলে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আছেন, এবং গোলটেবিল বৈঠকে যাঁরা প্রতিনিধিরূপে এসেছেন কার্যত তাঁরা বিচ্ছিন্নতাকামী অল্পসংখ্যক মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। গান্ধীর সঙ্গে দু-চারজন ওয়াকিবহাল লোক থাকলে বিষয়টিকে ভালভাবে তুলে ধরা যেত, কিন্তু সদিচ্ছা ও বাগ্মিতা ছাড়া গান্ধীর আর কোন সম্বল ছিল না, তথ্যের খুঁটিনাটি তিনি জানতেন না, ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। ১৯ই ডিসেম্বর তারিখে গোলটেবিল বৈঠক শেষ হল, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধী শূন্য হাতে ফিরে এলেন। তিনি ফিরে এলে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে অভিনন্দিত করা হয়েছিল যেটা কংগ্রেসী নেতাদের বাস্তবতাবোধের অভাবকেই সূচিত করে।

১৯৩১-এর বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলির কথা অতঃপর উল্লেখ করা প্রয়োজন। মূলত বাংলাদেশই এই বছর বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র ছিল। ৭ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি, ২৭শে জুলাই তারিখে মিঃ সিমসন যিনি দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন, ৩০শে আগস্ট তারিখে চট্টগ্রামের ইনস্পেক্টর আসানুল্লা এবং ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস নিহত হন। শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন দুটি মেয়ে, শান্তি ও সুনীতি। এছাড়া ঢাকার কমিশনার মিঃ ক্যাসেলস, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নো এবং

ওখানকার ইউরোপীয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ ভিলার্স গুলিতে আহত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের নেতা সূর্য সেন তখনও মুক্ত ছিলেন, যদিও তাঁর দলের অনেকে ধরা পড়েছিল। ১৯৩১-এর জুন মাসে তাঁরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিদের জেল থেকে উদ্ধার করার জন্য ডিনামাইট দিয়ে জেলখানা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। গোপনে জেলের অভ্যন্তরে ডিনামাইট ও অপরাপর বিস্ফোরক দ্রব্য প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্তটি ফেঁসে যায়।

২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩১) তারিখে গান্ধী ফিরে আসার পরই পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির একটি সর্ত ছিল যে আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে যে সব ব্যক্তি অকারণে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁদের বিষয়ে অনুসন্ধান করা, বিশেষ করে সুরাট জেলার কয়েকটি ঘটনা, কিন্তু এই সর্তটি পরবর্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন পালন করেন নি। এই কারণেই আন্দোলনকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা হল। উত্তরপ্রদেশে পুনরায় খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হল, জওহরলাল, পুরুষোত্তমদাস টণ্ডন প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফুর খান পরিচালিত অহিংস খুদাই খিদমৎগার বা লালকোর্তা দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, এবং তাঁর ভাই সহ কয়েক সহস্র পাঠান কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। বাংলাদেশেও সরকারী দমননীতি চরমে উঠল। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি টেলিগ্রাম করলেন, বড়লাট সাক্ষাৎকার নামঞ্জুর করলেন এবং জানালেন যে বাংলা, সীমান্তপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে সরকারী বলপ্রয়োগের নীতি সম্পূর্ণভাবে সঠিক।২৫ ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধী বড়লাটকে পুনরায় তার করে জানালেন যে উত্তরপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে জনতার তরফ থেকে কোন হিংসাত্মক কাজ করা হয় নি অথচ, তাদের উপর সহিংস পীড়ননীতি চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা যে সকল সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে এই টেলিগ্রামে বলা হয় যে বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের তিনি নিন্দা করেন, কিন্তু বেঙ্গল অর্ডিনান্সের মারফৎ সরকার যে হিংসাত্মক দমননীতির আশ্রয় নিয়েছে সেটাও সমধিক নিন্দনীয়, এবং এই সকল বিষয়ে যেহেতু সরকার তাঁদের সহযোগিতা চাইলেন না তখন আইন অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করা ভিন্ন উপায় নেই।২৬ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও ইতিমধ্যে আইন অমান্য

২৫। *ibid.*, 511-12.
২৬। *ibid.*, 512-14.

আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।২৭ ২রা জানুয়ারী (১৯৩২) তারিখে পাল্টা একটি টেলিগ্রামে বড়লাট জানান যে আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকির মধ্যে তিনি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনাটা চিন্তাও করতে পারেন না। ৩রা জানুয়ারী তারিখে গান্ধী তাঁর তৃতীয় এবং শেষ টেলিগ্রামে জানান যে তাঁর সঙ্গে লর্ড আরউইনের কথাবার্তা আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন অবস্থাতেই হয়েছিল, কাজেই যদি বড়লাট আলোচনার সূত্র বন্ধ করে দেন, আইন অমান্য আন্দোলন চলবেই।২৮

৪ঠা জানুয়ারী তারিখে সরকার-তরফ থেকে সরকারী দমননীতির সমর্থনে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিটি ছিল মিথ্যায় পরিপূর্ণ, এমন কি সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলি পর্যন্ত তা হজম করতে পারে নি। গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের ব্যবহার যে কোন বিবেকবান ব্যক্তির কাছেই পীড়াদায়ক ঠেকেছিল। 'নিউ লীডার' পত্রিকার লেখক মিঃ ব্রেলস-ফোর্ড এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, যখন গান্ধীকে লণ্ডনে ডাকা হচ্ছে আগামীকাল ভারতবাসী কি অধিকার ভোগ করবে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য, সেই একই সময় সেই গান্ধীকেই আজকের ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তাঁর বক্তব্য শুনতে অস্বীকার করা হচ্ছে, এটা খুবই হাস্যকর ও পরিতাপজনক। ভেরিয়ার এলুইন, যিনি ছিলেন মুখ্যত নৃতত্ত্ববিদ, সমগ্র বিষয়টিকে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলীকে, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলেছিলেন যে সরকারের ভূমিকা সকল ক্ষেত্রেই ছিল নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত, সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে তা গভীরতর করার দায়িত্বই যেন সরকারের উপর বর্তেছিল।২৯

সরকার ইতিমধ্যেই চারটি নূতন দমনমূলক অর্ডিনান্স জারি করেছিল। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই গান্ধী এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিপূর্বে জওহরলাল, খান সাহেব প্রভৃতি অনেক নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এছাড়া নেতৃস্থানীয় নন, এমন নব্বই হাজার লোককে জেলে পোরা হয়েছিল, এবং তাঁদের সঙ্গে অমানুষিক দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল।৩০ গণআন্দোলন দমন করার জন্য যত্রতত্র লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ ছাড়াও, বিভিন্ন সংস্থার ব্যাঙ্ক জামানত বাজেয়াপ্ত করা (যেমন বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট গুজরাট সভার তিরিশ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল), গণ-

২৭। *ibid.*, 516
২৮। *ibid.*, 518
২৯। Elwin V., *Truth about India*, 34 ff.
৩০। Sitaramayya I, 528; Bose, II, 378.

শাস্তি (যেমন পাড়ায় পাড়ায় পিউনিটিভ ট্যাক্স ইত্যাদি), গ্রেপ্তারী, সম্পত্তি জমি গবাদিপশু-তৈজসপত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণ, মহিলা ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার, বেত্রাঘাত প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সরকারের হোম মেম্বার মিঃ হেগ আইনসভায় জানিয়েছিলেন যে একমাত্র ১৯৩২ সালের গোড়াতেই বাংলাদেশে সতেরবার, উত্তরপ্রদেশে সাতবার, বিহারে তিনবার, উড়িষ্যায় তিনবার, মাদ্রাজে একবার ও সীমান্ত প্রদেশে একবার গুলি চালানো হয়েছিল। শুধুমাত্র বোম্বাইতেই গুলির আঘাতে নিহত হয়েছিল ৩৪ জন, আহত হয়েছিল ৯১ জন।৩১

কংগ্রেসের তরফ থেকে ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানানো হয়, এবং সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সভাপতি মদনমোহন মালব্য যমুনা ব্রীজের দিক থেকে দলবল সহ দিল্লীতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় ২২শে এপ্রিল তারিখে। রেল স্টেশনগুলিতে প্রচুর পুলিশের পাহারা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পথে দেড় হাজার প্রতিনিধি দিল্লীতে উপস্থিত হন। যদিও প্রত্যেকটি বাড়ী এঁদের সন্ধানে সার্চ করা হয়েছিল তথাপি ২৩শে এপ্রিল সাবজেক্টস কমিটির বৈঠক ঠিকই বসে এবং সেখানে রচিত পাঁচ দফা প্রস্তাব প্রতিনিধিদের দিয়ে স্বাক্ষরিত করানো হয়। ২৪শে এপ্রিল তারিখে দিল্লী শহরে হরতাল ঘোষিত হয়, এবং যদিও পুলিশ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সন্ধানে সারা শহরে তল্লাসী চালাচ্ছিল, তৎসত্ত্বেও চাঁদনীচকের বড় ঘড়ির নীচে পাঁচশো প্রতিনিধি সমবেত হতে পেরেছিলেন। মালব্যের অনুপস্থিতিতে শেঠ রণছোড়দাস সভাপতিত্ব করেন, এবং দশ মিনিটের এই অধিবেশনে সাবজেক্ট কমিটি রচিত ইস্তাহারের মুদ্রিত একটি কপি পাঠ করা হয়। তারপরেই পুলিশ এসে সকলকে গ্রেপ্তার করে।

আইন অমান্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বিলাতের ইণ্ডিয়া লীগ একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় যার সদস্য ছিলেন শ্রীমতী মণিকা হোয়াটলে, শ্রীমতী এলেন উইলকিনসন, লিওনার্ড ম্যাটার্স এবং ভি. কে. কৃষ্ণমেনন। ১৭ই আগস্ট তারিখে এই প্রতিনিধিদল এসেছিলেন এবং ৭ই নভেম্বর তাঁরা ফিরে যান। একমাত্র মধ্যপ্রদেশ বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলই তাঁরা পরিভ্রমণ করেন, এবং তাঁদের অনুসন্ধানের ফল একটি রিপোর্টে প্রকাশ করেন যা ডেলিগেশন রিপোর্ট নামে বিখ্যাত। এই রিপোর্টে ১৯৩২ সালে সরকার যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছিল তার নিখুঁত বিবরণ আছে। ওই রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকার

৩১। Bose II, 341-42

করে বড়লাট লর্ড উইলিংডন শুধু ভুলই করেন নি, সকল অশান্তির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন।৩২ যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা সরকারকে এতাবৎকাল সঙ্গতিপূর্ণভাবেই সমর্থন করে এসেছিলেন তাঁদের কথাও অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।৩৩ সরকার যে বহু পূর্বে থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল হিজলী বন্দীশিবিরে গুলিবর্ষণ ও ফরেস্টার-প্যাটন মামলাই তার প্রমাণ যার মধ্য দিয়ে সরকারের অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে ফরেস্টার-প্যাটন ছিলেন একজন স্কটিশ মিশনারী, আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর কোন যোগাযোগই ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা করা হয়েছিল।৩৪ ডেলিগেশন রিপোর্টে শুধু উৎপীড়নের ঘটনাবলীই স্থান পায় নি, জেল ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের ভূমিকা, পুলিশ-প্রশাসন প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

ওই ডেলিগেশন বিপোর্টের ভূমিকা লিখেছিলেন বাট্রান্ড রাসেল, যেখানে তিনি বলেছিলেন . "জার্মানীতে নাৎসীদেব অপকর্ম সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই। সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিবেকবান ব্যক্তিরা সেগুলির উপর ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের খুব কম লোকই খবর রাখেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার যে অপকর্ম করছে তা গুরুত্বের দিক থেকে ওগুলির চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।" এরপর রিপোর্টে দশটি কুখ্যাত অর্ডিনান্স এবং তজ্জনিত পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে।৩৫ এই অর্ডিনান্সগুলি কিভাবে ব্যাপক গণহত্যার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তার বহু নজীর উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই রিপোর্টের একটি অংশে শুধু নারী নিগ্রহেরই বিস্তৃত বিবরণ আছে—প্রহার, পীড়ন, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ, সেই বীভৎস ঘটনাগুলির উল্লেখ এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। এরপর আছে দেশ জোড়া পুলিশী সন্ত্রাসের কাহিনী, জনতার উপর গুলিবর্ষণের ঘটনাবলী, অনুসন্ধানের নামে গৃহে গৃহে উৎপীড়নের মর্মস্পর্শী চিত্র, থানার লক-আপে প্রহার, এবং অপরাপর দমন-নীতি। এরপর আছে জেল ব্যবস্থা—শিশু, নাবালক ও নারী বন্দীদের কথা, তাদের উপর জেলখানায় পীড়ন, ল্যাট্রিন-প্যারেড (ডেলিগেশনের সদস্যরা বুঝতে পারেন নি জিনিসটা কি, এটি হচ্ছে বন্দীদের প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে না দেওয়া), জেলখানায় শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নেওয়া, গণ-গ্রেপ্তারী, রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানো, নারী শিবির, ডাণ্ডাবেড়ী,

---

৩২। *Delegation Report*, 29
৩৩। *ibid.*, 33
৩৪। *ibid*, 56
৩৫। *ibid*, 32, 56 59, 142-44.

নির্জন সেল ও প্রহার ইত্যাদি। রিপোর্টের একটা অংশে আছে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণের কাহিনী, আর তাছাড়া আছে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে পুলিশের বর্বর ভূমিকার কথা—কিভাবে পুলিশ ক্যাম্পগুলি বসানো হয়েছিল, গ্রামগুলি ঘিরে ফেলা হয়েছিল, কিভাবে তারা ঘরে ঘরে লুঠতরাজ চালিয়েছিল ইত্যাদি নানা ঘটনা। রিপোর্টে প্রত্যেকটি বিষয় অজস্র ঘটনার উল্লেখের দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে, ১৯৩২ সালকে জীবন্ত-ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আর্থার অসবোর্ন-এর একটি বই থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে যেখানে একজন ইংরাজ কর্মচারী অসবোর্নকে গর্ব করে বলেছিল যে তার এলাকায় আন্দোলন বন্ধ হতে চব্বিশ ঘণ্টাই যথেষ্ট। কিভাবে তা সম্ভব হবে এ প্রশ্ন অসবোর্ন তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল, 'আমার পুলিশ যখন গ্রামে যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে একটিও কুমারী থাকবে না, এবং একটি সিকিও (চার আনা মূল্যের মুদ্রা) গ্রাম ঝাঁট দিলে পাওয়া যাবে না।৩৬

পাশাপাশি যে বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলছিল সেগুলির কথায় এবারে আসা যাক। ১৯৩২-এর ১লা এপ্রিল তারিখে কাশীর নিকট ডাফরিন সেতু ধ্বংস করার সময় পাঁচজন বিপ্লবী ধরা পড়েন। ১৬ই জুলাই কানপুরের বৃষ্টল হোটেলে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দিল্লীতে ১লা ফেব্রুয়ারী লোথিয়ান কমিটির ইংরাজ সদস্যবাহী একটি বিশেষ ট্রেণের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। আসলে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যুর পরই উত্তরাঞ্চলে বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপে ভাঁটা পড়েছিল। বাংলাদেশে কিন্তু বিপ্লব আন্দোলন ১৯৩২ সালেও তুঙ্গে ছিল। বিপ্লবীদের হাতে যাঁরা যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের তালিকা: ৩০শে এপ্রিল, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস; ২৭শে জুন, মুন্সীগঞ্জের সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন; ২৯শে জুলাই, ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিশন। এছাড়া বীণা দাস গুলি করেছিলেন মিঃ অ্যাণ্ডারসনকে যিনি কুখ্যাত কালা কানুনের নির্মাতা, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসন, ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ গ্রাসবি এবং রাজশাহী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিউকের উপর আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু তাঁরাও বেঁচে গিয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা ১৯৩২-এ শেষ হয়েছিল, এবং এই মামলায় চোদ্দজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক বিপ্লবী ধলঘাট থানার অন্তর্গত পাটিয়া গ্রামে আত্মগোপন করে ছিলেন। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে ১৪ই জুন তারিখে একটি বাহিনী যে বাড়ীতে তাঁরা

৩৬। *ibid.*, 413.

ছিলেন সেটিকে ঘিরে ফেলে। তখন দুতরফে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার সময় ক্যামেরণ নিহত হয়। দুজন বিপ্লবীও এই সংঘর্ষে মারা যান, কিন্তু সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সহ পলায়নে সক্ষম হন। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ইউরোপীয় ক্লাব আক্রান্ত হয়, যার ফলে একজন মহিলা নিহত হয় এবং তেরজন ইউরোপীয় গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রীতিলতা রিভলবারের গুলিতে আহত হয়ে পড়েন, এবং গ্রেপ্তারী এড়ানোর জন্য পটেশিয়াম সাইনাইডের দ্বারা আত্মহত্যা করেন। বাকি সকলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

একদিকে যখন আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, বাংলাদেশে আইন অমান্য ছাড়াও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ পুরোদমে চলছে, নেতৃবর্গ ও নব্বই হাজার মানুষের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ যখন মুখর, এহেন পরিস্থিতির মধ্যে গান্ধী অকস্মাৎ বেঁকে বসলেন। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার মতই, এখানেও একটি গৌণ বিষয়কে বড় করে তুলে ধরে গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করে বসলেন, যার ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হল যা আইন অমান্য আন্দোলনকে তুঙ্গীভাব থেকে একেবারে নিম্নতম ধাপে নামিয়ে আনল। ১৭ই আগস্ট (১৯৩২) তারিখে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বিখ্যাত কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমান, শিখ ও ইউরোপীয়দের জন্য বিশেষ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হল। আম্বেদকর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। সেটা না মেনে নেওয়া হলেও, অনুন্নত শ্রেণীর জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ (মোট ৭১টি আসন) করা হয়েছিল, এবং এও বলা হয়েছিল যে তারা সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনগুলিতেও ভোটদানের অধিকারী থাকবে।[৩৭] এর মধে ভেদনীতির গন্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি সমাধানের অতীত ছিল না, কার্যত একটা সমাধানও হয়েছিল, যা আমরা পরে দেখব। কিন্তু গান্ধী বিষয়টিকে ঘোরাল করে তুলে ঘোষণা করলেন যে এর প্রতিবাদে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করবেন, এবং ১৮ই আগস্ট তারিখে তা তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন।[৩৮]

এর ফলে আইন অমান্য আন্দোলন চাপা পড়ে গেল, 'মহাত্মার' জীবনরক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। বিভিন্ন মহল থেকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধসহ অসংখ্য চিঠি গান্ধীর কাছে আসতে লাগল। মদনমোহন মালব্য

৩৭। Gwyer, Speeches and Documents on the Indian Constitution, I, 261-65.
৩৮। Sitaramayya I, 542-43.

ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। স্থির হল যে অনুন্নত শ্রেণী পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বা সংরক্ষিত আসন কাগজে কলমে নেবে না, নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু ও তপশিলী ভাগ সংবিধানে থাকবে না, কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৪৮টি আসনে অনুন্নত শ্রেণী থেকে প্রার্থী দিতে হবে, এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৮ শতাংশ অনুন্নত শ্রেণীর সদস্য থাকবে। এই ব্যবস্থা পুণা চুক্তি নামে খ্যাত।৩৯ কার্যত একটি লোক দেখানো বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণীর অভিন্নতা প্রদর্শনের খাতিরে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড অনুন্নত শ্রেণীকে যা দিয়েছিল তার দ্বিগুণ দেওয়া হল, এবং এতে গান্ধীর মুখরক্ষা হওয়া ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নি। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধী তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন। জওহরলাল যথারীতি এই প্রসঙ্গে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, এবং একথাও বলেছিলেন যে একটি গৌণ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি করেছিলেন,৪০ কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগের মতই গান্ধীর মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করতে অক্ষম হন। গান্ধীর হৃদয় আইন অমান্য আন্দোলন থেকে ইতিমধ্যেই সরে এসেছিল।

তৃতীয় এবং শেষ গোলটেবিল বৈঠক বসেছিল ১৯৩২-এর ১৭ই নভেম্বর তারিখে, এবং কংগ্রেস থেকে এই বৈঠকে কোন প্রতিনিধি যায় নি। এই বৈঠকের সমাপ্তি ঘটেছিল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পরে শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তা পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়েছিল। এই বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি, পূর্বতন দুই বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহেরই অনুসৃতি ছিল, এবং ভবিষ্যৎ ভারত শাসন আইনের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করেছিল।

১৯৩৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস সর্বত্রই আগ্রহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে যে সকল মিছিল বেরিয়েছিল পুলিশ সেগুলির উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছিল, এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তার করেছিল। হুগলীর বদনগঞ্জে পুলিশ মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালিয়েছিল। গুজরাটের বোরসাদে একটি মহিলা মিছিল পরিচালনাকালে গান্ধীর স্ত্রী শ্রীমতী কস্তুরবা গ্রেপ্তার হন এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর ছমাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীর আরও একটি বড় ঘটনা চট্টগ্রাম বিপ্লবের নেতা সূর্য সেনের গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামের গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করে থাকাকালীন তিনজন সঙ্গীসহ তিনি ধৃত হন, এবং তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেও বিক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশে

৩৯। Gwyer, 265-66.
৪০। *Nehru on Gandhi,* 72-73.

বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চলেছিল। ১০ই মার্চ তারিখে চন্দননগরে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এবং বৃটিশ পুলিশের তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল, এবং পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে বিপ্লবীরা পলায়নে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩১শে মার্চ তারিখে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। সভাপতি মদনমোহন মালব্য এবং নেহরু-জননী স্বরূপরাণী অপরাপর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কলকাতায় আসার পথে গ্রেপ্তার হন। সরকারী নিষেধ অমান্য করেও এক সহস্র প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। পুলিশের প্রবল লাঠিবৃষ্টির মাঝখানেও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘটনাস্থল থেকেই পুলিশ ৪০ জন মহিলা সহ ২৫০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীমতী সেনগুপ্তের ছমাসের কারাদণ্ড হয়। বস্তুত ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে অনুন্নত শ্রেণীর আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে গান্ধী বিগড়ে গেলেও আইন অমান্য আন্দোলন তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। মালব্য বলেছিলেন সরকার ছ সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেসের আন্দোলনকে খতম করে দেবে বলে শাসিয়েছিল, কিন্তু পনের মাস পার হয়ে যাচ্ছে, নেতৃবর্গ সহ ১২০,০০০ লোককে গ্রেপ্তার করে কিছুই করতে পারে নি, আগামী পনের মাসেও সরকার কিছু করতে পারবে না। এর উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, একথা যিনি বলেছেন তিনি কোন মাথা-গরম তরুণ নন, কংগ্রেসের সবচেয়ে বৃদ্ধ এবং নরমপন্থী নেতা, এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও, অর্থ প্রদানকারী এবং সংগঠকদের ব্যাপক গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও, আইন অমান্য আন্দোলনের গতি অসন্তোষজনক ছিল না।[৪১]

কিন্তু শেষ কোপ মারলেন গান্ধী ৮ই মে তারিখে। তিনি বললেন যে আত্মশুদ্ধি এবং হরিজনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি ২১ দিন অনশন করবেন, এবং এই উদ্দেশ্যে ছয় সপ্তাহ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হোক, কেননা বাহ্যিক ব্যাপারে তাঁর মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখলে অনশনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীর গোপনীয়তা নাকি আন্দোলনের ক্ষতি করেছে। প্রচুর সংখ্যক লোকের কারাবরণ বা উৎপীড়ন সহ্য করাটাই বড় কথা নয়, দেখতে হবে লোকগুলির গুণগত উৎকর্ষ কতখানি, এবং সর্বোপরি তাঁর অনশনের সময়ে যাতে লোকের মনে উদ্বেগ না বাড়ে তজ্জন্যই আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত

৪১। Bose, II, 361-62.

রাখা দরকার। এই সঙ্গে গান্ধী বড়লাটকে জানালেন যে সরকার আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিক, এবং তিনি যেন গান্ধীর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসেন। লর্ড উইলিংডন কিন্তু তাঁর দুটি আবেদনই প্রত্যাখ্যান করলেন।৪২

অতঃপর আইন অমান্য আন্দোলন প্রথমে ছয় সপ্তাহ এবং পরে আরও ছয় সপ্তাহ স্থগিত রাখা হল। অনশনের পর সুস্থ হয়ে গান্ধী ১২ই জুলাই তারিখে পুণায় একটি কংগ্রেস সম্মেলন আহ্বান করলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য। এখানে স্থির হল যে গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার চাইবেন, কিন্তু ১৭ই জুলাই তারিখে বড়লাট সাক্ষাৎকারে পুনরায় অস্বীকৃতি জানালেন। এ অপমান হজম করা ভিন্ন কংগ্রেসের আর কোন উপায় ছিল না। সরকারীভাবে কংগ্রেস গণ-আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সরে এল, তবে একথা বলা হল যে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা চলতে পারে। এই ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন ভাইসরয়ের গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অস্বীকৃতির প্রতিবাদ হিসাবেই করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নরিম্যান বলেছিলেন, স্বাধীনতা চুলোয় গেল. বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো, একবার গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বড়লাট রাজি হবেন কি হবেন না. এরই জন্য সত্যাগ্রহ, জীবনমরণ পণ।৪৩ জওহরলালও যথারীতি প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধী শুরু করার মনস্থ করলেন ১লা আগস্ট (১৯৩৩) তারিখে, কিন্তু তার পূর্বদিনেই তিনি ৩৪ জন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। ৪ঠা আগস্ট তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং বলা হল যে তিনি পুণার বাইরে যাবেন না। এই আইন ভঙ্গ করার ফলে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হল। গান্ধীর দেখাদেখি আরও অনেকে ব্যক্তিগত আইন অমান্য করে জেলে গেলেন।৪৪ জেলে গান্ধী সুযোগ-সুবিধা নিতে অস্বীকার করলেন, এবং ১৬ই আগস্ট থেকে অকস্মাৎ অনশন শুরু করলেন যার কারণ নেহরুর পর্যন্ত বোধগম্য হয় নি।৪৫ গান্ধীর শরীর খুব খারাপ হয়ে যেতে ২৩শে আগস্ট তারিখে তাঁকে নিঃসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে আসে, এবং ১৯৩৪-এর ১৬ই জানুয়ারী তারিখে বিহারের সর্বনাশা ভূমিকম্পের ঘটনার পর তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

৪২। Sitaramayya, I, 560-61.
৪৩। Bose, II, 367-68.
৪৪। Sitaramayya, I, 563.
৪৫। *Nehru on Gandhi*, 84.

ভারতীয় রাজনীতি (১৯৩৪-৩৯)

আইন অমান্য আন্দোলন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবার পর কংগ্রেসের সামনে একটি অনিশ্চিত অবস্থা দেখা গেল। গান্ধী বোধ হয় নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন যখন পূর্ণ গতিতে চলছিল, তখন সেই গতিবেগকে ব্যাহত করে এবং শেষ পর্যন্ত তা স্থগিত করে দিয়ে কাজটা ভাল হয় নি। কিন্তু সর্বনাশ একবার ঘটে গেলে আর কিছুই করার থাকে না। ১৯৩৪-এর ২রা এপ্রিল তারিখে গান্ধী একটি বিবৃতিতে জানালেন যে অতঃপর কংগ্রেসকর্মীরা যেন গঠনমূলক কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। কার্যত এটা একটা হতাশার অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এদিকে অপর কয়েকজন নেতা পূর্বতন স্বরাজ্য পার্টির পুনর্জাগরণ ঘটাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন যে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হোক দুটি প্রধান দাবির ভিত্তিতে। প্রথমটি হচ্ছে দমনমূলক আইন-সমূহ প্রত্যাহারের দাবি, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধান বিষয়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, যা শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রত্যাহারের দাবি। স্বরাজ্য দলের এই পুনর্জাগরণের সিদ্ধান্তে গান্ধী শুধু সমর্থনই জানালেন না, সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে এখন প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীদেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত আইনসভা, এবং এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর ২রা এপ্রিলের বিবৃতি সংশোধন করে ৭ই এপ্রিল আর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। মে মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হল পাটনায়, যেখানে আইন-সভায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং সরকারীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হল। কংগ্রেসের মতিগতির পরিবর্তন দেখে সরকার বাংলাদেশ ও সীমান্তপ্রদেশ ছাড়া অপর সকল স্থান থেকে কংগ্রেস সংগঠন-সমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল।

ওয়ার্কিং কমিটির পাটনা বৈঠকে একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড তৈরী করা হয়েছিল ম্যাকডোনাল্ডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গটি সম্পর্কে মতামত স্থির করার জন্য। ওই বাঁটোয়ারা কার্যত ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করেছিল, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ

হিন্দুদের প্রতি নিদারুণ অবিচার করেছিল। পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা এবং হিন্দু ছাড়া সকল সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাকামী এবং জাতীয়তাবিরোধী শক্তিগুলিকেই মদত দেওয়া হয়েছিল, এবং ক্ষমতা ও অধিকারের সিংহভাগটা এদেরই হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, এই কারণেই মুসলমানসহ অপরাপর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। ইতিমধ্যেই জল অনেক ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বাধিক অংশই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভক্ত হয়ে গিয়েছিল, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের সমর্থক ছিল না বললেই চলে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড এই অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি গ্রহণ করে, এবং এতে মদনমোহন মালব্য এবং এম. এস. অ্যানি প্রবল আপত্তি জানান। ২৭ থেকে ৩০শে জুলাই (১৯৩৪) তারিখে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ওই না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি স্বীকৃতি পেলে মালব্য এবং অ্যানি যথাক্রমে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতিত্ব ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এঁদের পদত্যাগ কংগ্রেস কর্মীমহলে চাঞ্চল্য তোলে, আগস্টের ১৮ ও ১৯ তারিখে কলকাতায় একটি সম্মেলনে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করার জন্য মালব্যের নেতৃত্বে একটি দল গঠিত হয়। হিন্দু জনসাধারণের অধিকাংশই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধী ছিলেন, এবং এঁরা সঠিকভাবেই এই ধারণা করেছিলেন যে যখন তখন গান্ধী এই কথা বলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি করেছেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বসমর্থিত কোন সমাধানসূত্র ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর বা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পরে অবশ্য গান্ধী এটা উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৯৩৪) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশন বসেছিল। তার কয়েকদিন আগে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধী একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে[১] কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল চরকা, খদ্দর, মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা, এবং অহিংসা নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিচ্যুত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। ২৬শে থেকে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত বোম্বাই-এ যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল সেখানে গান্ধীর এই বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে কংগ্রেস সভ্যদের পক্ষে সুতাকাটা আবশ্যিক করা

১। Sitaramayya, I, 579-80.

হয়, এবং খদ্দরের পোশাক অঙ্গে ধারণ করা পদাধিকারীদের কাছে বাধ্যতা-মূলক করা হয়। বোম্বাই কংগ্রেস একটি নিখিল ভারত গ্রাম শিল্পসংস্থা গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই অধিবেশনের পর কাগজে কলমে গান্ধী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও কার্যত কংগ্রেসের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীকে হারানো কংগ্রেসের কল্পনার বাইরে ছিল, এবং সেই আবেগের সুযোগ নিয়ে গান্ধী কংগ্রেসের বাইরে গিয়েও কংগ্রেসকে কব্জায় রেখেছিলেন, যেটা হয়ত ভিতরে থাকলে পারতেন না, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি অধিকতর গান্ধী অনুগত ছিল।

১৯৩৫-এর শুরুতেই নির্বাচন হয়, পুরাতন ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে, এবং এই নির্বাচনের ফলাফল হয়েছিল নিম্নরূপ : কংগ্রেস—৪৪, কংগ্রেস-জাতীয়তাবাদী (মালব্য এবং অ্যানির দল)—১১, ইউরোপীয়—১১, মনোনীত সরকারী ব্যক্তি—২৬, মনোনীত বেসরকারী ব্যক্তি—১৩, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস—২২। দেখা যাচ্ছে সরকার পক্ষে সদস্য হয়েছিলেন ৫০ জন, কংগ্রেসের দুই গ্রুপ মিলিয়ে ৫৫ জন, এবং জিন্নার নেতৃত্বাধীন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টরা ভারসাম্য রাখার সুবিধাজনক স্থানে ছিল। এই নতুন আইন-সভার সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড। জিন্না এই বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন, তা হচ্ছে অন্য কোন বিকল্প না পাওয়া পর্যন্ত কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডকে মেনে নেওয়া হোক। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে নিরপেক্ষ ছিল। আইনসভার বাইরে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একটা চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৩৫-এর ২৩শে জানুয়ারী থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক হয়েছিল, কিন্তু তা ফলদায়ক হয় নি।২

১৯৩৫-এর ২রা আগস্ট তারিখে নতুন ভারত শাসন আইন পাশ হল। এই আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করা হল। এছাড়া পৃথকভাবে উড়িষ্যা ও সিন্ধু এই দুটি প্রদেশের সৃষ্টি করা হল। দ্বৈতশাসন অবলুপ্ত করা হল সভাগুলির কাজের ক্ষেত্র ও পরিসর বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাদের আইনসভার নিকট দায়ী করা হল। গভর্ণরদের হাতে অবশ্য কিছু 'বিশেষ দায়িত্ব' রাখা হল। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও আসামে দ্বিকক্ষ আইনসভা স্থাপন করা হল, অন্য সকল স্থানে এককক্ষ। সরকার মনোনীত সদস্যপদ তুলে নেওয়া হল। আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড এবং পুণা প্যাক্ট মানা হল। ভোটাধিকার অবশ্য সার্বজনীন হল না, সম্পত্তি থাকাটা ভোটাধিকার অর্জনের মূল ভিত্তি

২। *ibid.*, 661-2.

হিসাবে ঘোষিত হল। অবশ্য কম মূল্যের সম্পত্তি যাদের আছে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। পূর্বের তুলনায় ভোটদাতাদের সংখ্যা চারগুণ বেড়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিন্তু দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয় নি।৩ কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদে রাজন্যবর্গকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে পুরাতন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা হয় নি, তবে একটি ফেডারেল কোর্ট, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এবং ফেডারেল রেলওয়ে বোর্ডের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

১৯৩৫ সাল থেকেই কংগ্রেসের ভিতরে একটা সমাজতান্ত্রিক হাওয়া ঢুকেছিল, যা গান্ধীর নজর এড়ায় নি। ১৯৩৪-এর কংগ্রেস অধিবেশনেই এই ধারার শক্তি কিছুটা আঁচ করা গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই নিখিল ভারত কিষাণ সমাজ গড়ে উঠেছিল, ছাত্ররাও একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরী করেছিলেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, যা দুবার ভেঙে গিয়েছিল ১৯২৯-এ এবং ১৯৩১-এ, আবার জোড়া লেগেছিল। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে, সাহিত্যিকদের রচনায়, নতুন আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল।৪ বস্তুত স্বরাজ্য দলের মতই, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনী ছিল, কিন্তু কমিউনিস্টদের কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।৫ বিদেশ থেকে ঘুরে এসে নেহরু কমিউনিজমের গুণগানে মুখর হয়েছিলেন, এবং ১৯৩৬-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট আদর্শের কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব ও অচ্যুৎ পটবর্ধনকে গ্রহণ করেন, যাঁরা পুরোদস্তুর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।৬ গান্ধী এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং সুকৌশলে নেহরুকে তাঁর শিবিরে নিয়ে আসেন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন, যা ঘটেছিল ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে, সেখানেও নেহরুকে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত করা হয়, যা গান্ধীর কূটনীতিজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক, কেননা গান্ধী জানতেন যে অধিকাংশ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তাঁর পকেটে, কাজেই নেহরুর পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছু করা সম্ভবপর নয়। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক আবেগকে কিছুটা প্রকাশিত করার সুযোগ তিনি দিয়ে-

---

৩। Gwyer, I, XLIII-XLIV.
৪। Bose, III, 16-17.
৫। *ibid*, 10
৬। Sitaramayya, II, 11.

ছিলেন, তাঁকে অধিকতরভাবে নিজের কবজায় আনার জন্য, এবং গান্ধী তাতে সাফল্যলাভও করেছিলেন। কংগ্রেসের এই ফৈজপুর অধিবেশনে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান প্রচুর দেওয়া হয়েছিল, রুশ জনগণের সঙ্গে সংহতির শ্লোগানও দেওয়া হয়েছিল,[৭] কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গাত্রাবরণ সত্ত্বেও, সভাপতির ভাষণে কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটল না। সেখানে নেহরুর মুখ দিয়ে গান্ধীই কথা বললেন। ফৈজপুর কংগ্রেসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যোগদান, যিনি সেখানে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর উপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু এই গোঁড়া কমিউনিস্টের সঙ্গ অপর সকলে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হল তাতে সাধারণ আসনের প্রায় সব আসনই কংগ্রেস পেল। কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল—যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই। এগুলি সবই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। আসাম, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলেও কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির মর্যাদা লাভ করেছিল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছিল তথাপি সেখানে কংগ্রেসের জয় লক্ষ্যণীয়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিশেষ কোন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। সারা ভারতে মুসলমানদের জন্য যে ৪৮২টি আসন সংরক্ষিত ছিল তার মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র অল্প কটি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস ৫৮টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং ২৬টিতে জিতেছিল। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি ১৭৫টি আসনের মধ্যে ১০৬টি আসন দখল করেছিল। এই পার্টিতে যদিও মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল তথাপি এদের উপর লীগের কোন প্রভাব ছিল না। বাংলায় মুসলমানদের তিনটি পার্টি ছিল। তার মধ্যে মুসলিম লীগের ছিল ৪০টি আসন, স্বতন্ত্র মুসলিমদের ছিল ৪১টি আসন, আর ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির ছিল ৩৫টি আসন।[৮]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ১৯৩৭ সালে হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেসের যে প্রভাব ছিল, মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব সে তুলনায় কিছুই ছিল না। বরং বলা যায় যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে মুসলিম লীগের যে প্রভাব ছিল খোদ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে তার সিকিভাগও ছিল না। অথচ কংগ্রেসের ভ্রান্ত রাজনীতি, দূরদর্শিতার অভাব, সোজা কথায় মাথা মোটা রাজনীতি, কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম

৭। *ibid.*, 30.
৮। Suda J. P., *Indian Constitutional Development* (1960), 349.

লীগের প্রভাব শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা দেখেছি যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জন্য পাঁচটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারলেও, বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ওই তিনটি প্রদেশেও মন্ত্রিত্ব গঠনের অধিকার লাভ করেছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব তখন খুব বেশি ছিল না। বাংলার ফজলুল হকের মত উদার মনোভাবসম্পন্ন মুসলমান নেতারা অন্যান্য প্রদেশেও বেশ কিছু অনুগামী নিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করতে তাঁরা খুবই উৎসুক ছিলেন। কিন্তু গান্ধীর নির্দেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। তাঁরা গান্ধীকে অনেক সাধাসাধি করেছিলেন, কিন্তু গান্ধী তা কানেও তোলেন নি। এটি আর একটি হিমালয় প্রমাণ ভুলের ঘটনা। ফলে দেশে সর্বনাশের গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যানের পর মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগকে ডাকা হল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য। মন্ত্রিত্বের নামে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির অবসান হল। লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, এবং এই ক্ষমতা সর্বাগ্রে প্রয়োগ করল লীগের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে। বিদ্যুৎগতিতে এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সর্বত্র মুসলিম লীগের সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল, যার ফলে ভারত বিভাগের বীজ পোঁতা হল। বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে পরে আলোচনা করব।

নির্বাচনান্তে মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস অংশগ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৭-এর ১৭ই ও ১৮ই মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভা চালাতে পারবে বলে মনে করছে সেই সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবে। ক্ষেত্রবিশেষে অন্য দল থেকে দু'একজন মন্ত্রী নেওয়া যেতে পারে (যেমন উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ) কিন্তু সেখানেও তাদের কংগ্রেসের লীড মেনে চলতে হবে, কেননা কংগ্রেস সেই সব প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেটা সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে ভুললে চলবে না, এবং কংগ্রেস যে সব জায়গায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নি, সেই সব জায়গায় আপাতত কোন কোয়ালিশনে যাবে না। কিন্তু সব কিছুর আগে গান্ধী একটি সর্ত জুড়ে ছিলেন। সেটি হচ্ছে এই যে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাছ থেকে এই গ্যারাণ্টি পাওয়া যাচ্ছে যে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন তাঁদের যে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে সেগুলির প্রয়োগ তাঁরা

করবেন না, তবেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে। বলাই বাহুল্য গভর্ণরেরা এতে রাজি হলেন না। গান্ধীর একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল যে প্রতিপক্ষ তাঁর দাবি কতটা মানবে সেটা হিসাব না করেই দাবি করে বসতেন, এবং তারপর প্রত্যাখ্যাত হয়ে ধাপে ধাপে দাবির বহর কমিয়ে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত বড়লাটের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের দাবিতেই উপনীত হতেন। এক্ষেত্রে অবশ্য অতটা হয় নি। ৩০শে মার্চ তারিখে গান্ধী দ্বিতীয় দফায় দাবি তুললেন যে এই বিষয়ে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হোক। শেষ পর্যন্ত এই নিয়ে অনেক জলঘোলা করার পর শেষ পর্যন্ত বড়লাট একটি বিবৃতিতে জানান যে মন্ত্রিসভার সঙ্গে গভর্ণরদের সম্পর্ক যাতে যতদূর সম্ভব ভালো রাখা যায় সে চেষ্টা করা হবে। এরপর ৭ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাযুক্ত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর জওহরলাল নেহরু অত্যন্ত অবিবেচনার সঙ্গে ঘোষণা করে বসলেন যে ভারতবর্ষে মাত্র দুটি দলই আছে, বৃটিশ শাসকগণ এবং কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশে, যেখানে মুসলিম লীগকেও মন্ত্রিসভার সামিল করার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে তাঁদের কংগ্রেসের ক্রীড মেনে নিতে বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের এই বিজয়ীর উগ্র ভাবভঙ্গী মুসলমানদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ করে তোলার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল।৯ আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে এক্ষেত্রে নেহরুর অদূরদর্শী আচরণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয় উপেক্ষণীয় ছিল না যে মুসলমানরা সেখানকার জনসংখ্যার ষোল শতাংশ, এবং উত্তরপ্রদেশ মুসলিম সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান, এবং সেই হিসাবে বড় বড় তাত্ত্বিক বুলি না আউড়ে যদি দুজন মন্ত্রীকে মুসলিম লীগ থেকে নেওয়া হত, কোন ঝামেলাই হত না।১০ শুধু নেহরুই নন, আরও অনেক কংগ্রেস নেতা নির্বাচনের ফল দেখেই মুসলিম লীগকে অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ করেছিলেন, যদিও লীগ সে সময় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছিল। ১৯৩৭-এর ৩১শে মার্চ তারিখে নেহরু পুনরায় ঘোষণা করলেন যে অতঃপর মুসলমানদের কংগ্রেসে আনার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচার কার্য চালানো হবে, এবং তা নানাভাবে করাও হয়ে-

---

৯। Chaudhuri Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan* (1961), 161-62.
১০। Azad A. K. *India Wins Freedom*, 161-62; অতঃপর গ্রন্থটি Azad নামে উল্লিখিত হবে।

ছিল।১১ জিন্না এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন যে যেসব প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে সেই সকল স্থানে তারা মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলিম লীগের নিঃসর্ত আনুগত্য দাবি করছে, তার বর্তমান গণসংযোগ নীতির মূল উদ্দেশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যে ফাটল ধরানো। অতঃপর গ্রামে গ্রামে মোল্লারা কংগ্রেসী প্রচারকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।১২ এরপর মুসলিম লীগের তরফ থেকে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের অন্যান্য মুসলিম দলগুলি আবেদন জানানো হল যে তারা যেন লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই আবেদনে পর্যাপ্ত সাড়া পাওয়া গেল, এবং মুসলিম লীগের নবজীবনের সঞ্চার হল। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পর মুসলিম লীগের ১৭০টি নতুন শাখা খোলা হল, সেগুলির মধ্যে ৯০টি উত্তরপ্রদেশে এবং ৪০টি পাঞ্জাবে। উত্তরপ্রদেশেই এক লক্ষ নতুন সদস্য হয়েছিল।১৩ ২রা মে তারিখে জিন্না নিজেই গান্ধীর কাছে আবেদন করলেন, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটির সমাধানের জন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল কংগ্রেস নিজেকে হিন্দুদের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করুক, এবং মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দিক। ফলে কংগ্রেসের সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা হল। এই বক্তব্যকে মেনে নিলে তাকে এতদিনের জাতীয়তাবাদী আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়, না মানলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়।

কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আটজন সদস্যকে ভাঙিয়ে এনে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হয়, এবং আরও পরে আসামে ও সিন্ধুতে কোয়ালিশন সরকারে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব কংগ্রেসের এলাকার বাইরে থাকে। কংগ্রেসের এই মন্ত্রিত্ব জনগণকে একটা আবেগগত পরিতৃপ্তি দিয়েছিল এই মাত্র। নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কিছু কিছু কাজ করেছিল সত্য, যেমন বেশ কিছু সংখ্যক রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বাড়ানো হয়েছিল, কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যদি কমিউনিস্ট পার্টির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নি। তবে কমিউনিস্টদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রকাশের উপর থেকে বাধার অপসারণ করা হয়েছিল। এছাড়া কৃষকদের

১১। Coupland R., *Constitutional Problem in India* (1945), II, 181.
১২। *ibid.*, 182.
১৩। *ibid.*, 183.

সমস্যার প্রতিও যৎসামান্য হলেও কিছু নজর দেওয়া হয়েছিল, শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সরকারগুলি কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিল। মাদক বর্জনের ক্ষেত্রেও কিছুটা সাফল্য এসেছিল। কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও যেটুকু করা সম্ভব ছিল তা করা হয় নি। অল্প-কালের মধ্যেই আমলাতান্ত্রিকতার লক্ষণ ও বৃটিশ ধরনের মেজাজ কংগ্রেসী শাসকদের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারীর সরকার বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা এস. এস. বাটলিওয়ালাকে কারারুদ্ধ করতেও এদের বাধেনি। বোম্বাই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট বিল পাশ করে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবেই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিল। এটা ১৯৩৮ সালের ঘটনা। এর প্রতিবাদে বোম্বাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৭ই নভেম্বর তারিখে একটি হরতাল আহ্বান করেছিল, এবং এই ব্যাপারে পুলিশ ব্যাপকভাবে গুলি চালিয়ে বহুলোককে হতাহত করেছিল। অহিংসা নীতির ধারক ও বাহকেরা এই ঘটনার কোন প্রতিবাদ জানান নি, এমন কি তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত এ বিষয়ে নীরব ছিলেন।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয় নি, কেননা ওই বছর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠনের ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরেও কংগ্রেসকে একটা আদর্শগত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হাজার হাজার রাজবন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করতে অত্যন্ত দেরী হচ্ছিল, তা ছাড়া হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বন্দীদের মুক্তি দিতে কংগ্রেস মনেপ্রাণে রাজি ছিল না, কিন্তু জনসাধারণ তা চাইছিল, এবং এর ফলে একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দু'চারটি আইন পরে পাশ করা হলেও, কৃষকসমাজের বহুকালের দাবি সম্পর্কে গভীরভাবে কংগ্রেস কিছুই চিন্তা করে নি, এবং কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয়ত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ-সমূহ ইতমিধ্যেই কংগ্রেসে বিস্তারলাভ করেছিল। এ হেন পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৩৮-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুজরাটের হরিপুরার বিঠল-নগরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসে। সর্বসম্মতিক্রমে এবার সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র বসু। সভাপতির ভাষণে কিছুটা আদর্শগত বিভ্রান্তি থাকলেও, তা নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিল নানা দিক থেকে। গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের ভাব তাতে ফুটে উঠেছিল, যা কংগ্রেসের তরুণতর শ্রেণীর কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যময় বোধ হয়েছিল। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের শেষ অনুচ্ছেদে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কংগ্রেসের

নীতি ব্যাখ্যাত হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কংগ্রেস ভারতীয় জনশক্তি ও সম্পদকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেবে না, বিশেষ করে যখন এ বিষয়ে ভারতীয় জনগণের মতামত উপেক্ষা করেই বৃটিশ সরকার ভারতে সমর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার যাবতীয় প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হবে। এই ঘোষণাটি পরবর্তীকালে যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, হরিপুরায় কংগ্রেসের গান্ধীবাদী ও প্রগতিশীল দুটি শাখার মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষ বসু যেখানে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা গান্ধী ও গান্ধীপন্থীদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল, কেননা তাঁরা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে একটা আপোষে আসতে চাইছিলেন। দ্বিতীয়ত ১৯৩৮-এর শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন, ভারতের শিল্পায়ন ও জাতীয় অগ্রগতির একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করাই ছিল যার উদ্দেশ্য। গান্ধীর কাছে এটা মোটেই ভাল ঠেকেনি, তিনি এতে সমাজতন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত ১৯৩৮-এর মিউনিখ চুক্তির পর সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। এই সংগ্রামের আহ্বান, বিশেষ করে জনসাধারণের কাছে, গান্ধীবাদীদের পছন্দ হয় নি কেননা তাঁরা নিরাপদ মন্ত্রিত্ব ও পার্লামেণ্টারী কায়দার মোহে পড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তোলার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না।[১৪]

এই সকল ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হতে চাইলেন। তিনি বললেন, ভারত শাসন আইনের ফেডারেল অংশ নাকচের সংগ্রামের জন্য এবং কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি যে ঝোঁক দেখা গেছে তার প্রতিরোধের জন্য এই বছরেও তিনি সভাপতির পদে আসীন থাকতে চান। কিন্তু গান্ধী তাতে রাজি নন। তাঁর তথা ওয়ার্কিং কমিটির প্যাটেল গ্রুপের প্রার্থী দাঁড়ালেন পট্টভি সীতারামাইয়া। গান্ধী সীতারামাইয়ার হয়ে প্রত্যক্ষ প্রচার করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ৯৫ ভোটে জয়লাভ করলেন। সুভাষচন্দ্রের এই

১৪। Bose, III, 19.

জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদীদের গণতান্ত্রিক মুখোশটি খুলে গেল। গান্ধী বললেন, "পরাজয় যত না পট্টভির তার ঢের বেশি আমার। আমার একটা নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি আছে। সুতরাং এটি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ডেলিগেটরা আমার নীতি ও পদ্ধতিকে পছন্দ করেন না। অতএব আজ যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে অসুবিধা অনুভব করবেন তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।" গান্ধীর কথার ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট ছিল এবং তাঁর অনুগামীদের এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি। সুভাষ বসুকে বিকল করে রাখাই গান্ধীবাদীদের নীতি হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের মন যাতে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে মেতে না থাকে সেইজন্য রাজকোট দেশীয় রাজ্যের রাজা ঠাকুর সাহেবের চুক্তি লংঘনের অজুহাতে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রাক্কালেই গান্ধী আমরণ উপবাস শুরু করলেন। জনগণের উদ্বেগাকুল দৃষ্টি গান্ধীর উপরেই নিবদ্ধ হয়ে রইল, ত্রিপুরী কংগ্রেস গৌণ হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে সুভাষচন্দ্রও অধিবেশনের প্রাক্কালে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীপন্থীরা এই অসুস্থতাকে রাজনৈতিক অসুস্থতা বলে বিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ঝড় অন্যভাবেও তোলা হল। অধিবেশনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তেরজন সদস্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কাজ করতে অস্বীকার করে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন।[১৫]

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসল ১৯৩৯-এর ১০ই থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত। ৩৩১৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২২৮৫ জন এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতার জন্য সভাপতি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ত্রিপুরী অধিবেশনে গৃহীত তিনটি প্রধান প্রস্তাবের প্রথমটিতে ছিল সার্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরীর জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের কথা, দ্বিতীয়টিতে ছিল বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির নিন্দা, এবং তৃতীয়টিতে ছিল পন্থ প্রস্তাব। তৃতীয় প্রস্তাবটিই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক, যা গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক রচিত ছিল।[১৬] এই প্রস্তাবে গান্ধীকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর পুরোদস্তুর ডিক্টেটরের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। যদিও গান্ধী পূর্বে কার্যত তাই ছিলেন, এরপর থেকে সরকারীভাবেই গান্ধীর এই অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই প্রস্তাব নিয়ে তুমুল হৈ চৈ সৃষ্টি হয়,[১৭] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়। এরপর কংগ্রেসের মধ্যে আর গণতন্ত্রের

১৫। Sitaramayya, II, 106.
১৬। *ibid.*, 110-14.
১৭। *IAR* (1939), I, 327-30.

চিহ্নটুকুও রইল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের বৃহত্তর অংশ, যারা সভাপতি নির্বাচনে সুভাষবাবুকে ভোট দিয়েছিল, এই ক্ষেত্রে পন্থ প্রস্তাবকেই সমর্থন জানিয়েছিল। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে গান্ধী প্রত্যক্ষভাবেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করলেন। যে অসহযোগ আন্দোলন একদা গান্ধী ইংরাজদের বিরুদ্ধে করেছিলেন, এবার তা তিনি শুরু করলেন তাঁর নিজের সংগঠনেরই সভাপতির বিরুদ্ধে। এখানে সুভাষচন্দ্রও একটি কৌশলগত ভুল করলেন। তাঁর উচিত ছিল নিজের মনোমত লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা, এবং এ সুযোগ ইতিপূর্বেই তাঁর এসেছিল যখন তেরজন সদস্য তাঁর অধীনে কাজ করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। সেটা করলে কংগ্রেস থেকে দক্ষিণপন্থী উপাদানগুলিকে যেমন তখনই বার করে দেওয়া সম্ভব হত, তাঁকেও পরে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হত না। ২৯শে এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন, এবং তার পরদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি হিসাবে ঘোষিত হলেন। এবং তার পরদিন ১লা মে তারিখে রাজেন্দ্রবাবু সুভাষচন্দ্রের অধীনে কাজ করতে যে তেরজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অস্বীকার করেছিলেন তাঁদের পুনর্নিয়োগ করলেন। নেহরু, বোধ হয় তাঁর 'সমাজতান্ত্রিক' ইমেজ বজায় রাখার জন্যই ওই কমিটিতে যোগদান করেন নি। তারপর একদিন গান্ধীপন্থীরা সুভাষবাবুকে কংগ্রেস থেকেই বিতাড়িত করলেন। সুভাষ যদি এঁদের ত্রিপুরীতেই বিতাড়িত করতেন তাহলে আর নিজেকে বিতাড়িত হতে হত না।

কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থী অংশ কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি নামক পরিচিত ছিল তা গান্ধীবাদী অংশের মত সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। মূলত তাঁদেরই ভোটে সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করলেও যখন সত্যকারের সংঘাত এল তখন এই বামপন্থীরা দোদুল্যমান চিত্তের পরিচয় দিলেন, যার পুরো সুযোগ গান্ধীগোষ্ঠী নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি বলতে বোঝাত মুখ্যত কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিকে কিন্তু ১৯৩৮ থেকেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংঘাতে তা দুর্বল ও এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেসমেন নামক একটি উপদল গড়ে ওঠে, কিন্তু এই সংস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই ঘটনাচক্রের গতি দ্রুত অন্যদিকে মোড় নেয়। সভাপতির পদ থেকে ২৯শে এপ্রিল পদত্যাগ করার পর জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নেয় যে মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, বা শাসনকার্যের কোন ব্যাপারে (তখন কংগ্রেস

আটটি প্রদেশে রাজত্ব করছে) প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির কিছু বলার থাকবে না। এমন কি মন্ত্রীদের দ্বারা কোন অবাঞ্ছিত কর্ম অনুষ্ঠিত হলেও সে বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি পার্লামেণ্টারী বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এইমাত্র, এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোন আলোচনা চলবে না।১৮ এই প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা আপত্তি জানালেন, এবং ৯ই জুলাই তারিখে তাঁরা প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করলেন। বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে বড় বড় জনসভা হল, এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিসমূহের বহু গণ্যমান্য নেতাই সেগুলিতে যোগ দিলেন। এটি সুভাষবাবুর শৃংখলাবিরোধী কাজ বলে গণ্য করা হল, এবং তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর কাজের সমর্থনে একটি দীর্ঘ পত্রে চমৎকার যুক্তিসঙ্গত জবাব দিলেন।১৯ কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি সেই কৈফিয়তে কর্ণপাত না করে একটি প্রস্তাব মারফৎ তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করলেন, এবং তিন বছরের জন্য তাঁকে যে কোন কংগ্রেস কমিটির নির্বাচিত সভ্য হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।২০ এরপর সুভাষচন্দ্রের পক্ষে পৃথক দল না গড়ে উপায় ছিল না।

পদত্যাগের পূর্বে এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর সাক্ষাৎকার কলকাতায় হয়েছিল, এবং নেহরু তাঁকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে তা হলে এই সংকটময় সময়ে কংগ্রেস ভাগ হয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে জোড়াতালি দেওয়া ঐক্যে কোন লাভ নেই। যেখানে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের পক্ষে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী কর্মসূচী নেওয়া দরকার, যাতে ১৯১৪র ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, তখন গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আপোষ রফায় এসে নিষ্ক্রিয় রাজনীতি করার কোন সার্থকতাও নেই। এই আলোচনায় অবশ্য নেহরু সন্তুষ্ট হন নি, তিনি গান্ধীর পথ ধরে চলতেই রাজি ছিলেন, এবং তিনি যতই সেদিকে গেছেন ততই তিনি বামপন্থীদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছেন।২১ বসুর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদের মূলে আদর্শগত কারণই ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৩৮ সাল থেকে গান্ধী বরাবরই বলে এসেছিলেন যে নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কোন সম্ভাবনাই নেই, এবং এটাই ছিল কংগ্রেসের অধিকাংশেরই বক্তব্য। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র ও

১৮। Sitaramayya, II, 115.
১৯। *ibid.*, 116-17.
২০। *ibid.*, 118.
২১। Bose III, 25.

তাঁর অনুগামীরা মনে করতেন যে আসন্ন যুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের একটি দুর্লভ সুযোগ নিয়ে আসছে।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ১৯৩৮-৩৯-এ যখন এইভাবে ভাঙাগড়ার খেলা চলছিল, তখন অপরাপর দলগুলির ভূমিকা কি ছিল সেটাও জানা দরকার। জিন্না কংগ্রেসকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অতঃপর যেন কংগ্রেস নিজেকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ্য করে। ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসবিরোধী প্রচার কার্যে চূড়ান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। মুসলিম লীগ নিজেদের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিল যে ১৯৩৮-এর ২রা আগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট লিখিত পত্রে জিন্না জানান যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনার জন্য কংগ্রেস যে একটি কমিটি গঠন করেছে সেখানে যেন কোন মুসলমান সদস্য না থাকে। যখন গান্ধী জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য মৌলানা আজাদকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, জিন্না তাতে রাজি হন নি।২২ অথচ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের যে চরিত্র নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা মানতে গেলে কংগ্রেসকে তার জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে হয়। ১৯৩৮-এর নভেম্বরে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি তালিকা প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় যে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কংগ্রেসের তরফ থেকে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে এর জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও মুসলিম লীগের অপপ্রচার বন্ধ হয় নি, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে নতুন করে আবার অভিযোগগুলি তোলা হয়। এমন কি ফজলুল হক পর্যন্ত 'কংগ্রেস শাসনে মুসলিমদের দুরবস্থার' উপর একটি বই লিখেছিলেন। ১৯৩৯-এর অক্টোবরে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিন্নাকে একটি চিঠিতে জানান যে, যে সকল অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে সেগুলি কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। তিনি নিজেই এই বিষয়ে ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গিউয়ের-এর নাম প্রস্তাব করেন। জিন্না এতে কর্ণপাত করেন নি। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগকালে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রত্যেকটি প্রাদেশিক গভর্ণরকে অনুরোধ জানিয়েছিল যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মুসলমানদের প্রতি কোনরকম অবিচার করেছে কিনা সে বিষয় যেন তদন্ত করা হয়। এই তদন্ত হয়েছিল, এবং একটিও উদাহরণ পাওয়া যায় নি

২২। Prasad R, *India Divided,* 154-55.

যেখানে এইরকম কোন অবিচার করা হয়েছিল।২৩ এই প্রসঙ্গে উত্তর-প্রদেশের গভর্ণর হ্যারি হেগ লিখেছিলেন যে এক্ষেত্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বরাবরই নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছিলেন, বরং তাঁদের মন্ত্রিত্বের শেষ দিকে হিন্দু মহাসভা ক্রমাগত অভিযোগ করে যাচ্ছিল যে কংগ্রেস সরকারগুলি হিন্দু স্বার্থের দিকে উদাসীন থেকে মুসলিম-তোষক নীতি গ্রহণ করেছিল।২৪

ইতিমধ্যেই দ্বিজাতিতত্ত্ব মুসলিম লীগ তথা জিন্নাকে আকর্ষণ করেছিল এবং পাকিস্তানের দাবিও ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। পাকিস্তান পরিকল্পনার একটি ইতিহাস আছে যা এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। ১৯৩০ সালের মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে বিখ্যাত উর্দু কবি স্যার মোহম্মদ ইকবাল তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতের অভ্যন্তরেই একটি মুসলিম-ভারতের দাবি করেন যা পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচি-স্তানকে নিয়ে গড়ে উঠবে। এরপর রহমৎ আলি নামক কেম্ব্রিজের এক ছাত্র, পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ (সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের প্রথম চারটির আদ্যক্ষর এবং শেষেরটির শেষ চার অক্ষর নিয়ে পাকিস্তান শব্দটি তৈরী করেন, এবং এই এলাকাগুলিকে নিয়ে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তোলেন। তিনি এই পরিকল্পনা দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের কালে সেখানকার মুসলিম সদস্যদের কাছে পেশ করেন, এবং এই প্রস্তাব কেউই গ্রাহ্য করেন নি। গোলটেবিল বৈঠকে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাকে তিনি মুসলিম সমাজের প্রতি আত্মঘাতী বলে ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'এখনই অথবা কখনও নয়' নামক একটি চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যা কেম্ব্রিজ প্যামফ্লেট নামে পরিচিত। এই সঙ্গে তিনি 'পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলন' নামক একটি প্রচার সংস্থাও স্থাপন করেন। ১৯৩৩-এর আগস্টে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ এই পাকিস্তান পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালে মুসলিম লীগের কাছে যা ছিল অবাস্তব ১৯৪০-এ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ওই বছরে অনুষ্ঠিত লাহোর অধিবেশনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।২৫

মুসলিম রাজনীতির এই রূপান্তরের সময় কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃবর্গ বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দিয়ে দেখেন নি। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর তীব্র সমালোচনা করা হলেও, কোন

২৩। *ibid.*, 146-47
২৪। Coupland R., *Constitutional Problem in India* (1945), II, 188.
২৫। *ibid.*, 206; Sen S. *The Birth of Pakistan*, 140 ff.

গঠনমূলক প্রস্তাব এ তরফ থেকে দেওয়া হয় নি, বা আলাপ-আলোচনার দ্বারা মুসলিম লীগকে তার নীতি থেকে সরিয়ে আনার কোন চেষ্টা হয় নি। কংগ্রেস কিছু মুসলমান নেতাকে তুলে ধরার পুরাতন পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিল, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদে মৌলানা আজাদকে মনোনীত করেছিল, এবং দিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেছিল যা মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের তুলনায় কিছুই নয়। বস্তুত মুসলিম লীগ যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং জিন্না যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এই সহজ সত্যটাকে হজম করতে বেগ পেতে হচ্ছিল, এবং যখন কংগ্রেস তা বুঝতে পেরেছিল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

(এরপর আসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা। দীর্ঘস্থায়ী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা কমিউনিস্টদের জনপ্রিয় করেছিল। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমর্থনও তাঁরা লাভ করেছিলেন। বিচারাধীন কমিউনিস্টদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নেহরু এবং আনসারী একটি কমিটি স্থাপন করেছিলেন। গান্ধীও জেলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওই মামলার ফলেই কমিউনিস্টদের আদর্শ ও কর্মসূচীর সঙ্গেও জনগণ পরিচিত হতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল যে তার নীতি নির্ধারণ করত কমিণ্টার্ণ, এবং বলাই বাহুল্য সেই নীতি বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থের চেয়েও পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থের দিক চেয়েই নির্ধারিত হত। দ্বিতীয়ত আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে কি থাকবে না মূলত এই বিষয়টি নিয়েই কমিউনিস্ট-ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বিতর্ক হয়েছিল, যার ফলে দুটি বক্তব্যকেই গ্রহণ করে একটি জোড়াতালি দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এবং এরই ফলে আমরা দেখছি যে কমিণ্টার্ণ তথা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বরাবরই দোদুল্যমান থেকেছে, কখনও তা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে এসেছে, এবং কখনও তা বিপরীত দিকে সরে গেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তাই এই দুই ধারার সংঘাতের ইতিহাস।)

(১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত বামঘেঁষা নীতি অবলম্বন করেছিল।) এই নীতির মূল কথা ছিল, কংগ্রেস পুঁজিবাদী শ্রেণীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, এবং কংগ্রেসের নীতি ব্যাপকভাবে কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী, কাজেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির পথও সঠিক নয়, একমাত্র

কৃষক-শ্রমিক-দরিদ্র শ্রেণীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানই দেশের মুক্তি আনতে পারে এবং সেই বিপ্লব ঘটবে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে।২৬ এই নীতি এবং তদনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমিউনিস্টরা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল এবং ১৯৩১ সালে তারা নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন রেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে তোলে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নেতারা মুক্তিলাভ করার পর এই ইউনিয়ন আরও শক্তিশালী হয়, এবং ১৯৩৪ সালে ২৩শে এপ্রিল তারিখে তারা যে বয়নশিল্পকর্মীদের ধর্মঘট আহবান করেছিল তা রীতিমত সাফল্য লাভ করে। ফলে শঙ্কিত হয়ে সরকার ব্যাপকভাবে কমিউনিস্টদের ধরপাকড় শুরু করে।)

(এদিকে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকেন যে, কংগ্রেসের নীতি যাই হোক, যে গণভিত্তি ব্যতিরেকে কোন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্ভব নয়, সেই গণভিত্তি কার্যত কংগ্রেসেরই আছে, কাজেই চূড়ান্ত বামঘেঁসা নীতি, এবং কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার নীতিকে আঁকড়ে থাকলে, পার্টিও কার্যত জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। ফলে আবার কমিউনিস্ট পার্টির নীতির পরিবর্তন ঘটল। কমিউনিস্টরা অতঃপর জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করল। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, যা কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী শাখাটির প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল, এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, এবং রেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি যুক্ত কর্মসূচীও গ্রহণ করল, এবং কমিউনিস্টরা, সরকারী-ভাবে তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকার দরুণ, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সদস্য হবার যোগ্যতা লাভ করল, অর্থাৎ কার্যত তারা কংগ্রেসেই প্রবেশাধিকার পেল। এর ফলে কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন।) ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে 'লক্ষ্ণৌ বোঝাপড়া' কমিউনিস্টদের সঙ্গে কংগ্রেস-সোসালিস্টদের সম্পর্কের আরও উন্নতি করে, কিন্তু ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির কার্য-নির্বাহক নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে দুই তরফের মধ্যে ফাটল ধরে, এবং পরিশেষে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। (১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে যে স্ট্যালিন-হিটলার চুক্তি হয়েছিল, তাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিরা বেকায়দায় পড়লেও, ভারতীয় কমিউনিস্টদের সামনে তা এক স্বস্তিকর

২৬। Overstreet G. D. and Windmiller M., *Communism in India*, 140 ff.

অবস্থা এনে দিয়েছিল। কংগ্রেস যেমন সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন না দেওয়ার কথা বরাবর বলে এসে জনসাধারণের মনের কাছাকাছি এসেছিল, কমিউনিস্টরাও অনুরূপভাবে তাদের ইমেজকে জনসাধারণের চোখের সামনে উজ্জ্বল করতে পেরেছিল।

১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট বিভিন্ন রকম হয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বাংলাদেশের অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি শুরুতেই বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করল এবং এই সব প্রদেশের আইনসভাগুলিতে সমর্থনসূচক প্রস্তাবও গৃহীত হল। ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ বৃটিশের সাহায্যে লেগে গেল। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন, যা নরমপন্থীদের দ্বারা গঠিত ছিল, এবং হিন্দু মহাসভা পুরোপুরি ইংরাজকে সমর্থন করল। হিন্দু মহাসভার বক্তব্য ছিল যে বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মুসলিম সংখ্যাধিক্য ভাঙার এটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সুযোগ এবং দলে দলে হিন্দু যুবকদের সামরিক বাহিনীতে ঢোকাবার দায়িত্ব সাভারকার নিয়েছিলেন যার ফলে শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু সংখ্যাধিক্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখে একটি প্রস্তাব নিয়ে জানায় যে তারা শর্তাধীনে সমর প্রচেষ্টার সামিল হতে রাজি আছে, এবং সেই শর্ত হচ্ছে যে মুসলিম লীগের অনুমোদন ব্যাতিরেকে সংবিধানের ব্যাপারে বৃটিশ সরকার যেন কোন প্রতিশ্রুতি না দেয়।[২৭] বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ প্রভাবিত মন্ত্রিসভা যে পূর্বেই বৃটিশ সরকারকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে সম্পর্কে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোন কথা তোলে নি। (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা আগেই দেখেছি, এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছিল এবং বৃটিশবিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছিল, অবশ্য যুদ্ধের প্রথম দিকের বছরগুলিতে।)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কংগ্রেসের সামনে একটি চিন্তার সংকট নিয়ে এসেছিল। হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতিকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের জনশক্তি ও সম্পদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। এই নীতি অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কংগ্রেসের কাছে ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যেখানে বৃটিশের সমর প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সাহায্যের

২৭। Coupland, II, 216.

কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী এই যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় ও ধ্বংস চাইতেন না, জওহরলাল নেহরুও এই যুদ্ধ গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসিবাদের সংঘাত হিসাবে দেখেছিলেন, এবং সেই হিসাবে মিত্রপক্ষকে সমর্থন করার পক্ষে ছিলেন।২৮ মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর উপদল লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেসমেন অনুরূপ মতবাদই পোষণ করতেন।) (পক্ষান্তরে সুভাষ বসু ও তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লক প্রকাশ্যভাবে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা বৃটেনের জয়লাভ চান না, বরং বৃটেনের শোচনীয় পরাজয় যদি ঘটে তবেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সহস্রাধিক জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।২৯)

সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য কংগ্রেসীমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এবং অনেকেই গান্ধী বা নেহরুর বিশ্লেষণের দ্বারা চালিত হতে অস্বীকার করেছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর, কংগ্রেসের তরফ থেকে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে অনুরোধ জানানো হল যাতে বৃটিশ সরকার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যেন তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে, এই যুদ্ধকে যখন তারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংকট বলে ব্যাখ্যা করছে, কংগ্রেস জানতে চায় ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ওই নীতিগুলির সম্পর্ক কি এবং সেগুলি কিভাবে প্রযোজ্য হবে। ১০ই অক্টোবর তারিখে কংগ্রেসের তরফ থেকে পুনরায় জানানো হল যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে রাজি হবে যদি তাকে স্বাধীন জাতি বলে ঘোষণা করা হয়, এবং সেই মর্যাদা যতদূর সম্ভব পূর্বাহ্নে দেওয়া হয়।৩০

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ১৭ই অক্টোবর একটি ঘোষণায় জানালেন যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়াই বৃটিশ নীতির লক্ষ্য। আপাতত ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনই বলবৎ থাকবে, তবে যুদ্ধ শেষে ভারতীয় নেতাদের মতামত এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কিছু পরিবর্তন করা হবে। ভারতীয় জনমত যাতে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ নিয়ে একটি পরামর্শ কমিটি থাকবে যার সভাপতি থাকবেন বড়লাট নিজে।৩১ কার্যত এই প্রস্তাবের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই ছিল না, এবং কংগ্রেস সঙ্গতভাবেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

২৮। *ibid*, 214.
২৯। Bose, III, 28-29.
৩০। *IAR* (1939), II, 226-31.
৩১। Coupland, II, 217.

করে জানিয়েছিল যে অতঃপর গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে সহযোগিতা করা অসম্ভব। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল। ১৯৩৯-এর ২৭শে অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সকল মন্ত্রিসভাই পদত্যাগ করল। ওই অক্টোবর মাসেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ফরোয়ার্ড ব্লক নাগপুরে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেছিল এবং তা রীতিমত সাফল্যময় হয়েছিল। এরপরেও শাসনকার্যে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগের টোপ দিয়ে বড়লাট কংগ্রেসকে ভেজাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বুদ্ধিমানের কাজ করে নি। আটটি প্রদেশের প্রশাসনভার গভর্ণরদের হাতে ফিরে যাওয়ায় তাঁরা প্রশাসনে স্বাধীনভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, এবং কংগ্রেসকে খর্ব করার জন্য মুসলিম লীগের স্বার্থে শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার ব্যাপকভাবে করেছিলেন। এদিকে জিন্না সরকারকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন যে মুসলিম লীগ ও তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে সাংবিধানিক বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতির কথা কংগ্রেসকে দেওয়া চলবে না। যে কোন ধরনের গণপরিষদের দাবিরও বিরোধী ছিলেন জিন্না, কেননা তিনি জানতেন যে এরকম কিছু গঠিত হলে সেখানে কংগ্রেসেরই প্রভাব দাঁড়াবে বেশি। ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগের অনেকগুলি জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছিল যথা মুসলিম লীগ ভলাণ্টিয়ার কোর, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং খাকসারবাহিনী। এদের হাতে অস্ত্রও তুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট কায়দায় নরহত্যার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এর পিছনে বৃটিশ সরকাররে সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে জিন্না স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখে মুসলিম লীগ 'মুক্তি ও ধন্যবাদ প্রদান দিবস' পালন করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ঘটনাচক্র (১৯৪০-৪২)

১৯৪০-এর মার্চ মাসে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে। এবারের সভাপতি নির্বাচনে আজাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার পক্ষে ছিলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে আজাদ জয়ী হলে মানবেন্দ্রনাথ নিজের অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নামক একটি দল গঠন করেন। রামগড় কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কিছু ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, এবং সংবিধান রচনার দায়িত্ব ভারতবাসীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এছাড়া আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করার হুমকিও দেওয়া হয়। রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন চলার সময় সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভাকে নিয়ে একটি ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন যা অল ইণ্ডিয়া অ্যাণ্টি-কম্প্রোমাইজ কনফারেন্স নামে পরিচিত।) এই বিক্ষোভ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চাঞ্চল্য ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।১ ১৯৪০-এর গোড়াতেই কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসে, এবং অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কেরালার কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির একটা বড় অংশকে নিজেদের দলে টেনে নেয়। রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন কমিউনিস্ট পার্টি একটি নতুন নীতি গ্রহণ করে যা প্রোলেটারিয়ান পাথ নামে পরিচিত। এই নীতি অনুযায়ী তাঁরা বুর্জোয়া সংস্কারবাদের প্রভাবের বাইরে মেহনতী জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করে একটি জাতীয় ফ্রণ্ট গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। কর্মসূচী হিসাবে তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালাবার জন্য ব্যাপক ধর্মঘট, খাজনা ও কর বন্ধ আন্দোলন, জাতীয় মিলিশিয়ার দ্বারা পুলিশের থানা ও সৈন্যবাহিনীর ছাউনি আক্রমণ, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস প্রভৃতির পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।২ ১৯৪০-এর মার্চ মাসেই মুসলিম লীগের বিখ্যাত লাহোর অধিবেশন

১। **Bose, II, 32.**
২। **Overstreet and Windmiller, 181 ff.**

অনুষ্ঠিত হয় জিন্নার সভাপতিত্বে যেখানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল ফরোয়ার্ড ব্লক একটি জাতীয় সপ্তাহ পালন এবং সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন চালাবার পক্ষে ব্যাপক প্রচার অভিযানে নেমেছিল। তখন থেকেই ওই দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছিল। এদিকে এপ্রিল মাসে জার্মান ঝটিকাবাহিনী নরওয়ে, ডেনমার্ক, হলাণ্ড ও বেলজিয়াম গ্রাস করেছিল। ১০ই মে তারিখে চেম্বারলিনের স্থলে উইনস্টোন চার্চিল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। যুদ্ধের গতি তখন মিত্রপক্ষের বিপক্ষে চলছিল। এই সময় ২০শে মে তারিখে জওহরলাল নেহরু একটি ঘোষণায় বললেন যে বৃটেন যখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত করা ভারতের 'সম্মানবিরোধী' হবে। গান্ধীও বললেন বৃটেনের ধ্বংসের মধ্যে যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতা অনুসন্ধান করি তাহলে তা অহিংসা নীতির বিরোধী হবে। জুন মাসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীকে একটি পত্রে আইন অমান্য আন্দোলন চালানোর উপযুক্ততম মুহূর্ত এসেছে বলে তাঁকে তা শুরু করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গান্ধী তখনও বৃটিশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন।৩ এদিকে কংগ্রেসের কর্মীস্তরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছিল, এবং কংগ্রেসের একটা বড় অংশই গান্ধী নীতির সঙ্গে একমত হতে পারছিলেন না। ১৭ই থেকে ২০শে জুন ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ বৈঠক বসল, যেখানে এই প্রথম গান্ধী নীতি প্রত্যাখ্যাত হল। গান্ধী নেতৃত্বের প্রকৃত অবসানের সূত্রপাত এখান থেকেই। ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসীদের অংশগ্রহণ, এবং শর্তসাপেক্ষে তাদের ছেড়ে আসা প্রদেশগুলিতে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। ২রা জুলাই (১৯৪০) তারিখে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। ৩রা থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আবার একটি বৈঠক বসল। দাবি তোলা হল যে যদি যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দেয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে যদি একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে, চালাতে দেয়, তাহলে কংগ্রেস বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। এই প্রস্তাবটি ২৭-২৮শে জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পুণা অধিবেশনে গৃহীত হয়।৪

৩। Bose, III, 31-34.
৪। Coupland, II, 239-40.

এদিকে গান্ধী ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তখন বড় বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। ১৫ই জুন তারিখে হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে গান্ধী লিখেছিলেন যে সংবিধান, গণপরিষদ বা অন্য কোন বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কথা বলার পূর্বে অপর সকল দলের সঙ্গে পাকাপাকি বোঝাপড়া করে নিতে হবে, এই মনোভাবটা শুধু অসঙ্গতই নয়, অবাস্তব।৫ গান্ধীর এই বোধটা আগে এলে তা অনেক কাজের হত, কেননা কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক এটা বৃটিশ সরকার কোনদিনই চায়নি, এবং যখনই সে সুযোগ এসেছে বৃটিশ সরকারের প্ররোচনায় মুসলিম লীগ তার দাবির বহর বাড়িয়ে গেছে, ফলে কোন বোঝাপড়া হয়নি, এবং তা হওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। গান্ধী আরও বললেন যে মুসলিম লীগের প্রকৃতি একান্তই সাম্প্রদায়িক, এবং তা ভারতবর্ষকে দুভাগ করতে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের তাই কোন মৌলিক বোঝাপড়া সম্ভবপর হতে পারে না।

এদিকে ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রদত্ত প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে ভাইসরয় জানালেন যে বিগত অক্টোবর মাসে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেছিল সেটাই বহাল থাকবে, তবে তদুপরি বড়লাটের কার্যনির্বাহক সংস্থার পরিসর বাড়ানো হবে এবং ভারতীয় নেতাদের নিয়ে একটি যুদ্ধ-উপদেষ্টা-পর্ষৎ গঠিত হবে। যুদ্ধান্তে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদও গঠন করা হবে। একই সঙ্গে বড়লাট জিন্নারও দাবি মেনে নিলেন যে বৃটিশ সরকার এমন কোন ধরনের ভারতীয় সরকারকে স্বীকার করবে না যা মুসলিম জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বড়লাটের এই 'আগস্ট প্রস্তাব' কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কোন তরফকেই খুশি করতে পারল না। কংগ্রেসের মতে এই প্রস্তাব সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার নামে ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে জিন্নার হাতে একটি মোক্ষম ভেটো-ক্ষমতা তুলে দিল। লীগের মতে গণপরিষদ মানেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যাপার এবং সেখানে হিন্দুর আধিপত্য অবধারিত, কেননা ভারতীয় জনগণের অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকারী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হল না। এছাড়া আগস্ট প্রস্তাবে ভারত বিভাগের ইঙ্গিত ছিল, যাকে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তার ৩১শে আগস্টের বৈঠকে স্বাগত জানিয়েছিল।

৫। *ibid.*, 242

কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভিন্ন আর কিছু করার ছিল না। এত কাণ্ডের পর যুদ্ধ প্রচেষ্টার সামিল হওয়া কংগ্রেসের কাছে আত্মহনন ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই গান্ধী ও জওহরলালের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসকে নামতে হল। ইতিমধ্যেই সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং অনেক কংগ্রেসকর্মীও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আলোচনার নামে যত দেরি হচ্ছিল কর্মীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা তত বাড়ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেই আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীর উপরেই ন্যস্ত হল। কংগ্রেসের মধ্যে তখনো যাঁরা বামপন্থী ছিলেন তাঁরা এবং কংগ্রেসের বাইরের অনেকেই চেয়েছিলেন যে এই আইন অমান্য আন্দোলন এমনভাবে সংগঠিত করা হোক যা জাতীয় বিদ্রোহের আকার নেবে। কিন্তু গান্ধী সেদিক দিয়ে গেলেন না। ভারতের স্বাধীনতাকে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন না। তিনি বললেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার সামিল হব না এই কথা বলার স্বাধীনতার জন্যই তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন,৬ এবং আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা এটাকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ মনে করেই করবেন। ২৭শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অবশ্য এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল ছিল সামান্যই। ১৭ই নভেম্বর তারিখ থেকে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হল। কংগ্রেসী নেতারা এককভাবে রাজপথে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান দিয়ে গ্রেপ্তার হতে শুরু করলেন। ১৭ই ডিসেম্বর গান্ধী হঠাৎ ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। অবশ্য এর ফলে তেমন কোন চাঞ্চল্য ঘটল না, কেননা এই আন্দোলন জনমনে মোটেই আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে নি।

৫ই ডিসেম্বর তারিখে সুভাষ বসু কারামুক্ত হন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২রা জুলাই তারিখে। ২৯শে নভেম্বর তারিখ থেকে তিনি কারাগারে অনশন শুরু করেছিলেন, এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, যদিও তারপরেও পুলিশ তাঁর উপর কড়া নজর রেখেছিল।

১৯৪০-এর ডিসেম্বর মাসে ভেঙে যাওয়া নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কমিউনিস্ট প্রভাবিত অংশটির একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে হীরেন মুখোপাধ্যায় ও কে. এম. আশরফ

৬। *ibid.*, 247-48.

কংগ্রেসের সারা ভারতের হয়ে কথা বলার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন। এখানে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ, এবং সেই হিসাবে ভবিষ্যৎ ভারত অঞ্চলভিত্তিক বহু রাষ্ট্রের একটি স্বেচ্ছামূলক ফেডারেশন হবে।[৭]

১৯৪১-এর ৫ই জানুয়ারী তারিখে গান্ধী আবার ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটালেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলি সত্যাগ্রহীদের তালিকা তৈরী করেছিল, এবং জানুয়ারীর শেষে মোট ২,২৫০ জন কারাবরণ করেছিলেন। অতঃপর কংগ্রেসে চার আনা চাঁদা প্রদানকারী সদস্যদেরও সত্যাগ্রহীদের তালিকাভুক্ত করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত এতে ২০,০০০ ব্যক্তি কারাবরণ করেন। কিন্তু এরকম ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে কোন লাভ হচ্ছিল না। যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে গান্ধীকে অনুরোধ জানান যে এই আন্দোলন যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু গান্ধী তা করেন নি, অথচ এই আন্দোলনকে গণআন্দোলনের রূপও নিতে দেন নি, কেননা যুদ্ধরত বৃটিশ সরকারকে কোনক্রমেই বিব্রত করতে তিনি রাজী ছিলেন না। তখনও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তাঁর নমনীয়তা দেখে খুশি হয়ে ইংরাজ সরকার আপোষে আসবে।

১৭ই জানুয়ারী তারিখে (১৯৪১) সুভাষচন্দ্র বসু গৃহত্যাগ করেন। তিনি সোজা মোটরে গোমোয় যান, সেখান থেকে ট্রেনে পেশোয়ার, এবং সেখান থেকে জামরুদের মধ্য দিয়ে গরহি নামক স্থানে উপনীত হন। সেখান থেকে কাবুলে যান, এবং একটি ইটালীয় পাশপোর্ট যোগাড় করে মস্কো হয়ে বার্লিনে পৌছান ২৮শে মার্চ তারিখে। সেখানে রিবেনট্রোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাঁর কাছে তিনটি প্রস্তাব রাখেন। প্রথমটি হচ্ছে, তিনি বার্লিন থেকে বৃটিশবিরোধী প্রচার করবেন; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জার্মানীতে থাকা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করবেন; এবং তৃতীয়টি হচ্ছে অক্ষশক্তিরা একজোট হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘোষণা করবে। তাঁর প্রথম দুটি দাবি জার্মানরা মেনেছিল।

কমিউনিস্টরা তাঁদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বোম্বাই-এর বয়নশিল্পসমূহে ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন ১৯৪১-এর মার্চে। দেড় লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটের সামিল হয়েছিলেন। এই ঘটনায় আশংকিত হয়ে সরকার কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে কমিউনিস্ট বলে কথিত ৪৮০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮] বস্তুত ১৯৪১-এর জুন মাস পর্যন্ত কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবে

৭। Overstreet and Windmiller, 188-89.
৮। *ibid.*, 181-84.

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেকায়দায় পড়লেন ২২শে জুন তারিখ থেকে যেদিন জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের কর্তৃপক্ষ দাবি জানালেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যেন সমর্থন করে, কেননা তাতে কমিউনিস্ট পিতৃভূমি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষাতেই সাহায্য করা হবে। দেউলি বন্দীশিবিরে যে সব কমিউনিস্ট নেতারা আটক ছিলেন তাঁরা মস্কোর এই নির্দেশ মেনে নিলেন, এবং কর্মীদের সেই মর্মে নির্দেশ দিলেন। বলাই বাহুল্য কর্মীস্তরে এই নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের পুরাতন বৃটিশবিরোধী নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও সুভাষ-অনুগামী ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দলকেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সামিল করতে সমর্থ হয়েছিল। লিবারেলরা বৃটিশ সরকারের কার্যাবলীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করছিল, হিন্দু মহাসভা সাভারকরের নেতৃত্বে সৈন্য যোগানের দায়িত্ব নিয়েছিল, মুসলিম লীগও যথাসাধ্য করছিল। কয়েকটি প্রদেশে তাদের মন্ত্রিসভাগুলিও সেই প্রদেশগুলির সম্পদ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হতে দিচ্ছিল। মিত্রপক্ষের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমেরিকা, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক, এবং পরবর্তীকালের ক্রিপস মিশন পাঠানোর মূলেও ছিল রুজভেল্টের চাপ। ৭ই মে (১৯৪১) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব করডেল হুল ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তখনও এ বিষয়ে ছিল আশ্চর্য উদাসীন। ১৯৪০-এর 'আগস্ট পরিকল্পনা' প্রত্যাখ্যাত হবার পর ভারতসচিব লর্ড আমেরি নানান ধরনের উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেন। একটি ঘোষণায় তিনি বলেন যে দুটি প্রধান দলের বাইরে যে সব বুদ্ধিজীবি ও বাস্তবতাবাদীরা আছেন, তাঁরা যদি কোন সংবিধান তৈরী করেন তা বিবেচিত হবে। এ সংবিধান বৃটিশ ধরনের হবার কোন প্রয়োজন নেই, তা মার্কিন বা সুইস ধরনের হলেও চলবে।৯

বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত একটি আদেশনামা প্রচারিত হয় ২২শে জুলাই তারিখে।১০ বর্দ্ধিত পরিষদের ১৩ জন

৯। Coupland II, 258.
১০। *ibid.*, 259-60.

সদস্যদের মধ্যে যদিও ভারতীয় রাখা হয়েছিল ৮ জন, তাঁদের কার্যত ভাইসরয়ের তাঁবেদারের ভূমিকাই দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি এতে খুশি হয় নি। এছাড়া ভারতীয়দের নিয়ে যে প্রতিরক্ষা-পরিষদ গঠিত হয়েছিল, সেটাও ছিল একটা এলেবেলে ব্যাপার, তা ছিল সর্বাংশেই লোক দেখানো। ভারতের জনমত আরও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের একটি দাম্ভিক উক্তিতে, সেটি হচ্ছে এই যে আটলাণ্টিক সনদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। এই আটলাণ্টিক সনদ রচিত হয়েছিল ১৯৪১-এর আগস্টে বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাদের যুদ্ধনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। তাতে বলা হয়েছিল যে, যে সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতার অধিকারকে তাঁরা স্বীকার করেন, এবং তাদের স্বাধীন দেখতে চান। স্বাভাবিকভাবেই এই সনদে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে চার্চিল হাউস অফ কমনসে ঘোষণা করেন যে আটলাণ্টিক সনদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না।[১১] বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন ও নির্লজ্জ রূপটি এই ঘোষণার দ্বারাই ফুটে উঠেছিল। স্যার সিকন্দর হায়াৎ খানের মত লিবারেল নেতা, যিনি নিঃশর্তে বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন, তিনিও এই বিবৃতির সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, তাহলে অবশিষ্টদের মনোভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

৩রা ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে আজাদ ও নেহরুকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁরা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন। ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। ওই মাসেই জাপানীরা উত্তর মালয়ে বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে, এবং সেই সূত্রে ১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং আরও একজন ভারতীয় অফিসার জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। গিয়ানী প্রীতম সিং নামক জনৈক সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তি, যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন, এক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করে তাঁদের ব্যাঙ্ককে নিয়ে আসেন। তিনি এবং ফুজিহারা নামক জনৈক জাপানী মেজর ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে মোহন সিংকে উপদেশ দেন, এবং তাঁদের কথায় মোহন সিং রাজি হন। এরপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে নূতন ধরনের ঘটনাচক্রের সৃষ্টি হয় যা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখব।

১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রস্তাব প্রচারিত হয়

১১। *ibid.*, 260.

যাতে ওই পার্টির পূর্ব অনুসৃত নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে, পূর্ব-কথিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে, নিঃশর্তে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করার নীতি গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে তাঁরা একটি বাস্তববাদী দল, এবং নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁদের সংগ্রামের ধরণ হবে অন্যরকম। তাঁদের নতুন শ্লোগান হবে 'ভারতীয় জনগণকে জনযুদ্ধে জনগণের ভূমিকা পালন করতে দাও'।[১২] এরপরেই কমিউনিস্টরা প্রবল উদ্যমে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নেমে পড়ে।

২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীকে সত্যাগ্রহ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বস্তুত গান্ধী নেতৃত্বের অবক্ষয়ের পর্যায় এখন থেকেই এসে গিয়েছিল। সাধু-সন্ত-মহাত্মা হিসাবেই গান্ধীর স্থান নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল। এই কারণেই দেখা যায় যে ক্রিপস মিশনের সঙ্গে আলোচনায় গান্ধীর কোন ভূমিকাই নেই। অবশ্য একেবারে নিভে যাবার আগে গান্ধী শেষবারের মত জ্বলে উঠেছিলেন ১৯৪২ সালে। সে যাই হোক বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে, জাপানী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে, পুরাতন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অসহযোগের নীতি পুনর্বিবেচিত হয়, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার অনুকূলে, শর্তসাপেক্ষে সহযোগিতা করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৪২-এর ৫ই জানুয়ারী গান্ধী বারদৌলিতে গৃহীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজের বক্তব্য ঘোষণা করেন। নিজেকে কংগ্রেস সেবক ও সত্য এবং অহিংসার উপাসক হিসাবে ঘোষণা করে তিনি জানান যে ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃটিশকে সাহায্য করার মনস্থ করেছে যদি বৃটেন ভারতকে স্বরাজ প্রদান করে। বৃটেনের সঙ্গে করমর্দনের সামান্য সূচনা কংগ্রেস করেছে। রাজাজী প্রমুখ নেতারা খোলাখুলিভাবেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃটেনকে মদত দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু এটা সকলের মত নাও হতে পারে।[১৩] গান্ধীর এই ঘোষণার ফলে বাস্তব অবস্থাটা কংগ্রেসের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে কিছু ভিন্ন হয় নি। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সহযোগিতা বাস্তবে পাওয়া যায় নি। বৃটিশ সরকারও ক্রমে ক্রমে হাল ছেড়ে দিচ্ছিল কংগ্রেসের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে তারা মুসলিম লীগকেই কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করেছিল, এবং স্বাধীনতার দাবি ওঠার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা সংবিধান রচনার

১২। Overstreet and Windmiller, 198.
১৩। Sitaramayya, II, 293-94.

নামে মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা তুলেছিল, যা হওয়া কিন্তু কার্যত ছিল অসম্ভব।১৪

এদিকে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে নিয়ে আসা উত্তর আফ্রিকার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাদের নিয়ে একটি ছোট বাহিনী গঠন করতে পেরেছিলেন, এবং জার্মানী প্রবাসী কিছু ভারতীয়ও এতে যোগদান করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষ গোড়ার দিকে কিছু কমিট করতে রাজি না থাকলেও পরবর্তীকালে ১৯৪২-এর জানুয়ারীর মধ্যেই সে বাধা দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, এবং সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহ-যোগীরা বার্লিন রেডিও থেকে ইচ্ছামত ঘোষণার অনুমতি পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র রোম ও প্যারিসেও স্বাধীন ভারত বেতার কেন্দ্র খুলেছিলেন, এবং তাঁর বাহিনীতে লোকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩,০০০। এইভাবে কাজ চালাবার সময় তিনি খবর পেলেন যে জাপানীরা ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিঙ্গাপুর দখল করেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন যে তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। তিনি সেখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

১৯৪২-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে ৪৫,০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী মেজর ফুজিহারার হাতে আসে, যাদের তিনি সমর্পণ করেন পূর্বকথিত ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কাছে।১৫ মোহন সিং এঁদের অনুরোধ করেন এঁরা যেন ভারতের স্বাধীনতার হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বারা গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। কথিত আছে যে যাঁরা যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের উপর দৈহিক পীড়ন চালিয়ে তা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশ সরকারের দ্বারা প্রচারিত এই কাহিনীটি বোধ হয় সত্য নয়, কেননা শাহ্‌নওয়াজ, যিনি নিজেই গোড়ার দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করতে অসম্মত ছিলেন, এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন।১৬ সে যাই হোক ২৫,০০০ ব্যক্তি মোহন সিং-এর প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা ৪০,০০০ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের পতনের দুদিন পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী অফ স্টেট প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্টকে জানালেন যে জাপানী আক্রমণের ফলে যে সমস্যাসমূহ উদ্ভূত হয়েছে সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য ভারতের শক্তি ও সম্পদের একান্ত

১৪। *ibid.*, 298.
১৫। Toye H, *The Springing Tiger,* (1957), 7.
১৬। *ibid.*, 9; Shahnawaz, *I.N.A. and its Netaji* (1946).

প্রয়োজন, এবং সেটা যাতে সম্ভবপর হতে পারে সেইজন্য ভারতের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের একটা বোঝাপড়ার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যেন চার্চিলকে চাপ দেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী চিয়াং কাইশেক, যিনি কিছুকাল আগেই ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়েছিলেন, রুজভেল্টকে জানান যে ভারতের সামরিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা অতীব সঙ্গীন, এবং যদি বৃটিশ সরকার ভারতের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন না করে তাহলে, ভারতবাসীদের পক্ষে জাপানীদের স্বাগত জানানো ভিন্ন আর কোন উপায় থাকবে না। ওইদিনই মার্কিন সেনেটে ফরেন-রিলেশন কমিটির সভায় ভারত প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ফলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর ব্যক্তি দূত ডব্লিউ. এ. হ্যারিম্যানকে, যিনি তখন ইংলণ্ডে অবস্থান করছিলেন, একটি বিশেষ তারবার্তায় ভারত প্রসঙ্গের একটি সমাধানের জন্য চার্চিলকে অনুরোধ করার জন্য বলেন। পরদিন, অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হ্যারিম্যান চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রেসিডেণ্টের বার্তা জানান। ৪ঠা মার্চ চার্চিল একটি পাল্টা তারবার্তায় রুজভেল্টকে জানান যে ভারতের সমস্যা খুবই জটিল, সেখানে দশ কোটি মুসলমান আছে, তিন-চার কোটি অস্পৃশ্য আছে, আট কোটি লোক দেশীয় রাজ্যসমূহের অধীন, কাজেই এই দুঃসময়ে তিনি ভারতবর্ষকে বিশৃংখলার মধ্যে ফেলতে চান না। এর তিনদিন পরে ৭ই মার্চ তারিখে রেঙ্গুনের পতন ঘটল, এবং ১০ই মার্চ রুজভেল্ট চার্চিলকে মোলায়েম ভাষায় একটি মোক্ষম টেলিগ্রাম করলেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের স্বার্থে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে মানতেই হবে কেননা ভারত সংক্রান্ত ফয়সালা হচ্ছে 'পার্ট এণ্ড পার্শেল অফ দি সাকসেসফুল ফাইট দ্যাট ইউ এণ্ড আই আর মেকিং'। এরপর ফল ঘটল হাতে হাতে। পরদিনই চার্চিল পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবর্ষে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য পাঠানো হচ্ছে, এবং তিনি একটি ফরমুলাও নিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে রুজভেল্ট লুই জনসনকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে নয়াদিল্লীতে পাঠালেন, ক্রিপস মিশনের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য।[১৭] ক্রিপস দিল্লীতে হাজির হলেন ২৩শে মার্চ তারিখে।

এবারে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যাবর্তন করব। সিঙ্গাপুরের পতনের পর মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন

১৭। *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers* 1942, I, 593-750.

জাপানে অবস্থান করছিলেন। জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও তিনি ভারতবর্ষের জন্য যথাসাধ্য কাজ করে চলছিলেন। তাঁর উদ্যোগে টোকিয়োতে ১৯৪২-এর ২৮ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে ভারতীয় অফিসারদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর দেশগুলিতে যে সব ভারতীয়রা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ভারতের মুক্তির জন্য যে কোনভাবেই হোক চেষ্টা করছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংহতি প্রার্থনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয় ব্যাংককে, এবং সময় নির্দিষ্ট হয় জুনের মাঝামাঝি।

ক্রিপসের আগমনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ক্রিপস যে প্রস্তাবাবলী ভারতের নেতৃবৃন্দের সামনে রেখেছিলেন সেগুলি হল নিম্নরূপ: পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদাসম্পন্ন একটি নূতন ভারত ইউনিয়নের সৃষ্টি করা হবে; এই উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান প্রস্তুতকারী সংস্থা গঠিত হবে, এবং যদি প্রধান দল ও সম্প্রদায়সমূহ এ বিষয়ে কোন বোঝাপড়ায় আসতে না পারে, তাহলে সংবিধান প্রস্তুতকারী সংস্থা গঠিত হবে নির্বাচনের মাধ্যমে; দেশীয় রাজ্যগুলি ওই সংস্থায় তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাবে; যদি কোন প্রদেশ বা একাধিক প্রদেশ নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে রাজি না হয়, তাহলে সেই প্রদেশ বা প্রদেশগুলি ওই একই নিয়মে নিজেদের গণপরিষদ গঠন করে সংবিধান রচনা করবে; এই সুযোগ দেশীয় রাজ্যগুলিও নিতে পারে; বৃটিশ সরকার ও সংবিধান প্রস্তুতকারী সংস্থার মধ্যে সন্ধি হবে যাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের কাজটা সুসাধ্য হয় এবং যাতে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের পূর্ব ঘোষিত নীতিসমূহ কার্যে পরিণত করার সুবিধা হয়; যতদিন না নতুন সংবিধান তৈরী হচ্ছে ততদিন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যুদ্ধনীতির অঙ্গ হিসাবেই সেনাবাহিনীর উপর বৃটিশ সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে, এবং ভারতবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় বৃটিশ সরকার ভারতীয় সম্পদকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে; সেই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সক্রিয় পরামর্শ নিয়ে চলা হবে।

সত্য বলতে কি সকল তরফের দাবি মিটিয়ে এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার ক্ষমতা ক্রিপস সাহেবের ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি শর্তসাপেক্ষে ক্রিপসের প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল। সকলে একযোগে ক্রিপস মিশনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে যে কথাটা চালু

আছে সেটা ঠিক নয়। কংগ্রেসের আপত্তির কারণ ছিল দুটি। প্রথমটি হচ্ছে এই যে ক্রিপস প্রস্তাবাবলীতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে সংবিধান প্রস্তুতকারী সংস্থায় দেশীয় রাজন্যবর্গের ইচ্ছার উপরেই প্রতিনিধি মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওই সকল রাজ্যের জনসাধারণের অভিমতকে অগ্রাহ্য করে। হিন্দু মহাসভার আপত্তির কারণও ছিল ওই এক, অখণ্ড ভারতের আদর্শকে এখানে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ দিয়ে এবং তাদের নিজস্ব সংবিধান-পরিষদ গঠনের সুযোগ দিয়ে ক্রিপস যদিও পাকিস্তানের দাবি কার্যত মেনে নিয়েছিলেন, তথাপি মুসলিম লীগ গোঁসা করেছিল, কেননা ভারত বিভাগ যে অনিবার্য এবং তা যে করতেই হবে এমন কথা ক্রিপস বলেন নি; আর তাছাড়া ক্রিপস প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান-পরিষদ (নির্বাচনের ব্যাপারে মুসলিম লীগের বিরাগ সুবিদিত কেননা তার অর্থই সংবিধান-পরিষদে হিন্দু প্রাধান্য) সংবিধান রচনা করবে ভারত ইউনিয়নের জন্য, এবং সেই সংবিধান পছন্দ না হলে তবেই বিচ্ছিন্নতাকামী প্রদেশগুলির নিজস্ব সংবিধান রচনায় হাত দেবে। এটা দূরস্থান, ভবিষ্যতের ব্যাপার, তখন হয়ত ঘটনাবলী অন্যরকম মোড় নেবে, পাকিস্তান পরিকল্পনা কেঁচেও যেতে পারে। কাজেই মুসলিম লীগও ক্রিপস মিশনের প্রতি খুশি ছিল না। অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ সম্প্রদায়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ও ক্রিপসের কাছ থেকে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ দাবি করেছিল। শুধু একটিমাত্র দল নিঃশর্তে ক্রিপস মিশনকে স্বাগত জানিয়েছিল, সেটি হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি।[১৮]

ক্রিপস প্রস্তাবে সংবিধান ইত্যাদি দূরবর্তী বিষয়সমূহের প্রতি ভারতবাসীর ততটা আগ্রহ ছিল না, কেননা সেগুলি বৃটেনের যুদ্ধজয়ের পরবর্তী ব্যাপার, আর বৃটেন যে যুদ্ধে জিতবেই সে কথা ১৯৪২ সালে কেউ হলফ করে বলতে পারত না। কাজেই অন্তবর্তীকালীন বিষয়গুলির উপরেই জোরটা পড়েছিল বেশি। এখানে আলোচনাটা মুখ্যত হয়েছিল কংগ্রেসের নেহরু ও আজাদের সঙ্গে ক্রিপসের। মুসলিম লীগ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি, তবে আলোচনার প্রতি পর্যাপ্ত দৃষ্টি রেখেছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছিল বর্ধিত বড়লাটের কার্যপরিষদে নিযুক্ত ভারতীয় সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে, শাসন ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে। যেমন বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদে একজন ভারতীয়কে প্রতিরক্ষা সদস্য হিসাবে রাখা

১৮। Coupland II, 279-80.

হয়েছিল, কিন্তু তা নাম-কা-ওয়াস্তে। তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভারতে নিযুক্ত প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কি হবে তা নির্ধারণ করা হয় নি। আলোচনাকালে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত লুই জনসন উভয় তরফের অনুমতি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং একটি মীমাংসা-- সূত্র উদ্ভাবন করেন যা 'জনসন ফরমুলা' নামে প্রসিদ্ধ। এতে বলা হয় যে ভারতীয় প্রতিরক্ষার বিষয়টিকে সোজাসুজি বৃটেনের হাতে না রেখে, এবং লোক দেখানো একজন ভারতীয় প্রতিরক্ষা সদস্য না রেখে, বরং একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক, শাসন ও প্রতিরক্ষার সমস্ত দায়িত্বই সেই সরকারের হাতে দেওয়া হোক, এবং যুদ্ধাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সেনাপতির হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হোক।

ক্রিপস নীতিগতভাবে এই 'জনসন ফরমুলা' মেনে নেন, এবং ৮ই এপ্রিল তারিখে বিষয়টিকে পাকা করার জন্য বড়লাটের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বড়লাট সরাসরি এই ফরমুলা নাকচ করে দেন, শুধু তাই নয় তাঁর কার্যনির্বাহক পরিষদের প্রতিরক্ষা সদস্যের হাতে কোন ক্ষমতা অর্পণ করতেও অস্বীকার করেন। তথাপি ক্রিপস এই পরিকল্পনাটিকে বৃটিশ সরকারের নিকট টেলিগ্রাম মারফৎ পাঠিয়ে দেন, এবং যাতে তা গৃহীত হয় সেজন্য জোরাল সুপারিশ করেন। পক্ষান্তরে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ইংলণ্ডে পাল্টা টেলিগ্রাম করেন যে বৃটিশ সরকার যেন স্থিতাবস্থার কোন পরিবর্তন না ঘটায়। ক্রিপস বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আর কিছু করার নেই। আসলে চার্চিলের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করেই ক্রিপসের প্রস্তাব নাকচ করেছিল। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার জন্য বৃটিশ সরকারই ছিল সর্বাংশে দায়ী।[১৯]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার দরুণ চার্চিলের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ সরকারকে দায়ী করেছিল। এ বিষয়ে লুই জনসন, যাঁর ফরমুলা ক্রিপস এবং কংগ্রেস উভয় তরফই মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছিল, লিখেছেন যে ক্রিপস যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন, তাঁকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হত তাহলে পাঁচ মিনিটেই সমগ্র বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যেত। কিন্তু সন্তোষজনক সমাধান যখন নিশ্চিত ক্রিপস তাঁকে জানিয়েছিলেন যে চার্চিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে কিছুই হবে না, এবং ভাইসরয় ও ওয়াভেলের বক্তব্যের উপরেই চার্চিল নির্ভর করবেন। ১২ই এপ্রিল তারিখে চার্চিল রুজভেল্টকে তার করে জানান যে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়েছে, এবং যথা-

১৯। Menon V. P., *Transfer of Power in India,* (1957), 128-33.

রীতি ভারতের নেতাদের দায়ী করে নিজ কর্মের সাফাই গান। রুজভেল্ট কিন্তু চার্চিলের বক্তব্যকে আমল দেন নি। ওই দিনই একটি পাল্টা তার করে তিনি জানান যে আমেরিকার জনমত এটা বুঝতে অক্ষম যে ভারতবাসীদের বৃটিশ এভাবে লেজে খেলাচ্ছে কেন। তিনি জানান যে ক্রিপসকে যেন ভারতে আরও কিছুকাল রাখা হয়, এবং তাঁকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। রুজভেল্ট এও জানান যে আঞ্চলিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার কারণে যদি ভারতবর্ষে পৃথক পৃথক রিপাবলিক স্থাপিত হয়, তাতেও ভয়ের কিছু নেই, কেননা খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রও যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত হতে পারে, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার প্রমাণ। ক্রিপস মিশন যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য রুজভেল্ট আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও চার্চিল আর অগ্রসর হতে রাজি হন নি। রুজভেল্টকে তিনি জানান যে মার্কিন জনমত যদি খুশি হয় তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নিতেও রাজি আছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আর অগ্রসর হবেন না, কেননা কংগ্রেসকে তিনি বিশ্বাস করেন না। হ্যারি হপকিন্স, যিনি রুজভেল্টের তরফ থেকে চার্চিলের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে রুজভেল্ট ও চার্চিলের মন পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। অধ্যাপক হ্যারলড লাস্কির মত লোকও ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার জন্য বৃটিশ রাজনীতিকে দায়ী করেছিলেন। কোন কোন ইংরাজ মহল গান্ধীর উপর এই বিষয়ে দোষারোপ করেছেন, কিন্তু ক্রিপস মিশনের সঙ্গে গান্ধীর কোন সম্পর্কই ছিল না, এটা নির্জলা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়।২০

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হবার পর হরিজন পত্রিকার ১৯শে এপ্রিল (১৯৪২) সংখ্যায় গান্ধী লেখেন যে বৃটেন ও ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তা একটিমাত্র অবস্থার উপরই নির্ভরশীল এবং তা হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে বৃটেনের চলে যাওয়া। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জওহরলালের অভিমত ছিল ভিন্ন, তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে বৃটিশকে সাহায্য করতেই হবে। ২৯শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে, গান্ধীকে বাতিল করে জওহরলালের মনোভাবের ভিত্তিতেই একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পূর্বোক্ত ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে গান্ধীর অনুকূলে নিয়ে আসে। এখানে

২০। Sitaramayya II, 326, 331; Louis Fischer, *Life of Gandhi*, (1959), 110-12.

ঘোষণা করা হয় যে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছে যে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বৃটেনের কোন সহানুভূতি নেই। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কংগ্রেস আর কোন শর্তে বৃটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অক্ষম। যদি জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাহলে তা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করা হবে, কিন্তু বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।২১

গান্ধী আবার শেষবারের মত পাদপ্রদীপের সামনে এলেন। ৩রা এবং ১০ই মে তারিখে তিনি লিখলেন যে ভারতে বৃটেনের উপস্থিতিই কার্যত যেন জাপানকে ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একমাত্র বৃটেনের অনুপস্থিতিই জাপানী আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারে। বৃটিশ চলে যাবার পরেও যদি জাপান ভারত আক্রমণ করে তাহলে ভারতীয়রা সেই আক্রমণকে অধিকতর ভালভাবে রুখবে। বৃটিশ চলে গেলে যদি বিশৃংখলা হয়, তা হোক, সেটা একান্তই সাময়িক ব্যাপার হবে। ২৪শে মে তারিখে গান্ধী লিখলেন যে বৃটিশ চলে যাবার পরেও যদি জাপানী আক্রমণ হয়, তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা অহিংস অসহযোগ করবে, এবং বৃটিশের অনুপস্থিতিতে তা আরও কার্যকরীভাবে অনুসৃত হবে। গান্ধীর মতে জাপবাহিনী যদি ভারতবর্ষে আসে তাহলে তা বৃটিশের শত্রু হিসাবেই আসবে, ভারতীয়দের শত্রু হিসাবে নয়।২২ ৭ই জুন তারিখে গান্ধী লিখলেন, আর অপেক্ষা করা চলে না, এবং ঝুঁকি নেবার সময় এসেছে। নেহরু, রাজাগোপালাচারী এবং আজাদ অবশ্য গান্ধীর এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

এদিকে ১৫ই থেকে ২৩শে জুন (১৯৪২) ব্যাংককে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে প্রবাসী ভাকতীয় স্বাধীনতাকামীদের একটি বৃহৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০র বেশি প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এঁরা ছাড়াও যে সকল ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হবার পর মোহন সিং প্রভৃতির প্রভাবে বৃটেনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিলেন, তাঁদের প্রতিনিধিরাও এখানে ছিলেন। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট সংবিধান সহ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠিত হল। এই সম্মেলন ৩৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যেগুলির মধ্যে একটি ছিল সুভাষ বসুকে আমন্ত্রণ। সম্মেলনে স্থির হল যে যুদ্ধবন্দী এবং প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হবে এবং এই বাহিনীর

২১। Coupland II, 288-89
২২। *ibid.*, 290.

নেতৃত্ব করবেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। প্রবাসী ভারতীয়রা এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করবেন, এবং জাপান সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে এই বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কাউন্সিল গঠিত হল। এর সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু।২৩

৬ই জুলাই তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠকে গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কথা তোলেন। তিনি বলেন যে সীমান্তে জাপানীরা এসে গেছে, এবং এই সময় যদি একটি অহিংস আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তাহলে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে বাধ্য হবে। আজাদ ও নেহরু গান্ধীর এই বক্তব্য অনুমোদন করেন নি, কেননা তাঁদের মতে এরকম আন্দোলন শুরু করার জন্য যে প্রস্তুতি থাকার দরকার তা ছিল না, এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই যুদ্ধকালীন বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।২৪ কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীরই জয় হল। ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব নিল। প্রস্তাবে বলা হল যে, শুধু ভারতের স্বার্থেই নয়, ফ্যাসিবাদ ও অপরাপর ধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্যও ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শাসন প্রত্যাহৃত হওয়া দরকার। এও বলা হল যে মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টায় কোন বাধা সৃষ্টি করা কংগ্রেসের অভিপ্রায় নয়, বরং সে প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে কংগ্রেস রাজি আছে, কিন্তু তার আগে বৃটেনকে ভারত থেকে হাত ওঠাতে হবে। এই আবেদন যদি বৃটিশ সরকার নাকচ করে, তাহলে বাধ্য হয়েই কংগ্রেসকে অহিংস আন্দোলন শুরু করতে হবে। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা হল ৭ই আগস্ট (১৯৪২) বোম্বাইতে।২৫

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাব ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বন্দী কমিউনিস্টদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ২৪শে জুলাই (১৯৪২) তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। এরপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত পার্টি হিসাবেই কাজ করতে থাকে, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার দরুণ তাদের বেসামরিক ও সামরিক বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সঙ্গে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি চুক্তির

২৩। Chatterjee A. C, *India's Struggle for Freedom* (1947), 17 ff.
২৪। Azad A. K., *India Wins Freedom*, 73-77.
২৫। Sitaramayya, II, 340-42.

দ্বারা কমিউনিস্টরা বিনা শর্তে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিল, ভারত সরকারের হোম মেম্বার স্যার রেজিনালড ম্যাকসোয়েলের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ ও র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টিও বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করছিল।

কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীর পরম অনুরাগিণী মিস স্লেড, যিনি মীরা বেন নামেই অধিকতর পরিচিতা, মহাদেব দেশাই-এর নির্দেশে বড়লাটের সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বড়লাট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। গান্ধী বুঝতে পারেন যে অতঃপর গভর্ণমেণ্ট অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করবে। তিনিও তাঁর প্রস্তাবিত আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হন।২৬ ৭ই আগস্ট তারিখে বোম্বাইতে প্রস্তাবিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে বিপুল ভোটাধিক্যে অহিংস গণআন্দোলন চালাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গান্ধী তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বলেন যে, "তোমরা প্রত্যেকে এই আন্দোলন শুরু হবার মুহূর্ত থেকে নিজেদের স্বাধীন পুরুষ অথবা নারী হিসাবে মনে করবে, এবং সেইভাবেই কাজ করবে যেন তুমি মুক্ত...পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কোন কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হবে না...আমরা করব অথবা মরব। হয় আমরা ভারতকে মুক্ত করব, না হয় সেই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।"২৭

৮ই আগস্ট তারিখের রাত্রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হয়, এবং ওই দিন মধ্যরাত্রে গান্ধী, আজাদ প্রমুখ নেতাসহ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদেশ, জেলা ও আঞ্চলিক কংগ্রেস সংগঠনের সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, গান্ধীর 'হরিজন' সহ কয়েকটি সংবাদপত্রকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, এবং গণআন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটিশ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে রাজি থাকলেও কংগ্রেস যুদ্ধকালীন সংকটাবস্থার সুযোগ নিয়ে হঠকারী আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজেই যে কোন মূল্যে আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য। বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য

২৬। Azad, 81-82.
২৭। Sitaramayya, II, 342-46.

যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনজন সরকারী সদস্য অনুপস্থিত থাকেন, বড়লাট এবং বারোজন বেসরকারী সদস্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বারোজন সদস্যের মধ্যে এগারোজনই ছিলেন ভারতীয়।২৮

৯ই আগস্ট প্রভাতেই জানা গেল যে গান্ধীসহ কংগ্রেসের নেতারা কারারুদ্ধ হয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল হরতাল, বিক্ষোভ ও বিক্ষিপ্ত গণ-অভ্যুত্থান, এবং বলাই বাহুল্য তা নিছক অহিংস নয়।২৯ প্রথম দিনে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও পুণায় গণ্ডগোল হল। সরকার পক্ষও নিশ্চেষ্ট ছিল না। হাঙ্গামা দমনের জন্য নির্বিচারে লাঠি, গুলি, কোন কোন ক্ষেত্রে মেশিনগানের গুলি, ও কাঁদানে গ্যাসের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটানো হল। ৯ই আগস্ট তারিখেই গোয়ালিয়া ট্যাংক ময়দানে এবং শিবাজী পার্কে অনুষ্ঠিত দুইটি জনসভা থেকে পুলিশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে, এবং প্রথমোক্ত স্থানে গুলি চালায় যার ফলে ৮ জন নিহত এবং ১৬৯ জন আহত হয়। আমেদাবাদের মিলগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিদ্যুতের লাইনগুলি কেটে দেওয়া হয়েছিল, বোম্বাই-এ ফায়ার ব্রিগেড সিগনাল পোস্টগুলি বিনষ্ট করা হয়েছিল। দাদারে ৯ই আগস্ট তারিখে বোম্বে-বরোদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি বগীতে আগুন লাগিয়ে দেবার পর বি.বি.সি.আই. আর ও জি.আই.পি. রেলওয়ের সাবার্বান ট্রেণ-গুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। বোম্বাই নগরীর রাজপথগুলিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীটুপি পরিহিত ব্যক্তি ভিন্ন প্রাইভেট গাড়ী চালাবার অনুমতিও দেওয়া হয় নি। পুণায় একটি অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রত্নগিরি জেলায় জনসাধারণ সরকারী অফিসারদের বয়কট করেছিল, থানা জেলায় জনতা কয়েকটি পুলিশ-থানা দখল করেছিল, সাতারায় নানা পাতিলের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গড়ে উঠেছিল, এছাড়া শোলাপুর, নাসিক ও আহমদনগরেও ব্যাপক হাঙ্গামা হয়েছিল।৩০

গুজরাটে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। নদিয়াদে হরতাল চলেছিল পুরো এক মাস, আমেদাবাদে সাড়ে তিন মাস। সমস্ত কলকারখানা ও বাজার এবং স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল এবং সরকার চেষ্টা

২৮। Coupland, II, 297-98.

২৯। আগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Chakravarti T. S., *India in Revolt, 1942* (1946); Mitra B. and Chakraborty P. (ed.), *Rebel India* (1946); Narain J. P. *Towards Struggle* (1946); Prasad A., *The Indian Revolt of 1942* (1958); Sahai G. *42 Rebellion* (1947); Vidyarthi R. S., *British Savegery in India* (1946).

৩০। Sahai, 87-88.

করেও সেগুলি চালু করতে পারে নি। সরকার আমেদাবাদ পৌরসভাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল, যার ফলে ঝাড়ুদার থেকে পৌরসভার সমস্ত কর্মী ধর্মঘট করেছিলেন। ১২ই আগস্ট তারিখে সরকারের তরফ থেকে জনতার উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। নদিয়াদ, চাকোর, চাকলাসি, ভদ্রন এবং করমসাদে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। নদিয়াদে ৫০ জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ব্রোচে দুজন কংগ্রেসীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী একটি থানা ও তৎসংলগ্ন অস্ত্রাগার দখল করে। অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে ওয়াগ্রা তালুকে। কাঁলোল তালুকে সশস্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ লাগে। পাঁচমহল জেলার সদর দপ্তরটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।৩১

গুণ্টুর জেলা ও বেজওয়াদা অঞ্চলে রেলপথে নাশকতামূলক কাজের ফলে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উড়িষ্যায় বিচ্ছিন্ন আকারে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, বিশেষ করে বালাশোর, কটক ও কোরাপুটে। দশ সহস্র লোকের একটি মিছিলের উপর পুলিশ গুলি-বর্ষণ করেছিল যার ফলে ১৯ জন নিহত ও ১৪০ জন আহত হয়েছিল। কোরাপুট জেলে এত ঠাসাঠাসি করে লোক পোরা হয়েছিল যে দমবন্ধ হয়েই ৫০ জন মারা গিয়েছিল। বালাশোরে পুলিশ মেয়েদের নগ্ন করে উপর দিকে পা এবং নীচের দিকে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিল, এবং সেই অবস্থায় তাদের উপর বেত্রাঘাত করেছিল। নীলগিরি ও তালচের রাজ্যে অভ্যুত্থান চরমে উঠেছিল, এবং শেষোক্ত স্থানে একটি পাল্টা সরকারও বসানো হয়েছিল। তালচেরের অবস্থা এত সাংঘাতিক হয়েছিল যে সামরিক বাহিনী মেসিন গান চালিয়ে অবস্থা আয়ত্তে এনেছিল। তালচেরে সামরিক বিমানও ব্যবহৃত হয়েছিল।৩২

পশ্চিম গোদাবরী জেল্লার ভীমবরমে পতাকা উত্তোলনকালে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়। এরপর ওই স্থানের অভ্যুত্থানকারীরা রেলপথ ধ্বংস করে, সেতু ও পথঘাট বিনষ্ট করে এবং টেলিগ্রাফ টেলিফোন লাইন-গুলি অচল করে দেয়। কোয়েম্বাটোরের সামরিক বিমান ঘাঁটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই স্থান থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি মিলিটারী ক্যাম্পে আগুন দেওয়া হয় এবং দুশোটি ট্যাংক নষ্ট করা হয়। সামরিক বাহিনীর গুলিতে ৩০ জন নিহত হয়। ওই বিস্তীর্ণ এলাকার সকল পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের এক সপ্তাহ একনাগাড়ে দাঁড় করিয়ে

৩১। *ibid.*, 134.
৩২। Vidyarthi, 270.

রেখে দেওয়া হয়। মাদ্রাজের অধিকাংশ কলকারখানাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল কলেজের তো কথাই নেই। রামনাদ জেলাটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরাপর স্থানের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতিশোধ হিসাবে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং পুলিশ বাহিনী ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ করে। গোপাল কেশবন নামক এক ব্যক্তির স্ত্রীকে পর পর দশজন পুলিশ ধর্ষণ করে, এবং তারপর কয়েকজন অস্পৃশ্য পাল্লাজাতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে তার উপর ওই দুষ্কার্য করা হয়, যার ফলে সে নিহত হয়। অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিল বিলংকাট্টুরের আরও চারজন নারীর কপালে।৩৩

দিল্লীতে হরতালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক গোলযোগ দেখা যায়। সরকারী ভবনসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হয়, এবং ১০ই আগস্ট তারিখেই তেরজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। রাজস্থানের যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, ভরতপুর কিষেণগড় কোটা ও শাহপুরে সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়, এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইনসমূহ বহুস্থলেই নষ্ট করা হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, তবে পেশোয়ার, বন্নু, কোহাট ও মাদরানে খুদাই-খিদমৎগারগণ কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা হয়েছিল। করাচীতে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শিকারপুর এবং গরিয়াশীনের ডাকঘর দুটি আক্রান্ত হয়, এবং নবাবশাহ নামক স্থানে একটি মুন্সেফ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সব কাজে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র। পুলিশ বহু ছেলেকে থানায় নিয়ে গিয়ে বেধকড় প্রহার করেছিল।৩৪

বিহারের পাটনা শহরে ১১ই আগস্ট থেকেই অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, এবং ওইদিনেই সামরিক বাহিনীর গুলিতে ৭ জন ছাত্র নিহত এবং বহুজন আহত হয়েছিল। ১২ই আগস্ট রেল যোগাযোগ এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোন যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয় যার ফলে পাটনা শহরটি দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তেঘরা, সিমারাঘাট, রূপনগর এবং বাজওয়ারা থানাগুলি দখল করা হয়। মুঙ্গেরে একটি উড়ো জাহাজ আটক করা হয় এবং তার দুজন বৈমানিককে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে। সুরজগরহা, চৌথাম এবং তারাপুর থানাগুলিও জনগণের কর্তৃত্বে আসে। অনুরূপভাবে মুজফরপুরের কাতরা থানা, লালগঞ্জ এবং বেলসাউদ থানাদ্বয়ও জনতা দখল করে নেয়। ১৬ই আগস্ট মিনাপুর পুলিশ

৩৩। Sahai 320-329; Vidyarthi 203-05.
৩৪। *ibid.*, 397; *ibid.*, 273-75.

থানা আক্রান্ত হয় এবং একজন সাব-ইন্সপেক্টারসহ দুজন কনস্টেবলকে পুড়িয়ে মারা হয়। হাজিপুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে মারাত্মক এলাকা, একটি বিশাল জনতা ১৭ই আগস্ট তারিখে সীতামরীহিতে জনৈক এস. ডি. ও. এবং একজন পুলিশকে পিটিয়ে মারে। সাময়িকভাবে বৃটিশ সরকার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মহানর থানা মদন ঝার নেতৃত্বে ছিল ১৮ই আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভাগলপুরে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতানপুরেও সিয়ারাম সিং-এর নেতৃত্বে অনুরূপ সরকার স্থাপিত হয়। মাধিপুরে সকল সরকারী দপ্তর জনতার হাতে এসে গিয়েছিল। মানঝি, একমা, দিঘওয়ারা, দারাউলি, রঘুনাথপুর, শিশোয়ান, পার্শা, বৈকুণ্ঠপুর, গরখা প্রভৃতি স্থানেও বৃটিশ সরকারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। রূপাউলিতে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে নিহত করার পর উত্তেজিত জনতা পাল্টা পুলিশ-বাহিনীকে আঘাত করে এবং কয়েকজনকে জীবন্ত দগ্ধ করে। কারাবারায় পলায়নরত পাঁচজন ইংরাজ সৈন্য এবং একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই অঞ্চলের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগলাল চৌধুরী যিনি পূর্বে একজন মন্ত্রী ছিলেন। বাহেরা থানাটি দখল করা হয়েছিল খারকির চরিতার সিং-এর স্ত্রীর নেতৃত্বে। রেললাইন ও সেতুসমূহকে ধ্বংস করা হয়েছিল, যার ফলে বি. এন. ডব্লিউ. রেলওয়ে কিছুকালের জন্য বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগণার দেওঘর, সারওয়ান ও পাহাপুরে অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্রফুল্ল পাটনায়েক আদিবাসীদের সংগঠিত করেছিলেন। রাঁচি, ধলভূম এবং জামসেদপুরেও প্রচণ্ড হাঙ্গামা হয়েছিল। টাটা কোম্পানীর ২০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেছিলেন। এমন কি জামসেদপুরের পুলিশবাহিনীও ধর্মঘটের সামিল হয়েছিল, যার ফলে অবস্থা অত্যন্ত ঘোরাল হয়ে গিয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, কার্তিক প্রসাদ, ব্রজকিশোর প্রসাদ সিং, বৈদ্যনাথ ঝা, শ্যামসুন্দর প্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীরা নেপালী তরাই-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি গেরিলাবাহিনী গঠন করার চেষ্টা করছিলেন। দুটি বিপ্লবী পার্টি বিহারে সক্রিয় ছিল সিয়ারাম দল এবং পরশুরাম দল, প্রথম দলটির কর্মকেন্দ্র ছিল ভাগলপুর। দুটি দলই গেরিলা পদ্ধতিতে কাজ করত। বিহারে গণ-অভ্যুত্থান যেমন ব্যাপক হয়েছিল, সেই অভ্যুত্থান দমন করার সরকারী প্রচেষ্টাও তার চেয়ে কম ব্যাপক হয় নি। পুলিশবাহিনীকে যদৃচ্ছা খুন জখম লুঠতরাজ ও নারীধর্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফুলপারশ, লৌকাহি এবং লাখাহা নামক তিনটি গ্রামকে পুলিশ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দিয়েছিল। মুঙ্গেরে সামরিকবাহিনী আকাশ থেকে গুলিবর্ষণ করে-

ছিল। চূড়ান্ত অত্যাচার চলেছিল ভাগলপুরে। বহুস্থলেই পিটুনি কর আরোপ করা হয়েছিল।৩৫

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, আজমগড়, গাজিপুর, বস্তি, মীর্জাপুর, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, বেনারস, জৌনপুর ও গোরক্ষপুরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, এই সকল স্থানে সরকারী সম্পত্তিসমূহ ধ্বংস করা হয়েছিল, রেলপথসমূহ উপড়ে ফেলা হয়েছিল। ১৮ই আগস্ট তারিখে বালিয়া জেলায় অভ্যুত্থানকারীরা সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে জেলার কর্তৃত্ব দখল করেছিল। জেল ভেঙে কংগ্রেসী নেতাদের বার করে আনা হয়েছিল, এবং চিত্তু পাণ্ডের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গড়ে উঠেছিল। গাজিপুর জেলার প্রায় প্রতিটি থানাতেই বিনা প্রতিরোধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। আজমগড়ে পাঁচ হাজার লোকের এক জনতা পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাঁচদিন ধরে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে রেখেছিল। বেনারস থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ নষ্ট করা হয়েছিল। বহু স্থানে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। রাজওয়ারি এবং ইকবালপুরের বিমানক্ষেত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের অভ্যুত্থান দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল, বালিয়া জেলায় বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল, শত শত গ্রামকে মাঠে পরিণত করে অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করা হয়েছিল।৩৬

মধ্যপ্রদেশের সকল জেলাতেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তবে তা ব্যাপক হয়েছিল নাগপুর, ওয়ার্ধা, চন্দা, ভান্দারা, অমরাওতি ও বেতুলে। ১১ই আগস্ট তারিখে নাগপুর শহরটিই বলতে গেলে আগুনের মধ্যে ছিল, তিনদিন সেখানে কোন সরকার ছিল না, সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত ছিল। চিমুরে সরকারী ভবনগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, জনতার হাতে একজন এস. ডি. ও., একজন নায়েব তহশিলদার, ও একজন সার্কেল ইনস্পেক্টরের নৃশংস মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯শে আগস্ট তারিখে সামরিকবাহিনী মধ্যপ্রদেশের কর্তৃত্ব পুনর্দখল করেছিল।৩৭

বাংলাদেশে আগস্ট বিপ্লব শুরু হয়েছিল ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

৩৫। Dutt K. K., *Freedom Movement in Bihar,* III, 142 ff ; Sahai 167 ; Narain 212.

৩৬। Chopra P. N., *Rafi Ahmed Kidwai,* 79-82 ; Deb, J. M., *Blood and Tears* (1945), 65 ; Tendulkar D. G, *Life of Mahatma Gandhi* (1952), VI, 225 ; Vidyarthi 263.

৩৭। Deb, 65 ; *IAR* (1942), II, 196.

কলকাতার পথে পথে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল, বিদেশী মালিকানার ট্রাম গাড়ীগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বালিগঞ্জ সাব-পোস্ট অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইউরোপীয় পোষাক বাঙালীর পক্ষে পরিধান নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কলকাতায় একটি গোপন বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এই বেতার দীর্ঘকাল কার্যকর ছিল। কলকাতায় ৯ই আগস্ট থেকে অভ্যুত্থান শুরু হবার পরই ঢাকা শহরে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঢাকার শাখারিবাজার, সদরঘাট ও তাল-তলায় পুলিশ ব্যাপক গুলিবর্ষণ করেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে ফরিদপুর, বরিশাল, মৈমনসিং, যশোহর ও খুলনায় হাঙ্গামার বিস্তৃতি ঘটে। নদীয়ার মুড়াগাছা রেল স্টেশনটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শিলেটে সরকারী ভবন-সমূহে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে, যেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা প্রাণ দিয়েছিলেন, আন্দোলনের তীব্রতা চরমে উঠেছিল। পুলিশও আন্দোলন দমনের নামে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বহুস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহিষাদল মহকুমায় জনৈক গর্ভবতী নারীসহ ৭৪ জনকে ধর্ষণ করা হয়ে-ছিল, যার ফলে একজন নিহত হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গভর্ণর রাজি হন নি। প্রতিবাদ স্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই নভেম্বর তারিখে মন্ত্রীত্বের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তমলুক মহকুমায় প্রচন্ড পুলিশী নির্যাতন সত্ত্বেও একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার (তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার) স্থাপিত হয়েছিল, এবং তা চলেছিল ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪-এর ৮ই আগস্ট পর্যন্ত, আগস্ট বিপ্লব চলাকালীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারসমূহের মধ্যেই এইটিই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, এবং বৃটিশ সরকার এই জাতীয় সরকারকে বিনষ্ট করতে পারে নি। গান্ধীর একটি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। এই সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশ সামন্ত, এবং সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং তমলুক চারটি থানাই ছিল এই সরকারের কর্তৃত্বে। এই সরকার একটি বিদ্যুৎবাহিনী গঠন করেছিল যার তিনটি শাখা ছিল—যারা যুদ্ধ করবে, যারা গোপন সংবাদ নিয়ে আসবে এবং যারা আহতদের সেবা করবে। এছাড়া একটি গেরিলাবাহিনী, একটি নারীবাহিনী, ও আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। জাতীয় সরকারের নিজস্ব ডাক ব্যবস্থা ছিল, এবং 'বিপ্লবী' নামক একটি সংবাদপত্রও ছিল। আসামে গৌহাটির নিকট সৈন্যবাহী দুটি চলন্ত ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে ১৫০ জন সৈন্যকে নিহত করা হয়েছিল।

মাতঙ্গিনী হাজরার মতই কনকলতা গোহপুর থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। রত্না ফুকন নামক ১৫ বছরের একটি মেয়ে অনুরূপ সাহস প্রদর্শন করেছিল। আসামের নওগাঁ জেলায় আন্দোলন চরমে উঠেছিল এবং সেখানে পাল্টা জাতীয় সরকার গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল।৩৮

আগস্ট আন্দোলন চলাকালীনই কংগ্রেস নেতাদের বৃহত্তর অংশ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং স্থানীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেই এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সমর্থকেরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও, সরকারীভাবে এই আন্দোলনের, এই সহিংস অভ্যুত্থানের দায়িত্ব কংগ্রেস নেয় নি। গান্ধী কতদূর যেতে রাজি ছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শ্লোগানটি তাঁর অহিংসাধর্মের বাইরে চলে যাক, এটা গান্ধী চান নি। পক্ষান্তরে যাঁরা পূর্বে বৈপ্লবিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, এবং কংগ্রেসের তরুণতর সম্প্রদায় যাঁরা কিছু করার জন্য উৎসুক ছিলেন, গান্ধী এবং কংগ্রেসী নেতাদের নেপথ্যবাসের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শ্লোগানটির ব্যাখ্যা তাঁরা নিজেদের মনোমত করে নিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে গান্ধীর একটি ঘোষণাকেও তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন যাতে গান্ধী বলেছিলেন যে অহিংস আন্দোলন চলাকালীন যদি হিংসার উদ্ভব হয়েও যায়, শুধু সেই কারণেই তিনি আর পিছিয়ে আসবেন না। এছাড়া গান্ধী অহিংসার একটি নূতন অর্থও বার করেছিলেন। পোলাণ্ডবাসীরা যৎসামান্য সমরোপকরণ নিয়ে শক্তিশালী জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, গান্ধী সেই সংগ্রামকে অহিংস সংগ্রামের পর্যায়েই ফেলেছিলেন, কাজেই বহু কংগ্রেসী নেতাই এই যুক্তিতে সহিংস সংগ্রামে নেমে পড়তে দ্বিধা করেন নি। মুসলিম লীগ এই আন্দোলন সম্পর্কে কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল যে, যদি এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করে এবং বৃটিশ সরকার চাপে পড়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, তাহলে কংগ্রেসের জয়জয়কার পড়ে যাবে এবং মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তান প্রসঙ্গ তলিয়ে যাবে।৩৯ কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সমর্থন করে নি, কেননা তারা যুদ্ধকালে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিল। শ্রমিক শ্রেণী যাতে ধর্মঘট করে যুদ্ধকালীন জরুরী উৎপাদন-

৩৮। Vidyarthi 107; Chakravarti T. S., I, 47 ff.
৩৯। Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan,* 282-85.

ব্যবস্থাকে ব্যাহত না করে সেই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন শ্লোগান তোলে, 'কাজ এবং কাজ, ধর্মঘট নয়'। অনুরূপভাবে র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও তাদের ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার মারফৎ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

শুধু ১৯৪২ সালেই যে পরিমাণ হতাহত হয়েছিল সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯৪৩-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে শুধু ১৯৪২ সালেই ৫৩৮ বার গুলি চালানো হয়েছে যার ফলে ৯৪০ জন মারা গেছে এবং আহত হয়েছে ১৮৩০ জন। জওহরলাল নেহরুর মতে সরকার ইচ্ছা করেই হতাহতের সংখ্যা কম করে দেখিয়েছে, গুলিতে নিহতের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৬০,২২৯ জনকে, শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ২৬,০০০ জনকে, এবং বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল ১৮,০০০ জনকে। গণঅভ্যুত্থান শুরু হবার প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ২৫০টি রেল স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল, ৮০০ ডাকঘর আক্রমণ. ক্ষতিগ্রস্ত অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ৩৫০০ জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়েছিল, ৭০টি থানা এবং ৮৫টি সরকারী ভবন ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র মেদিনীপুরের কণ্টাই ও তমলুক মহকুমায় যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৮টি সরকারী ভবন বিনষ্ট করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে সরকারী তরফ থেকে ১৯৩টি কংগ্রেস শিবির ও কংগ্রেসকর্মীদের আবাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে, এবং অভ্যুত্থানকারীদের মনোবল একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণ সাংগঠনিক ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে পারস্পরিক কোন বোঝাপড়া ছিল না, এবং তাদের সামনে কোন কর্মসূচীও ছিল না। বহুস্থানেই জনতা ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল, কিন্তু তারপর কি করতে হবে, সে বিষয়ে কারো কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।[৪০] নভেম্বরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি কর্মসূচী প্রকাশ করে যার মূল কথা ছিল, কৃষকেরা খাজনা দেবে না, সরকারের কাছে শস্য ও পশু বিক্রয় করবে না, স্বরাজ পঞ্চায়েত গঠন করে অসহযোগিতা চালাবে, এবং রাস্তা, টেলিগ্রাফ লাইন ও রেলপথসমূহ বিনষ্ট করবে। এইভাবে যুদ্ধরত বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি

৪০। Narain, 215 ff.

করে তাদের পরাজয় নিশ্চিত করে তোলা হবে। বলাই বাহুল্য এই কর্মসূচী দেশের মধ্যে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারে নি।

প্রকাশ্য অভ্যুত্থান যখন ব্যর্থ হল, তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ অন্যপথে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। অধিকতর বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বৈঠক জয়প্রকাশ নারায়ণ কলকাতায় করেছিলেন যার ফলে 'বেআইনী কংগ্রেস সংগঠন' নামে একটি গুপ্ত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে এই দল কিছুটা সক্রিয় হয়েছিল। আগস্ট আন্দোলনের সময় জয়প্রকাশ নেপালে তরাই অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলেন, এবং সেখানে একটি গেরিলা ট্রেনিং কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। নেপাল সরকার জয়প্রকাশ ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করে হনুমাননগর জেলে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু নিত্যানন্দ এবং সূর্যনারায়ণ সিং-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ওই জেল আক্রমণ করে জয়প্রকাশদের মুক্ত করে। ১৯৪২ এর অক্টোবরে এই দলের কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, এবং এই সহিংস গোপন ক্রিয়াকলাপ যাতে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ সমর্থন পায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রদেশের দায়িত্ব এক একজন ডিক্টেটারের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি ডিক্টেটারের হাতে কয়েকটি করে বিভাগ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য কর্মী সংগ্রহ করা হয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষাদানের জন্য বৃটিশ এলাকার বাইরে বাংকরো-কাটাপু নামক একটি স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সর্দার নিত্যানন্দ সিং প্রধান প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রচার দপ্তরের দায়িত্ব ছিল ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার উপর। বিহারের সিয়ারাম দল এবং পরশুরাম দল, উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, বাংলার অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর গ্রুপ এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল। কিন্তু এই বিপ্লব আন্দোলনও ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে সরকারী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল, কিন্তু শুরু থেকেই এই বাহিনীর কাজকর্মে নানান বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় সামরিক অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে থেকেই গোপনে ইংরাজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভিতর থেকেই ওই বাহিনীকে সাবোটাজ করার চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয়ত জাপান সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তার মনোভাব প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল, এবং ভারত সংক্রান্ত জাপানী নীতি কি হবে সে বিষয়েও জাপানের কোন কথা পাওয়া যায় নি। অধৈর্য হয়ে

মোহন সিং জাপান সরকারের কাছে একটি চরমপত্র দেন এবং ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তর দাবি করেন। এতে রাসবিহারী বসু ক্ষুণ্ণ হন এবং তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন, কিন্তু মোহন সিং প্রত্যুত্তরে অপমানজনক ভাষায় রাসবিহারীকে চিঠি দেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নির্দেশ দেন যে যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে ওই অফিসারেরা যেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেন, এবং পুনরায় তা গঠিত হলে তাতে যেন যোগদান না করেন। শৃংখলা ভঙ্গের কাজ হিসাবে মোহন সিং-এব এই কাজকে রাসবিহারী গ্রহণ করেন, এবং এর পরিণতি হিসাবে মোহন সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যার সামাল দেওয়া রাসবিহারীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।[৪১]

৪১। Chatterjee 35 ff.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ঘটনাচক্র (১৯৪৩-৪৫)

১৯৪২-এর আগস্টে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের যখন তুঙ্গাবস্থা, মুসলিম লীগ তখন যে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তারের পর জিন্না একটি বিবৃতিতে কংগ্রেসী নীতির সমালোচনা করেন, এবং ওই আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার উপদেশ দেন। ২০শে আগস্ট তারিখের মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই বৈঠকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে আবেদন জানানো হয় যে দশ কোটি মুসলমানের সার্বভৌমত্ব ও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। এদিকে হিন্দু মহাসভা, তাদের ডিসেম্বর মাসের কানপুর অধিবেশনে প্রস্তাব নেয় যে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা যে কোন মূল্যে করতে হবে, কিন্তু হিন্দু মহাসভার পক্ষে এইটাই ছিল সবচেয়ে অসুবিধার যে হিন্দু জনসাধারণের সমর্থন ওই দলের উপর ততটা ছিল না যতটা ছিল কংগ্রেসের উপর। এদিকে বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভাগুলি ইতিমধ্যে পুরোপুরি মুসলিম লীগের কর্তৃত্বে এসে গিয়েছিল, এবং ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সিকন্দার হায়াৎ খানের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবেও ওই দলের প্রভাব প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যে এলাকাগুলি পাকিস্তান বলে চিহ্নিত হয়েছিল, ইতিমধ্যেই সেই সব এলাকাগুলিতে কার্যত জিন্না অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ তথা জিন্নার আশংকার কারণ ছিল অন্যত্র। ১৯৪২-এর ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশনে একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর জোর দিয়েছিলেন, এবং সেটাই ছিল মুসলিম লীগের আশংকার হেতু।১

আগস্ট আন্দোলন চলাকালীন গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পত্রালাপ চালিয়েছিলেন। এই চিঠি লেখালেখি চলেছিল ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, উভয়েই একে অপরকে অবস্থার অবনতির জন্য দায়ী করেছিলেন তাঁদের লিখিত এই পত্রাবলীতে। ২৯শে জানুয়ারী (১৯৪৩)

১। Coupland, II, 299-304; Menon, 113 ff.

তারিখে গান্ধী অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আজাদের মতে গান্ধী আগস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়েছিলেন, এবং তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি অনশন করেছিলেন।২ ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ গান্ধী অনশন করেছিলেন, এবং অনশনকালীন সময়ে তাঁকে সরকার মুক্তি দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। যথারীতি গান্ধীর অনশনে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। গান্ধীকে সরাসরি মুক্তি না দেবার প্রতিবাদে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের তিনজন সদস্য পদত্যাগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনশন ভালোয় ভালোয় কেটেছিল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিও ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের অনুকূলে এসে পড়েছিল, এবং এর প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের উপর নিদারুণভাবে ঘটেছিল। গান্ধীর অনশনের সময়ই রাজাগোপালাচারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এবং পাকিস্তান মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে জিন্নার সঙ্গে আলোচনার তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন। এতে গান্ধী কোন আপত্তি করেন নি, এবং এরপর থেকে রাজাগোপালাচারী নিয়মিত জিন্নার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন।

এদিকে যখন দেশের অভ্যন্তরে অবস্থা এইরকম, সুভাষ বসু ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩) তারিখে জার্মানী ত্যাগ করেন এবং ১৩ই জুন তারিখে টোকিয়োয় উপনীত হন। পরদিনই তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তোজো সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এরপর তোজো জাপানী ডায়েট বা পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে জাপান ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে ভারতবাসীকে সর্বতোভাবে সাহায্য কববে।৩ এরপর সুভাষচন্দ্র টোকিও রেডিও থেকে ঘোষণা করেন যে তিনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। সুভাষচন্দ্রের এই বেতার ভাষণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে রীতিমত উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এবং ২রা জুলাই যখন সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আসেন তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৪ঠা জুলাই তারিখে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বসহ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, রাসবিহারী যে তা সামাল দিয়ে উঠতে পারছিলেন না তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ২৫শে আগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব নেন, এবং

২। Azad, 91.
৩। Toye, 79.

ওই বাহিনীর আমূল পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। সমগ্র বাহিনীকে তিনি পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, প্রত্যেক শ্রেণীর উপর বিশেষ-বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া ভারতীয় নেতাদের নামে তিনি কয়েকটি ব্রিগেড গঠন করেন। গান্ধী, আজাদ ও নেহরু ব্রিগেড থেকে বাছাই করা লোকেদের নিয়ে এক নম্বর গেরিলা রেজিমেন্ট গঠিত হয় মালয়ের তাইপিং-এ ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে, এবং এর অধিনায়কত্ব অর্পিত হয় শাহনওয়াজ খানের উপর। সুভাষচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও এই রেজিমেন্টের নামকরণ হয় সুভাষ-ব্রিগেড।৪

এরপর সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ সিঙ্গাপুরে সমবেত হন, এবং ২১শে অক্টোবর (১৯৪৩) ক্যাথে হলের একটি জনসভায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।৫ ২৩শে অক্টোবর এই জাতীয় সরকার বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ঘোষণাটি সুভাষচন্দ্র নিজে বেতার মারফৎ প্রচার করেন, এবং সানফ্রানসিস্কো বেতার তা সর্বত্র প্রচার করে। কয়েকদিনের মধ্যেই নয়টি রাষ্ট্র স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকার করে নেয়। এই রাষ্ট্রগুলি হচ্ছে জাপান, জার্মানী, ইটালী, ক্রোয়াশিয়া, বর্মা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও মাঞ্চুরিয়া। ২৮শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র টোকিও যাত্রা করেন, এবং জাপসম্রাট স্বয়ং তাঁকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে স্বাগত জানান। ৬ই নভেম্বর টোকিয়োয় অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্রের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন।৬

এদিকে সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম বাহিনীটি ৯ই নভেম্বর (১৯৪৩) তারিখে তাইপিং পরিত্যাগ করে এবং শেষ বাহিনীটি যাত্রা করে ২৪শে নভেম্বর তারিখে। প্রথম বাহিনীটির যাত্রাকালে এক অভূতপূর্ব আবেগময় দৃশ্যের অবতারণা হয়। অসুস্থ সৈন্যরা চিকিৎসকদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাদেরও সঙ্গে নেবার দাবিতে ইঞ্জিনের সামনে শুয়ে পড়ে। অনেক বুঝিয়ে তাদের নিরস্ত করা হয়।৭ ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র চীন ও ফিলিপাইন হয়ে সিঙ্গাপুরে আসেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি স্বাধীন ভারতীয়

৪। Chatterjee 38; Shah Nawaz, 102 ff.
৫। Ayer in *Netaji Research Bureau Bulletin* II, 7.
৬। *ibid*, 8-9.
৭। Shahnawaz, 105.

ভূখণ্ড আন্দামানে পদার্পণ করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম বদল করে রাখা হয় যথাক্রমে শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

এই সময় ভারতের অভ্যন্তরের ঘটনাবলীতে আসা যাক। ২০শে অক্টোবর (১৯৪৩) তারিখে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো সাড়ে সাত বছর ধরে কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন, এবং তাঁর স্থলে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হন। ১৯৪৩-এই বাংলাদেশে ঘটেছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রচণ্ডতম দুভিক্ষ, যেখানে ইংরাজ সরকারের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের, এবং বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম লীগ প্রভাবিত সরকারের ভূমিকা ছিল তার চেয়েও খারাপ। অগস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার পর থেকে, এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সাফল্য দেখে, কংগ্রেস একটা হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পেঁছে গিয়েছিল, এবং অতঃপর বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসে ক্ষমতা পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান প্রস্তাবে এবং ভারত বিভাগে কংগ্রেস নেতৃবর্গের একটা বড় অংশ রাজি হয়ে গিয়েছিল, এবং রাজাগোপালাচারীর মত নেতারা মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। কংগ্রেস কার্যত ডিমরালাইজড হয়ে গিয়েছিল, নেতাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এটাই হয়েছিল মুসলিম লীগের সামনে সবচেয়ে বড় সুযোগ। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত করাচীতে মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে গান্ধীর কুইট ইণ্ডিয়া শ্লোগানের অনুকরণে নতুন শ্লোগান উঠেছিল ডিভাইড এণ্ড কুইট।

১৯৪৪-এর জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সুভাষ ব্রিগেড রেঙ্গুনে এসে পেঁছায়। ৪০০ মাইল পথ তারা পদব্রজে আসে, দিনে গড়পড়তা ২৫ মাইল করে হেঁটে। সুভাষচন্দ্র নিজে রেঙ্গুনে আসেন ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে, এবং সেখানে একটি সদর দপ্তর স্থাপন করেন। ৭ই জানুয়ারী তারিখে তিনি বর্মাস্থিত জাপানী প্রধান সেনাপতি কোয়াবের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হন, এবং এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধনীতি নির্ধারিত হয়। স্থির হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্বতোভাবে ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং জাপানী সৈন্যবাহিনী অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করবে। যে সকল ভারতীয় ভূভাগ মুক্ত হবে তা আজাদ হিন্দ সরকারের হাতেই অর্পিত হবে, এবং সর্বক্ষেত্রেই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতীয় পতাকা ওড়ানো হবে। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে জেনারেল কাটাকুরার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও শাহনওয়াজের একটি গোপন বৈঠক হয়। কাটাকুরা প্রস্তাব করেছিলেন যে স্থলপথে অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথেও অভিযান করা হবে এবং কলকাতা শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা হবে, কিন্তু এই প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র রাজি না হওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত

হয়।৮ অর্থ সংগ্রহের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের তাদের সম্পত্তির হিসাব দিতে বলা হয়, এবং তার শতকরা দশ থেকে পঁচিশ ভাগ পর্যন্ত লেভিস্বরূপ আদায় করার নীতি অবলম্বন করা হয়।৯

স্থির হয়েছিল যে সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান প্রোম হয়ে আরাকানের কালাদান উপত্যকায় যাবে এবং দু নম্বর এবং তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ান যথাক্রমে মান্দালয় ও কালেওয়া হয়ে হাকা এবং ফালামের চিন-পাহাড় এলাকায় যাবে। ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সুভাষচন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে সৈন্যবাহিনীকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন।১০ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ান ট্রেনযোগে প্রোম অভিমুখে যাত্রা করে। প্রোম থেকে তারা পদব্রজে তাউনগুপ ও ম্যো-হাইঙ্গ হয়ে আকিয়াবে কালাদান নদীর তীরে কিয়াউকতো নামক স্থানে উপস্থিত হয়। মার্চের মাঝামাঝি এই বাহিনী বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে, যা নিগ্রো সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল, পরাজিত করে, যার ফলে তারা নদীর ওপারে পালাতে বাধ্য হয়। বৃটিশবাহিনীর ২৫০ জন নিহত হয়েছিল এবং তাদের ৬টি বোটও ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহতের সংখ্যা ছিল ১৪ এবং আহতের সংখ্যা ছিল ২২।

দু নম্বর এবং তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ান ৪ঠা এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন ত্যাগ করে মান্দালয়ের কালেওয়া নামক স্থানে পৌঁছায়। সেখানকার জাপানী সেনাপতি তাদের হাকা-ফালাম ফ্রন্টটি রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন, যেখানে চিন-পাহাড়ের উপর দুটি জাপানী ঘাঁটি ছিল। হাকা ও ফালাম রক্ষা করার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তারা ক্লানখুয়া থেকে মেজর ম্যানিং-এর নেতৃত্বাধীন বৃটিশ বাহিনীকে হটিয়ে দেয়, এবং ক্লাঙ্গ-ক্লাঙ্গের বৃটিশ ঘাঁটি দখল করে নেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই দক্ষতায় জাপানীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, এবং অতঃপর স্থির হয় যে ওই বাহিনীর একটি অংশ কোহিমায় যাবে, এবং ইম্ফলের পতন হলে তারা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে সোজাসুজি বাংলাদেশে হাজির হবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ফলে দু নম্বর ও তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ানের যথাক্রমে ১৫০ ও ৩০০ জনকে হাকা ও ফালামে রেখে বাকি সকলকে কোহিমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।১১ মার্চের গোড়াতেই আজাদ

৮। *ibid.*, 106-11.
৯। Toye, 95.
১০। *ibid.*, 103; Shahnawaz, 113.
১১। Shahnawaz, 134.

হিন্দ ফৌজ জাপানী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে উখরুল ও কোহিমা দখল করে।১২ ওই অঞ্চলের দায়িত্ব আজাদ হিন্দ সরকার নেয়, এবং কোহিমার পর্বতশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। অবশ্য কোহিমা অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা সামান্য অংশ সামিল হয়েছিল। সুভাষ ব্রিগেডের বেশির ভাগ অংশই তখন ছিল পিছনে এবং তারা কোহিমা অভিমুখে ততক্ষণে অগ্রসর হয়েছিল।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহর জাপানী অভিযানের লক্ষ্য ছিল, এবং এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সহকারী দল হিসাবে কাজ করছিল। সুভাষ-চন্দ্র জানতেন যে সেখানে পাঁচ ডিভিশন বৃটিশপক্ষীয় সৈন্য ছিল, এবং তাঁর পরিকল্পনা ছিল ওই ডিভিশনগুলির ভারতীয় সৈন্যদের সাজসরঞ্জাম সহ দখল করতে পারলে, তাদের এ পক্ষে এনে আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব, আর সেটাই করা দরকার।১৩ এই মতলবেই ইম্ফলের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের পাহাড়ী পথগুলি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং বৃটিশবাহিনী চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইম্ফল ত্যাগ করতে পারে নি। ১৯শে মার্চ (১৯৪৪) আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্বপ্রথম বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে। বৃটিশ বাহিনী টিড্ডিম-মণিপুর রাস্তা ধরে ভিতরের দিকে এগিয়ে যায়। ২১শে মার্চ তারিখে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ওই একই দিনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো জাপানী ডায়েটে ঘোষণা করেন যে আজাদ হিন্দ সরকার মুক্ত অঞ্চলগুলির দখল নেবে।১৪

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের গান্ধী ব্রিগেড মার্চের গোড়াতেই রেঙ্গুনে পেঁছিছিল, এবং সেখান থেকে এপ্রিলে ইম্ফল অভিমুখে যাত্রা করেছিল। আজাদ ব্রিগেডও অনুরূপভাবে মালয় থেকে রেঙ্গুনে আসে এবং কালেওয়ার পথ ধরে এপ্রিলের শেষাশেষি যাত্রা করে মে মাসের মাঝামাঝি টামু নামক স্থানে পেঁছায়। গান্ধী ব্রিগেড পূর্বেই শুনেছিল যে ইম্ফলের পতন আসন্ন, কিন্তু আজাদ ব্রিগেড পেঁছানোর কিছু আগেই গান্ধী ব্রিগেড টামুতে পেঁছিছিল, এবং সেখানে পেঁছে সংবাদ পেয়েছিল যে ইম্ফলের পতন ঘটেনি এবং ইম্ফল ও টামুর মাঝামাঝি পালেল নামক স্থানের চারদিকে

১২। Chatterjee, 180.
১৩। Shahnawaz, 100.
১৪। Toye, 102, 107.

প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। আসলে জাপানীরা ইম্ফলের পতনের সম্পর্কে অত্যন্ত নিঃসন্দেহ ছিল, এবং সেই কারণেই তারা তাদের বিমানবহর এবং সৈন্য-বাহিনীর একটা বড় অংশকে প্রশান্তমহাসাগর অভিমুখে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কেননা সেখানে আমেরিকার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ লড়াই চলছিল। জাপানী বিমানবাহিনীর অন্তর্ধানের সুযোগে বৃটিশ আরাকান থেকে বিমান-যোগে পুরো এক ডিভিশন সৈন্য ইম্ফলে নামিয়ে দিয়েছিল। জাপানীদের হিসাব ছিল এই যে তারা মে মাসের মাঝামাঝি ইম্ফল দখল করতে পারবে, এবং তারপর বর্ষা এলে বৃটিশ বাহিনীর পক্ষে প্রতি আক্রমণ সম্ভব হবে না, এবং সেই সুযোগে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে বাংলা ও বিহারে সোজাসুজি গিয়ে পড়া যাবে। কিন্তু এই পরিকল্পনায় প্রকৃতি বাদ সেধেছিল, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বর্ষার আগমন ঘটে গিয়েছিল, যার প্রচণ্ড দাপটে জাপানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে মে মাসের শেষের দিকে সুভাষ ব্রিগেডের অবশিষ্ট অংশ যখন কোহিমায় এসে পেঁাছায়, তখন সেখানকার জাপানী সেনাবাহিনীর চরম দুরবস্থা চলছে, এবং তারা টামু অভিমুখে চলে যাচ্ছে দলে দলে। জাপানী বিমানবাহিনীর অনুপস্থিতি তাদের মনোবল বিনষ্ট করে দিয়েছিল, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ডিমাপুর ও কোহিমা থেকে বৃটিশ বাহিনী ইম্ফলে প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছিল। কোহিমাতে যতদূর সম্ভব তাদের প্রতিরোধ করা গিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ তা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, এবং প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে একহাঁটু কাদার ভিতর দিয়ে অতি কষ্টে তারা টামুতে এসে পেঁাছেছিল। ওদিকে গান্ধী ও আজাদ ব্রিগেডও ওই অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল। এখান থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্যালেল বিমান ঘাঁটি আক্রমণ ও অধিকার করেছিল। সেখানে জাপানীদের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। ওই বিমান ঘাঁটি দখলে রাখা অসম্ভব বিবেচনায় তারা বিমান ঘাঁটিটিকে বিনষ্ট করে দেয়, এবং সেখানে থাকা বিমানগুলিও ধ্বংস করে। জুন মাসের মাঝামাঝি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। লেফটেন্যান্ট আজাইব সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সাফল্যের সঙ্গে তীব্র বৃটিশ আক্রমণ প্রতিহত করে। লেফটেন্যান্ট মনসুখ লাল, যাঁর দেহে তেরটি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল, এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড বর্ষায় টামু প্যালেল রাস্তাটি ডুবে গিয়েছিল, এবং এই রাস্তাটাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের রসদ আসার একমাত্র পথ। প্রচণ্ড খাদ্যাভাব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, সকল যোগসূত্রই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র দূরের থেকে জানতে পারছিলেন না ভিতরে কি হচ্ছে। যে

দুশো বর্গমাইল স্থান ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ দখল করেছিল, তা পরিত্যাগ করে আসতেও তাদের মন চাইছিল না। স্থানীয় নাগা উপজাতিরা এই দুঃসময়ে তাদের কিছু খাদ্যবস্তু দিয়ে সাহায্য করেছিল।[১৫]

জুলাই-এর গোড়ার দিকে খাদ্যহীনতায় ও রোগে গান্ধী ব্রিগেডের ২,০০০-এর মধ্যে ১,০০০ সৈন্য মারা গিয়েছিল। এই সুযোগে বৃটিশ বাহিনী তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, এবং তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। কিন্তু এবারেও মেজর আবিদ হোসেনের তৎপরতায় বৃটিশ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ওই স্থানে অবস্থান করা আর আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে ইম্ফল রণাঙ্গনেও জাপানীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে গান্ধী এবং আজাদ ব্রিগেডের উপর নির্দেশ গিয়েছিল কালেওয়া অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করার জন্য। ইতিপূর্বেই অনেক কষ্ট সহ্য করে সুভাষ ব্রিগেড ছিন্নভিন্ন অবস্থায় চিন্দুইন নদীর পূর্ব তীরে চলে এসেছিল। ইম্ফলে যারা লড়ছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত জাপানীদের সঙ্গে ওই একই অঞ্চলে ফিরে আসে। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্রিয়াকলাপের হিসাব-নিকাশ দিতে গিয়ে শাহনওয়াজ খান লিখেছেন : "এই সময়ের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ, অত্যন্ত নিম্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, এবং ততোধিক দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও, ভারতীয় ভূখণ্ডের ১৫০ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। যে সকল ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ চালিয়েছে, এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যে আমাদের বাহিনী পরাজিত হয়েছে, এবং এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যে শত্রুপক্ষ, তাদের সৈন্যবল ও উৎকৃষ্ট সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও, আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ঘাঁটিও দখল করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে এরকম উদাহরণ পাওয়াই যায় না যে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন বৃটিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে তা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সকল অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রায় চার হাজার সৈন্যকে হারিয়েছিল, যারা মৃত্যুবরণ করেছিল রণক্ষেত্রেই।"[১৬]

কি অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে লড়তে হয়েছিল তার কিছু পরিচয় দেওয়ার দরকার। জাপানী সৈন্যদের রসদ ও সরঞ্জাম বহনের জন্য পশু ও কুলি দেওয়া হয়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের তা ছিল না। তাদের রেশন ছিল শুধুমাত্র চাল এবং লবণ, এবং তাও সব সময় নয়। দুধ, চিনি, চা তারা চোখেই দেখেনি। শীত ছিল প্রচণ্ড, একটি জামা ভিন্ন কিছুই

১৫। **Shahnawaz, 151-56.**
১৬। *ibid.*, 159.

তাদের ছিল না, অনেকের জুতোও ছিল না, প্রচণ্ড শীতে অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছিল। ঔষধপত্র ও চিকিৎসক ছিল না বললেই চলে। মশারি ছিল না, ফলে প্রচুর সৈন্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। বহু সময় তাদের লিংরা নামক এক জাতীয় ঘাস খেয়েই জীবন ধারণ করতে হয়েছে, এছাড়া পার্বত্য পতঙ্গের আক্রমণে অনেকের দেহে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার যন্ত্রণায় অনেকে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু এতেও সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। শাহনওয়াজ লিখেছেন যে যখন চিন্দুইন নদীর পূর্ব তীরে পিছিয়ে যাবার পরিকল্পনাটি জানাজানি হয়ে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে একটি ডেপুটেশন তাঁর কাছে এসেছিল, যাঁরা তাঁকে বলেছিলেন যে প্রত্যাবর্তন করার চেয়ে তাঁরা যে কজন আছেন, সোজাসুজি যুদ্ধ করেই প্রাণত্যাগ করবেন, জাপানীরা ফিরে যাক। শাহনওয়াজও এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু জাপানীরা এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্রের নিকট সব কিছু জানিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যে তিনি যেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কঠোর নির্দেশেই তারা কালেওয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে রাজি হয়েছিল।[১৭] কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তাদের এরকম মনোবল বজায় ছিল না, যা আমরা পরে দেখব।

একদিকে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, তখন ভারতবর্ষের ভিতরের চিত্র অন্যরকম। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' দাবি ত্যাগ করেছে। ২৭শে জুলাই (১৯৪৪) তারিখে গান্ধী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে লিখলেন যে যদি বৃটিশ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতকে স্বাধীনতা দেবে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং ইতিমধ্যে একটি জাতীয় সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, যে সরকার যুদ্ধকালীন ইংরাজদের কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করবে না, তাহলে কংগ্রেস সর্বান্তঃকরণে ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। পরদিনই, অর্থাৎ ২৮শে জুলাই তারিখে, ভারতসচিব বৃটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন যে গান্ধীর প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে কোন আলোচনা আরম্ভ করার পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। এই প্রত্যাখ্যানে হতাশ হয়ে গান্ধী স্থির করলেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে তার যদি একটা সমঝোতা হয়ে যায়, তাহলে উভয় তরফের চাপের সামনে বৃটিশ সরকার হয়ত নতি স্বীকার করবে। গান্ধী, জিন্নার সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে, এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈঠক চলল। এই বৈঠকে গান্ধী নিজের থেকেই ভারত বিভাগ মেনে নিলেন।

১৭। *ibid.*, 126-38.

এতে জিন্নারই সুবিধা হল সবচেয়ে বেশি। বাংলা, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার অবস্থা ভাল ছিল না। পাঞ্জাবের মুখ্য-মন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনে আসতে অস্বীকার করেছিলেন। এই সকল ব্যাপারে জিন্নার প্রচণ্ড মর্যাদাহানি ঘটছিল। গান্ধী ভারত বিভাগ মেনে নেওয়াতে জিন্নার পায়ের তলার মাটি আবার শক্ত হয়ে উঠল।১৮

ইম্ফল যাত্রার সময় আই.এন.এ. ডিভিশনে সৈন্যসংখ্যা ছিল ছ' হাজার, ফিরে এসেছিল দু হাজার ছ'শো, তার মধ্যে দু হাজার লোককে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। যুদ্ধে চারশো সৈন্য নিহত হয়েছিল, এবং প্রায় পনের শো লোক রোগে ও অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরেই সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে জাপানীরা কার্যক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ডুবিয়েছে। সরবরাহের ব্যাপারে কিংবা যুদ্ধে জাপানীদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় নি। জাপানীদের বিরুদ্ধে তীব্র রাগ, আপন সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে খিন্ন হতাশ ভাব, এই রকম মেজাজ নিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর বর্মার পথে রওনা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বচক্ষে সব দেখতে লাগলেন। হিকারি-কিকান নামক একটি দলের উপর ছিল সরবরাহের ভার। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য পাঠানো মালপত্র তারা জাপানীদের ভাণ্ডারে তুলেছিল, তাদের জন্যই কোন রেশন্ মেলে নি। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন যে অতঃপর তিনি এ সব জিনিসের প্রতি স্বয়ং নজর রাখবেন, আই.এন.এ. এবং জাপানী কমাণ্ডারদের মধ্যবর্তী হিকারি-কিকানের কর্তৃত্ব অবসান ঘটাবেন। ৯ই অক্টোবর তারিখে সুভাষচন্দ্র জাপানের নূতন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসোর কাছ থেকে টোকিও যাত্রার আমন্ত্রণ পেলেন, এবং ২৯শে অক্টোবর তারিখে চ্যাটার্জি ও কিয়ানিকে নিয়ে তিনি টোকিও যাত্রা করলেন। টোকিওয় গিয়ে তিনি দেখলেন উচ্চতম জাপানী কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি রীতিমত সহানুভূতিশীল, এবং তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে আই.এন.এ.কে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, তার জন্য বর্মা ও ভারত সীমান্তের স্থানীয় জাপানী নেতৃত্বই দায়ী। জাপান সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পুনরায় চুক্তি হল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তার নিজস্ব সামরিক বিধি মেনে চলবে, সরবরাহের ক্ষেত্রে হিকারি-কিকানদের প্রভুত্ব থাকবে না, এবং সমস্ত কিছুই সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলবে।

১৯৪৪-এর নভেম্বরে কিন্তু যখন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিপর্যয়ের

১৮। Menon, 160 ff.

আরও বড় বড় লক্ষণ এবং জাপানের উপর প্রচন্ড বিমান আক্রমণ সুভাষচন্দ্র দেখতে পেলেন, যখন তিনি শুনলেন বর্মায় জাপানীরা বলবৃদ্ধি করা দূরের কথা বরং সেখান থেকে সৈন্যদের সরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে, তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, জাপানীদের কপাল পুড়েছে। ১৪ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলেন এবং দেখলেন যে প্রশাসনিক ব্যাপার নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের বিরোধ লেগেছে, টোকিওর কর্তারা যাই বলুন না কেন, স্থানীয় জাপানীরা গায়ের জোরে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করছে। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির জয় অবধারিত এই রকম মনোভাব জেগে উঠেছে, ব্যবসায়ীরা আজাদ হিন্দ তহবিলে টাকা জোগাতে কার্পণ্য করছে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নতুন সদস্য কমই আসছে, এবং সবচেয়ে দুর্ভাবনার কথা, আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগ ঘটছে ব্যাপকভাবে। ডিসেম্বর মাসেই বৃটিশ বাহিনী মায়ু উপত্যকা থেকে জাপানীদের হটিয়ে দিয়ে নিম্ন কালাদানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ১লা জানুয়ারী (১৯৪৫) আকিয়াব অধিকৃত হল, ১৪ই জানুয়ারী বৃটিশ বাহিনী থাবেইকিন নামক স্থানে ইরাবতী অতিক্রম করল, এবং অপর একটি বাহিনী নিওঙ্গুতে ইরাবতী অতিক্রম করে মেকটিলা দখল করার মতলব করল। নিওঙ্গু নিয়ে জাপানীরা মাথা ঘামায় নি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি ধীলন মাত্র ১২০০ সৈন্য নিয়ে বারো মাইলব্যাপী নদীতীর পাহারা দিচ্ছিলেন। নিওঙ্গুতে নদী অতিক্রম করার সময় ধীলন প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কিন্তু কিছু করা গেল না, অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিনি মেকটিলার পথে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আই.এন.এ. ডিভিশনের নতুন এলাকা কিওকপাদোং-এ পিছু হটে এলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং রণাঙ্গন পরিদর্শনের জন্য ভারতীয় অফিসার বাহিনী নিয়ে রেঙ্গুন থেকে যাত্রা করলেন। এদিকে মেকটিলায় তখন প্রচন্ড বিমান আক্রমণ চলছে এবং সেখানে জাপানীরা কোনরকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

জাপানীদের শক্ত ঘাঁটি ছিল মাউণ্ট পোপায়। সুভাষচন্দ্র মেকটিলা থেকে শাহনওয়াজকে পাঠালেন প্রকৃত অবস্থাটা জেনে আসার জন্য। ২২শে ফেব্রুয়ারী পোপায় পেঁৗছে শাহনওয়াজ দেখলেন যে, যে ১২০০ সৈন্য ধীলনের হাতে ছিল তাদের অনেকেই দলত্যাগ করেছে, শ'চারেক সৈন্য মাত্র তাঁর হাতে রয়েছে। শাহনওয়াজ এও বুঝলেন যে ধীলনকে নিওঙ্গুতে কার্যত অসাধ্য সাধন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জাপানী সমর-বিশারদরা বুঝতেই পারে নি যে থাবেইকিন দিয়ে ইরাবতী পার হওয়াটা বৃটিশের একটি কারসাজি, সৈন্যবাহিনীর মূল অংশকে তারা পাঠিয়েছিল

নিওঙ্গুতেই। শাহনওয়াজ এই সংবাদ সুভাষচন্দ্রকে জানাবার পর তিনি নিজেই মাউণ্ট পোপায় যেতে চাইলেন, এতে তাঁর নিজের প্রাণেরও ঝুঁকি ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী যখন তিনি পোপায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন জানা গেল যে বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী আর ষোল মাইল দূরে, মেকটিলায় তাদের আসা রোধ করা যাবে না, মাউণ্ট পোপায় যাবার পথ সম্ভবত বিচ্ছিন্ন এবং রেঙ্গুনগামী রাস্তাতেও বাধা পেতে হতে পারে। সুভাষচন্দ্র, শাহনওয়াজ, সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজু, এবং একজন জাপানী অফিসার একটি জীপে করে অতঃপর পিনমানায় চলে এলেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। সেখানে স্থানীয় শিবিরস্থ ১ম ডিভিশনের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে একটি রেজিমেণ্ট তৈরীর নির্দেশ তিনি দিলেন। এই নতুন অনামী রেজিমেণ্ট উত্তরে কয়েক মাইল দূরে ইয়েজিনে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে, বাকি আড়াই হাজার অসুস্থ সৈন্যকে টঙ্গুর দক্ষিণে জেওয়াড্ডিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এইরকম নির্দেশও তিনি দিলেন। ২রা মার্চ রেঙ্গুনের হেড কোয়ার্টার থেকে জরুরী খবর এল অবিলম্বে তাঁর রেঙ্গুন আসা দরকার। সেখানে গিয়ে তিনি দুঃসংবাদ পেলেন যে মাউণ্ট পোপার ২য় ডিভিশনের পাঁচজন স্টাফ অফিসার দলত্যাগ করেছে, তাদের স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণপত্র ছাপিয়ে শত্রু বিমান থেকে আই.এন.এর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ফেলা হয়েছে, আশংকা হয়েছে এবারে আরও বহু লোক দল থেকে বেরিয়ে আসবে। সুভাষচন্দ্র যদি পোপায় যেতে পারতেন তাহলে হয়ত এ অবস্থা হত না।

১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ ধীলনের রেজিমেণ্ট টংজিনের কাছে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করেছিল। এদিকে ২রা এপ্রিল থেকে বৃটিশ বাহিনী মাউণ্ট পোপায় ব্যাপক আক্রমণ চালালো। সেই আক্রমণের তীব্রতার সামনে প্রতিরোধের ক্ষমতা আই.এন.এর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত বৃটিশ বাহিনীর জয়লাভের সংবাদ তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। ব্যাপকভাবে দলত্যাগও ঘটছিল, কাজেই ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি সেগল নিজের উদ্যোগেই পশ্চাদাপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পশ্চাদাপসরণকারী একটি বাহিনী ১২ই এপ্রিল তারিখে বৃটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হল, অনেকেই ধরা পড়ল বা ধরা দিল, কিন্তু বাগড়ি নামক একজন ক্যাপ্টেনের অধীনস্থ শ'খানেক সৈন্য নিছক হাতবোমা ও পেট্রোলের বোতল সম্বল করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে সকলেই নিহত হয়েছিলেন। ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ইয়েজিনস্থ আই.এন.এ. বাহিনীর সংঘর্ষ হল, এক্ষেত্রেও বৃটিশ বাহিনীকে রোখা গেল না। বৃটিশ বাহিনী তখন প্রবল বিক্রমে রেঙ্গুন অভিমুখে ছুটে আসছে। ১৭ই

এপ্রিল সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন শহরের বাইরে বিভিন্ন ছাউনিতে অবস্থিত ছ' হাজার সৈন্যকে সংগঠিত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগের সংকল্প নিয়েছে, ২৩শে এপ্রিল তারিখে তাঁকে সরকারীভাবে জানানো হল যে জাপান বিনা যুদ্ধেই রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবে। হতাশাগ্রস্ত সুভাষচন্দ্রের সামনে তখন একটি মাত্রই রাস্তা খোলা ছিল। যতদূর সম্ভব স্বপক্ষের লোকেদের নিয়ে শ্যাম ও মালয়ে প্রত্যাবর্তন। আই.এন.এ. সৈন্যদের ব্যাপকভাবে অপসারণের সময় ছিল না। ২৪শে এপ্রিল রাত্রে সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে পূর্বদিকে পাড়ি দিলেন। ৪ঠা মে (১৯৪৫) বৃটিশ বাহিনী রেঙ্গুন পুনর্দখল করল। ১৩ই মে তারিখে শাহনওয়াজ, ধীলন এবং সেই সঙ্গে আরও বারোজন পেগুতে আত্মসমর্পণ করলেন। বর্মা নাট্যমঞ্চের যবনিকাপাত ঘটল।

এই সময়টায় ভারতের অভ্যন্তরে জমে উঠেছিল অন্য আর এক ধরনের নাটক। গান্ধী-জিন্না আলোচনায় গান্ধী জিন্নার ভারত বিভাগের দাবি মেনে নেবার পর কংগ্রেস মুসলিম লীগের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল, বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তীকালীন ভারতীয় সরকারের কথা ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং মুসলিম লীগ নেতা লিয়াকত আলি একটি পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন একটি সরকার গঠনের পরিকল্পনা করলেন। গান্ধী ও জিন্না উভয়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, দেশাই-এর কাছ থেকে একথা জানার পর ওয়াভেল পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে তা ভারত-সচিবের নিকট পাঠালেন। কিন্তু জিন্না আকস্মিকভাবে ঘোষণা করলেন যে দেশাই-লিয়াকত পরিকল্পনা তাঁর অজানা, আর গান্ধী জানালেন যে এই পরিকল্পনাটির পিছনে তাঁর আশীর্বাদ ছিল। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস পরিকল্পনাটি বর্জন করে। ভুলাভাই দেশাই প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অপসৃত হন।[১৯] অতঃপর ওয়াভেল ২৩শে মার্চ (১৯৪৫) ভারত সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। সেখানে প্রায় তিন মাসব্যাপী আলোচনার পর ৪ঠা জুন তারিখে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং ১৪ই জুন তারিখে একটি বেতার ঘোষণা মারফৎ জানান যে শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ শুরু হবে। বড়লাটের কর্মপরিষদেরও পুনর্গঠন করা হবে, যাতে বড়লাট ও জঙ্গীলাট ছাড়া আর সব সদস্যই হবে ভারতীয়। এই কাজ সম্পন্ন হলে প্রদেশগুলিতেও আবার দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সব বিষয়

১৯। *ibid.*, 176-79.

আলোচনা করার জন্য তিনি ২৫শে জুন সিমলায় একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। ১৫ই জুন তারিখে বন্দী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হল। কয়েকদিন পরে বোম্বাই-এ একটি বৈঠকে কংগ্রেস নেতারা সিমলা সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। বাকি দলগুলি তো যোগদানের জন্য মুখিয়ে ছিল। বাইরে থেকে সুভাষ বসু এই সম্মেলনের তীব্র সমালোচনা করলেন। সিমলা সম্মেলনকে তিনি বরাবরকার বৃটিশ চালবাজির অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করলেন।

সিমলা সম্মেলনে কোনটা মূল বিষয় হবে অল্পদিনের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সমপ্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হল। জিন্না বললেন বড়লাটের কর্মপরিষদের যে অর্ধাংশ মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হবে তা পুরোদস্তুর মুসলিম লীগের লোক নিয়ে হওয়া চাই। পক্ষান্তরে বক্তব্য ছিল সর্বসম্প্রদায়ের মিলিত সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস মুসলিম আসনে মুসলিম প্রার্থী মনোনয়ন করবে। কংগ্রেসকে নিছক বর্ণহিন্দুর প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করার একটা মতলব এই সম্মেলনে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিন্নার জন্যই সিমলা সম্মেলন কেঁচে গেল। জিন্না বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও মুসলিম সদস্যদের বক্তব্য যাতে বজায় থাকে তার জন্য রক্ষাকবচ দাবি করে বসলেন। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৪ই জুলাই সিমলা সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বসে, এবং তারপরই লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে সিমলা সম্মেলন কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। ২০

এদিকে ব্যাঙকক থেকে সুভাষচন্দ্র ওয়াভেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমানে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বড়লাটের কর্মপরিষদে কয়েকটি চাকরীর বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চুলোয় দেওয়া হচ্ছে। এতে শুধু বড়লাটেরই স্বরাজ হবে আর কারো নয়। বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সকলকে মুক্তি দেয় নি, এবং যুদ্ধ চলাকালে কোন আইন তৈরী করতে রাজি হয় নি, এ থেকেই তার কপটতা প্রমাণিত হচ্ছে। জার্মানিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে হারিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও স্বাধীনতা অর্জনের নির্ভুল পদ্ধতি হল ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতি। বৃটিশের এখন বেজায় গরজ। ৫ই জুলাই বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন, রক্ষণশীল দল যাতে বেশি ভোট পেতে পারে তার জন্য লর্ড ওয়াভেল চান নির্বাচনের আগেই মিটমাট করে ফেলতে। ভারতবর্ষ যেন এই ফাঁদে পা না দেয়।

২০। *ibid*, 182 ff.

এদিকে ১৩ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে শুনলেন যে জাপান আত্ম-সমর্পণ করবার উপক্রম করেছে। পরদিন তিনি সরকারীভাবে সংবাদটি জানলেন। তাঁর মন্ত্রিসভা নিয়ে তিনি আলোচনায় বসলেন, এবং সিদ্ধান্ত হল এই যে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও অতঃপর আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই। সুভাষচন্দ্র বললেন যে বাকি সকলের সঙ্গে থেকে তিনিও আত্মসমপণের সম্মুখীন হতে চান, কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা বললেন যে তাঁর উচিত কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর সহযোগীদের কথায় মত দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি রুশিয়ার সঙ্গে যোগা-যোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অবস্থার চাপে তা সম্ভবপর হয় নি। মাঞ্চুরিয়ায় রুশদের অগ্রগতির সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন, সম্ভবত তারা ততদিনে দাইরেনে এসে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্থির করেছিলেন তিনি রুশিয়ার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন।

১৫ই আগস্ট বিকালে টোকিও বেতারে জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হল। সুভাষচন্দ্রও তাঁর শেষ হুকুমনামা ও বেতার বক্তৃতা তৈরী করে ফেললেন। সিঙ্গাপুরের জাপানী সেনাপতিদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ পাওয়া গেল না। তারা নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল, একা অথবা দল বেঁধে হারাকিরি করতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত একজন সেনাধ্যক্ষকে পাওয়া গেল যিনি সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। ১৬ই আগস্ট ভোর পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর মন্ত্রিদের নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর শেষ নির্দেশগুলি কার্যকর করার জন্য তিনি একটি কমিটি তৈরী করলেন, এবং মেজর জেনারেল কিয়ানিকে সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত করলেন।

১৬ই আগস্ট তারিখে সকাল সাড়ে নটায় আয়ার ও হবিবুর রহমানকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ব্যাংককে এসে পৌছালেন। সেখানে তিনি মেজর ভোঁসলে ও জাপানী সেনাপতি ইসোদার সঙ্গে আলোচনা করার পর সদলে সাইগনে এলেন। সাইগনে এসে জানা গেল যে আই.এন.এর আত্ম-সমর্পণের ব্যাপারে কোন নির্দেশ টোকিও থেকে আসে নি। খবরটা দেবার পরে জেনারেল ইসোদা সুভাষচন্দ্রকে জানালেন যে তিনি মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন হয়ে বিমানপথে টোকিও যাচ্ছেন, ওই বিমানে একটি আসন খালি আছে. এবং সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। পরে আরও একটি আসনের ব্যবস্থা হল, সুভাষচন্দ্র ও হবিবুর রহমান তাতে উঠে বসলেন। ১৮ই আগস্ট দ্বিপ্রহরে বিমানটি হাজির হল ফরমোজায়। যাত্রীরা দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। বিমানে নতুন করে তেল ভরা হল। বেলা আড়াইটা নাগাদ বিমানটি ছাড়বার ঠিক পরেই তার সামনের পাখার একটি

অংশ খুলে পড়ে গেল, এবং বিমানটি সোজা মাটিতে এসে ধাক্কা খেল। সুভাষচন্দ্র গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। হবিবুর রহমান, যিনিও সামান্য আহত হয়েছিলেন, সারাদিন হাসপাতালে সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তাহলেও বিকালে দোভাষীকে ডেকে তিনি ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি মুখে মুখে তৈরী করিয়ে নিলেন। রাত্রি আটটা নাগাদ তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে হবিবুর রহমানকে ডেকে তিনি বললেন, 'হবিব মনে হচ্ছে আমি আর বেশিক্ষণ নেই, শেষ পর্যন্ত আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়েছি।' (১৮ই আগস্ট (১৯৪৫) তাইহোকুর জাপানী সামরিক হাসপাতালে নাম্মন ওয়ার্ডে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়।) (২০শে আগস্ট তারিখে তাঁকে তাই-হোকুতে দাহ করা হয়।) (২১শে আগস্টের আগে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বাইরের কেউ জানতে পারে নি।) ওই দিন দিল্লী বেতারকেন্দ্র থেকে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হয়।২১

চার্চিলের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং যুদ্ধকালীন অতুলনীয় নেতৃত্ব সত্ত্বেও রাজনীতি সচেতন বৃটেনের অধিবাসীরা জুলাই-এর সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলকেই বিজয়ী করেছিল। চার্চিলের বদলে ক্লেমেণ্ট এটলী প্রধানমন্ত্রী হন, এবং স্যার পেথিক লরেন্স ভারতসচিবের পদে নিযুক্ত হন। বৃটেনের শ্রমিকদলের সরকার তাদের পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, কিন্তু কিভাবে এই ক্ষমতার হস্তান্তর কার্যকর করা হবে সেটাই ছিল চিন্তার বিষয়। ২১শে আগস্ট লর্ড ওয়াভেলকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয় যে আসন্ন শীতকালে ভারতীয় আইনসভাগুলির নির্বাচন হবে, এবং ২৪শে আগস্ট ওয়াভেল লণ্ডন রওনা হয়ে যান। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ঘোষণা করেন যে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান করবে, এবং অতঃপর ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ করবে। প্রধানমন্ত্রী এটলীও একই সঙ্গে একটি ঘোষণায় জানান যে ভারতবাসীরা যেন ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আরোপ করে এবং তা যেন যতদূর সম্ভব সর্বজন-গ্রাহ্য হয়।২২ এরপরেই নির্বাচনী দামামা বেজে ওঠে। নির্বাচনে অংশ-গ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগই ছিল প্রধান। মুসলিম লীগের একমাত্র নির্বাচনী দাবি ছিল ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান,

---

২১। Ayer A. S., *Unto Him a Witness*, 49-54.
২২। Menon, 218-20

পক্ষান্তরে কংগ্রেসের দাবি ছিল যতদূর শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর। ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ওয়্যার্কিং কমিটির বৈঠকে ভারতের ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়, এবং বলা হয় যে অতঃপর কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে সরাসরি মুসলিম জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, এবং তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে মুসলিম স্বার্থরক্ষার পুরো ব্যবস্থা থাকবে।২৩

বিগত দু বছর কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের অধিকাংশের জেলে থাকার দরুণ কংগ্রেস সংগঠন রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের জনপ্রিয়তারও হানি হয়েছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু একটি ঘটনা পুনরায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল, এবং তা হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার। ইতিপূর্বে ভারতীয় জনগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সংবাদ জানত না, কিন্তু লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের ঘটনা সারা দেশে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সুভাষ বসুর কার্যকলাপ আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কাহিনী আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত করেছিল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ বিচারালয়ে ও তার বাইরে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং অভিযুক্ত আই.এন.এ. অফিসারদের পক্ষে ব্যারিস্টার হিসাবে দাঁড়ান তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই ও জওহরলাল নেহরু। পরে কংগ্রেসের দেখাদেখি মুসলিম লীগ আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ অবলম্বন করে। কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষ বসুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল না, তাঁর সঙ্গে জাপানীদের যোগাযোগ কংগ্রেস ভাল চোখে দেখে নি, এবং অনেক কংগ্রেস নেতাই বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র তাঁর বাহিনীসহ যদি ভারতে প্রবেশ করেন তাহলে তাঁরা তার প্রতিরোধ করবেন। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস আই.এন.এ. বিচারে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এবং ডঃ মজুমদারের মতে তা তারা করেছিল মুখ্যত নির্বাচনী প্রয়োজনে।২৪

৪ঠা ডিসেম্বর হাউস অফ লর্ডসে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন যে সকল দলের সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল ভারত পরিভ্রমণে আসবে, এবং ভারতের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে কিভাবে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্থান পেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করবে।২৫ ভারতবর্ষকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে তা এই প্রথম সরকারীভাবে ঘোষিত হল। ডিসেম্বরের শেষদিকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, হিন্দু এলাকাগুলিতে কংগ্রেস এবং

২৩। *ibid.*, 222.
২৪। Majumdar III, 749.
২৫। Menon, 223-24.

মুসলিম এলাকাগুলিতে মুসলিম লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করল, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাবে কংগ্রেস পেয়েছিল ৯১·৩, লীগ পেয়েছিল ৮৬·৬। কেন্দ্রীয় আইনসভায় দলীয় পরিস্থিতি দাঁড়াল নিম্নরূপ: কংগ্রেস ৫৭, মুসলিম লীগ ৩০, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৫, আকালি ২, ইউরোপীয় ৮।২৬ প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগই প্রাধান্য লাভ করেছে, যদিও মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলির সবকটিতেই মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি।

২৬। *ibid.*, 226.

ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৪৬-এর ৫ই জানুয়ারী অধ্যাপক রবার্ট রিচার্ডসের নেতৃত্বে দশজন সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল ভারতে এলেন, এবং কিছুকাল ভারতে অবস্থান করে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। জিন্না তাঁদের বললেন যে সংবিধান রচনাকারী দুটি সংস্থা গঠন করা দরকার, একটি মুসলমানদের জন্য। তিনি এও জানালেন যে পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলির পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি তিনি চান না। নেহরু তাঁদের জানালেন যে যদি বৃটিশ সরকার ভারত ভাগাভাগি করেন, তাহলে সীমান্তের জেলা-গুলির ক্ষেত্রে যেন গণভোট গ্রহণ করা হয়।[১]

৬ই জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সংস্থা একটি বুলেটিন জারি করে জানাল যে কংগ্রেসই দেশের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন এটা নির্বাচনের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ১১ই জানুয়ারী তারিখে মুসলিম লীগ তাদের বিজয়োৎসব পালন করল। ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন যে তিনি নূতন কার্য-নির্বাহক পরিষদ গঠন করবেন, এবং একটি সংবিধান রচনাকারী সংস্থাও যতদূর সম্ভব শীঘ্র গঠন করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে বড়লাটের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হতে দেরী হয়েছিল। সেটি হচ্ছে নৌবিদ্রোহের ঘটনা।

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এর নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'তলোয়ার' জাহাজের ১৫০০ নাবিক খারাপ খাবার খেতে অস্বীকার করেন। নৌবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয়েরা পদস্থ অফিসারদের মুখ থেকে যে কুরুচিপূর্ণ ভাষা শুনতেন, বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য খেতে বাধ্য হতেন, ভারতীয় বলেই যে ভিন্ন ব্যবহার পেতেন, তার ফলে স্বভাবতই তাঁরা ইংরাজবিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয় নাবিকেরা দেখেছিলেন যে একই কাজে নিযুক্ত ইংরাজেরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা, ভাল খাবার, বেশি বেতন পায়। ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, কয়েকটি বিশেষ অবিচারের ঘটনা

১। *ibid.*, 227.

'তলোয়ার' জাহাজের নাবিকদের বিক্ষুব্ধ করেছিল, এবং তারই প্রকাশ ঘটেছিল খারাপ খাবার খেতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে।

এই ঘটনাটি বারুদের স্তূপে আগুন দেবার মতই কাজ করেছিল। পরদিন, অর্থাৎ উনিশে ফেব্রুয়ারী, নাবিকেরা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর নাম বদলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভী রাখেন এবং কেবলমাত্র তাঁরা জাতীয় নেতাদের আদেশ পালন করবেন এই কথা ঘোষণা করেন। ওই দিন ক্যাসাল ব্যারাকে বোম্বাই-এর সমস্ত রণতরী এবং ১৯টি বন্দর কেন্দ্রের নাবিকেরা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেলেন। বিদ্রোহ করাচী, মাদ্রাজ ও কলকাতার নাবিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাসাল ব্যারাকের বিদ্রোহী নাবিকদের ঠাণ্ডা করতে পাঠানো হয়, কিন্তু বিদ্রোহীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা নিজেদের ব্যারাকে ফিরে যায়। পরে বৃটিশ সৈন্যরাও এসে কিছু করতে পারেনি। বোম্বাই, পুণা ও অন্যান্য স্থানের বিমান বাহিনীর পাইলট ও কর্মীরাও ধর্মঘট করেন। তবে নৌবাহিনীর মত প্রতিরক্ষার আর কোন শাখায় বিদ্রোহ অত ছড়িয়ে পড়েনি। বোম্বাই-এর নৌবাহিনীতে কয়েকদিন সরকারের অস্তিত্বই ছিল না।

নৌবিদ্রোহীরা ভেবেছিলেন, বিদ্রোহ করে নৌবাহিনীকে জাতীয় নেতাদের হাতে সমর্পণ করলেই নেতারা এগিয়ে আসবেন। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ঘটেছিল উল্টোটি। নেতারা নাবিকদের ডুবিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা অরুণা আসফ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, এবং তাঁকে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী, নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাক, বোম্বাই থেকেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীগঙ্গাধর অধিকারী একটি বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কাছে ওই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেন। কংগ্রেসের নেহরু, প্যাটেল ও আজাদ বিদ্রোহীদের নিন্দা করেন, আর জিন্না তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন। আর গান্ধী পুণায় প্রার্থনা সভায় বলেন যে যদি ইংরাজদের ব্যবহার নাবিকদের পছন্দ না হয় তাঁরা পদত্যাগ করতে পারেন। নৌবাহিনী থেকে যে কেউ পদত্যাগ করতে পারে না এ খবর গান্ধী রাখতেন না। নেতাদের মনোভাব বৃটিশ সরকার সহজেই বুঝতে পেরেছিল। অতঃপর বিদ্রোহ দমন করতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় নি।[২]

এদিকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড সভায় লর্ড পেথিক লরেন্স এবং

২। Dutt B. C., *Mutiny of the Innocents* (1970).

কমন্স সভায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এটলী জানালেন যে ভারতের স্বাধীনতা প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে আসবেন যাতে থাকবেন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস, এবং ফার্স্ট লর্ড অফ অ্যাডমিরালিটি মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার।৩ এই সংবাদ সারা ভারতেই বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, কেননা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাপনা করতে যেটুকু সময় লাগবে, স্বাধীনতা পেতে তার চেয়ে বিলম্ব হবে না।

২৪শে মার্চ (১৯৪৬) তারিখে ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীতে উপনীত হলেন। ৩রা এপ্রিল তারিখে কংগ্রেসের তরফ থেকে মিশনের সামনে বক্তব্য রাখলেন কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। সেই বক্তব্যের মূল কথা ছিল, স্বাধীনতার পূর্বে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে, যা পূর্ণ দায়িত্বশীল হবে, এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংস্থা তৈরীর যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় প্রদেশগুলির ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন থাকবে। ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে আজাদ কংগ্রেসের যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তা হচ্ছে এই যে এই সংবিধানের প্রকৃতি হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রদেশসমূহ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা ও কাজকর্মের সুস্পষ্ট ভাগাভাগি থাকবে। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধী দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন, পক্ষান্তরে জিন্না দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি করেন। আম্বেদকর যে কোন ধরনেরই সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠনের বিরোধিতা করেন, কেননা সেইরকম সংস্থায় বর্ণহিন্দুদেরই প্রাধান্য থাকবে। শিখনেতা গিয়ানি কর্তার সিং পৃথক সার্বভৌম শিখিস্থানের দাবি তোলেন।৪ ১০ই এপ্রিল জিন্না বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লীতে একটি কনভেনশন আহ্বান করে সার্বভৌম পাকিস্তান ও তার পৃথক সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠনের দাবি জানালেন।৫

১৬ই মে তারিখে ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের বক্তব্যসমূহ প্রকাশ করে দেখালেন যে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না, কেননা তাতে পাকিস্তানে হিন্দু এবং অবশিষ্ট ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘু শ্রেণী হিসাবে থেকেই যাচ্ছে। পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান মিলিয়ে জনসংখ্যার ৬২·০৭ মুসলমান এবং ৩৭·৯৩

৩। Menon, 234.
৪। *ibid.*, 237-40.
৫। See Banerjee and Bose, *The Cabinet Mission in India.* (1946)

অমুসলমান, এবং বাংলা ও আসামের জনসংখ্যার ৫৮·৬৯ মুসলমান এবং ৪১·৩১ অমুসলমান। এছাড়া পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি ও শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানের মধ্যে যেতে পারে না। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের নিজস্ব অখণ্ড সংস্কৃতি বর্তমান, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অভিন্নতা ধর্মীয় ভিন্নতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি-শালী, কাজেই এই প্রদেশগুলির ভাগাভাগি একটি অবাস্তব চিন্তা। তাই ক্যাবিনেট মিশনের মতে যদি প্রদেশগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা যায় ও তাদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায়, তাহলেই সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সকল তরফই বজায় রাখতে পারবে। মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির শাসনকার্যে স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকবে। ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। বাকি সমস্ত ক্ষমতাই প্রদেশগুলির উপর ন্যস্ত হবে। প্রদেশগুলি নিজেদের সংবিধান নিজেরাই রচনা করবে, তবে তারা ইচ্ছা করলে সমস্বার্থবিশিষ্ট এক বা একাধিক প্রদেশ নিয়ে জোট বাঁধতে পারে, এবং সেই অবস্থায় একটি সাধারণ সংবিধানও রচনা করতে পারে যা জোটের অন্তর্গত প্রতিটি প্রদেশই মেনে চলবে। কোন প্রদেশ কার সঙ্গে জোট বাঁধবে তারও একটা ইঙ্গিত ক্যাবিনেট মিশন দিয়েছিলেন, প্রদেশগুলিকে ক, খ এবং গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে, যার ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯৩ জন হবে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি, বাকি ২৯২ জন সদস্য বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় ইতিপূর্বে নির্বাচিত সদস্যদের থেকে নেওয়া হবে। ক শ্রেণীর প্রদেশগুলি (মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা) থেকে নেওয়া হবে ১৮৭ জন (১৬৭ সাধারণ, ২০ মুসলমান), খ শ্রেণী (পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু) থেকে নেওয়া হবে ৩৫ জন (৯ সাধারণ, ২২ মুসলমান, ৪ শিখ), এবং গ শ্রেণী (বাংলা, আসাম) থেকে নেওয়া হবে ৭০ জন (৩৪ সাধারণ ৩৬ মুসলমান)। এরপর গণপরিষদের চেয়ারম্যান ও অপরাপর পদাধিকারীদের নির্বাচনের পর, এবং অনুন্নত অঞ্চল ও জাতিসমূহের জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের পর, প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পৃথকভাবে তাঁদের এলাকার প্রদেশগুলির সংবিধান রচনা করবেন।

ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশসমূহের মধ্যে বাস্তবতাবোধ ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় ছিল।[৬] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দলীয় দৃষ্টিকোণ

৬। Majumdar, *op.* cit., III, 766-67.

থেকে প্রস্তাবিত বক্তব্যসমূহের সমালোচনা করলেও, সেগুলি সরাসরি নাকচ করার যুক্তি খুঁজে পায় নি, তারা প্রস্তাবের অংশবিশেষ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিল। যে দৃষ্টিকোণে ক্যাবিনেট মিশনকে আসলে সমালোচনা করা চলে, তা হচ্ছে এই যে মাঝারি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয় নেতাদের মত ক্যাবিনেট মিশনও সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতাই ভারতের একমাত্র সমস্যা বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণকে তাতানো ক্ষেপানোর মূলে যে নেতাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি কাজ করছে, এগুলি আসলে সৃষ্ট সমস্যা, আসল সমস্যা ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষার, তা ক্যাবিনেট মিশন ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যে গণ-পরিষদ গঠন নিয়ে এত কথা ক্যাবিনেট মিশন বলেছেন, সেই পরিষদে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের যাবার কোন উপায় রাখা হয় নি। ক্যাবিনেট মিশন নিজেই স্বীকার করেছেন যে প্রাদেশিক আইনসভার যে নির্বাচন ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছিল তাতে জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিধিত্বের প্রকাশ ঘটেনি। যেমন আসামের এক কোটি জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার নির্বাচিত প্রতিনিধি ১০৮ জন যেখানে ছয় কোটিরও অধিক জনসংখ্যাযুক্ত বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র ২৫০ জন। এছাড়া সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণের নামে এলোপাথারিভাবে তাদের আসন দেওয়া হয়েছিল যা সেই সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বেশি। ক্যাবিনেট মিশন এটা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সমস্যার যে দাওয়াই তাঁরা দিয়েছিলেন, তাতে প্রাদেশিকতার প্রতি সুবিচার থাকলেও বৃহত্তর জনজীবনের স্বার্থের সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল না। তাঁরা বলেছিলেন যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের দিয়েই, যাঁরা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন নি, গণপরিষদের নির্বাচন করতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে এই নির্বাচনে প্রদেশগুলির মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হয়। প্রতি দশ লক্ষের একজন প্রতিনিধি, এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে, যেমন ১০৮ জন সদস্যবিশিষ্ট আসামের আইনসভা ১০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে এবং ২৫০ জন সদস্যযুক্ত বাংলাদেশের আইনসভা ৬০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। গণপরিষদের মত একটা বৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হল মুষ্টিমেয় আইনসভার সদস্যের উপর; বৃহত্তর জনসাধারণের, যাদের জন্য এই সংবিধান, তাদের কোন ভূমিকা রাখা হল না। এর উপরও চাপিয়ে দেওয়া হল ৯৩ জন প্রতি-ক্রিয়াশীল দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি, যাঁদের সঙ্গে সেই রাজ্যগুলির জনগণের সম্পর্ক নিছক খাদ্যখাদকের। সাবালক নরনারীর সার্বজনীন

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা ও গণপরিষদ গঠনের কি বাধা ছিল? ক্যাবিনেট মিশন বলেছিলেন তা করতে গেলে স্বাধীনতা দিতে দেরি হবে। এটা যুক্তি নয় কুযুক্তি। বাধা ছিল অন্যত্র। ক্যাবিনেট মিশন জানতেন, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ এলে, তাঁদের এতদিনের চেনা মুখগুলির দেখা সেক্ষেত্রে হয়ত মিলত না।

ক্যাবিনেট মিশন উপরিউক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তায় যত শীঘ্র সম্ভব একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুপারিশ করেছিলেন। এবং তাই নিয়েই লেগেছিল ধুন্ধুমার। ২৫শে মে তারিখে আজাদ বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কাছে পত্র মারফৎ জানতে চান যে এই প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রকৃতি কিরকম হবে, তার ক্ষমতার পরিধিই বা কতখানি। ৩০শে মে তারিখে বড়লাট তাঁকে জানান যে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সবকারের কার্যকলাপে সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকবে। এদিকে ৬ই জুন মুসলিম লীগের কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করে, এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ক্ষমতা জিন্নার উপর অর্পণ করে।

৮ই জুন তারিখে জিন্না বড়লাটকে লেখেন যে বড়লাট তাঁকে পূর্বে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শাসন পরিষদের ১২ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন থাকবে মুসলিম লীগের, পাঁচজন কংগ্রেসের, একজন শিখদের তরফ থেকে ও একজন ভারতীয় খৃষ্টান অথবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের তরফ থেকে। বড়লাট জানান যে তিনি এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে তিনি জিন্নার এই বক্তব্য নেহরুর কাছে পোঁছে দেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব বাতিল করে। অতঃপর লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের আরও একজন সদস্য বাড়িয়ে দেন, এবং জানান যে ওই বাড়তি সদস্যকে তফশিলী সমাজ থেকে নিতে হবে। কংগ্রেস এ প্রস্তাবও বাতিল করে। ফলে যে অচলাবস্থার উদ্ভব হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট মিশন এবং বড়লাট ১৬ই জুন তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, যাতে বলা হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৪ জনকে নিয়ে গঠিত হবে। সেই ১৪ জনের নামও দিয়ে দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে একজন তফশিলী সহ ৬ জন কংগ্রেসের, ৫ জন লীগের, এবং একজন করে যথাক্রমে শিখ, খৃষ্টান ও পার্শীদের প্রতিনিধির নাম ছিল। নেহরু এবং জিন্না উভয়ের নামই তালিকায় ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছিল যে যদি কোন পক্ষ সরকারে যোগদানে অনিচ্ছুক হয়, তাহলেও বড়লাট তাঁদের নিয়ে সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন, যাঁরা ১৬ই মে-র প্রস্তাব অর্থাৎ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

১৯শে জুন তারিখে জিন্না কর্তৃক লিখিত একটি পত্রের উত্তরে বড়লাট জানান যে ১৪ জন সদস্য নিয়ে যে সরকার গঠনের পরিকল্পনা হয়েছে তার সদস্য সংখ্যার আর কোন পরিবর্তন ঘটানো হবে না। এছাড়া ২২শে জুন তারিখে আজাদকে তিনি লিখলেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কোন মুসলিম সদস্যকে মনোনয়নের ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে না। দৃশ্যতই এক্ষেত্রে লর্ড ওয়াভেল জিন্নার প্রভাবে কাজ করেছিলেন। যতদূর মনে হয় মৌলানা আজাদের কাছ থেকে বড়লাট এমন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে কোন মুসলমান সদস্যকে মনোনয়ন দানের অধিকার নিয়ে কংগ্রেস বিশেষ গোলমাল করবে না।[৭] কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম লীগের অনুকূলে পরিবর্তিত হচ্ছে। এদিকে বড়লাটের সঙ্গে জিন্নার পত্রালাপের কথা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, এবং যা আশা করা গিয়েছিল, ২৫শে জুন তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করে। অবশ্য ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ব্যাপারে গণপরিষদে যোগ দিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি।

২৮শে জুন তারিখে, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের তিনদিন পরে, গান্ধী দিল্লী ত্যাগ করেন। কার্যত গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের এখানেই ইতি। যদিও জনমানসে গান্ধীর প্রভাব বরাবরের মত তখনও ছিল অপরিসীম, গান্ধীর শিষ্যরা ততদিনে সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, বিগত কয়েক বছর ধরেই রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধী ক্রমক্ষীয়মান গুরুত্ব পাচ্ছিলেন, এবং কার্যত তিনি কংগ্রেস নেতাদের উপেক্ষাই পেয়ে আসছিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ক্যাবিনেট মিশন জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানালেন যে তাঁদের ১৬ই জুনের আবেদন কংগ্রেস মানেনি, কিন্তু কংগ্রেস ১৬ই মে তারিখে প্রচারিত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদে যোগদান করতে রাজি আছে। যেহেতু মুসলিম লীগও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, অতঃপর একটা কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা চলতে পারে। দীর্ঘ সময় ভারতে থাকার পর ক্যাবিনেট মিশন ২৯শে জুন তারিখে স্বদেশ রওনা হয়ে যান।

৬ই ও ৭ই জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই-এ

৭। Pyarelal, *Gandhi: The Last Phase,* (1956) I, 234-35; Sudhir Ghosh, *Gandhi's Emissary* (1967) 165-67.

অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুমোদন করে। ইতিমধ্যে আজাদের পরিবর্তে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৈঠকের সমাপ্তি ভাষণে নেহরু বললেন যে তাঁরা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিচ্ছেন একটি মাত্রই অর্থে, এবং তা হচ্ছে গণপরিষদে যোগদান। এছাড়া তাঁরা আর কোন শর্তের দ্বারা আবদ্ধ হতে বাধ্য নন। ১০ই জুলাই তারিখে তাঁর ওই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নেহরু বলেন যে গণপরিষদে তাঁরা ক্যাবিনেট মিশন প্রদর্শিত পথেই প্রবেশ করবেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা যা করবেন সেটা একান্তই তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে ছিল যে সংখ্যালঘু, উপজাতি ও অপরাপর অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদকে ঠিক পথে চালানোর জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে, এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের জন্য বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের একটি চুক্তি হবে। নেহরু এই চুক্তির কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন, এবং সংখ্যালঘু ইত্যাদি প্রসঙ্গে বললেন যে ওটা ভারতের একান্তই ঘরোয়া ব্যাপার, এবং এই ব্যাপার নিয়ে তাঁরা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কোন বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাবেন না।৮ নেহরুর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া ভাল হয় নি, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল প্রদেশগুলি সম্পর্কে নেহরুর বক্তব্য, যেখানে তিনি শিথিল কেন্দ্র ও শক্তিমান প্রদেশসমূহের বদলে বিপরীতটা করবেন বলে দাবি করলেন। শিথিল কেন্দ্র ও শক্তিমান প্রদেশ-সমূহের সুপারিশ ক্যাবিনেট মিশন করেছিলেন এই কারণে যে এর দ্বারা যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ট সেই সকল প্রদেশের শাসনকার্যে সিংহভাগ তাদের থাকবে, আর এই কারণেই জিন্না ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন যে প্রদেশগুলিকে ক, খ এবং গ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন, এবং আশা করেছিলেন যে প্রত্যেকটি শ্রেণী তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলিকে নিয়ে জোট বাঁধবে, এবং একই ধরনের সংবিধান গ্রহণ করবে, তাতে মোটামুটি ক শ্রেণীর মধ্যে পড়েছিল হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি, খ শ্রেণীর মধ্যে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি, এবং গ শ্রেণীর মধ্যে বাংলা এবং আসাম, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। জিন্না ভেবেছিলেন যে এই শ্রেণীবিভাগ অনুসৃত হলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম লীগের একছত্র প্রাধান্য থাকবে, এবং উত্তর-পূর্বে কংগ্রেস ও লীগের একটা শক্তিসাম্য থাকবে, কিন্তু নেহরু তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তৃতায় এই ধারণার গোড়া ঘেঁসে কোপ মেরে-

৮। Menon, 280-81.

ছিলেন। প্রদেশগুলির এই রকম শ্রেণীবিভাগ তিনি মানতে অস্বীকার করেছিলেন।

নেহরু জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার নেহরুর এই বক্তৃতাকে তাঁর চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্ররোচনাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। আজাদ বলেছেন নেহরুর এই বক্তব্য এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যা ইতিহাসের গতিকে বদলে দিয়েছে।৯ নেহরুর বক্তব্যের সোজা অর্থ দাঁড়ায় এই যে কংগ্রেস ক্ষমতা পেলে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে সাবোটাজ করবে।১০ অতঃপর জিন্না বললেন যে লীগ ও কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করবে বলে। এখন কংগ্রেস সভাপতি বলছেন যে গণপরিষদে তার সংখ্যাধিক্যের জোরে কংগ্রেস ওই পরিকল্পনা বানচাল করবে যার অর্থ সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরুদের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া।১১ নেহরুর বক্তব্যের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ করার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৮ই জুলাই তারিখে ক্রিপস জানালেন যে বৃটিশ সরকার ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় অনড় থাকবে। কিন্তু জিন্না এতে টললেন না। তিনি বললেন জওহরলালের কথাই কংগ্রেসের আসল মতলব ফাঁস করে দিয়েছে।১২

২২শে জুলাই তারিখে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নেহরু ও জিন্না উভয়কেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন যাতে কংগ্রেসের সদস্য থাকবে একজন তফশিলী সহ ছয়জন, মুসলিম লীগের পাঁচজন এবং অপরাপর সংখ্যালঘুদের থেকে বড়লাট মনোনীত তিনজন।

২৭শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগের অধিবেশন বসল বোম্বাই-এ। ২৯শে জুলাই তারিখে, নেহরুর বক্তৃতার ফলশ্রুতিস্বরূপ, মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতি তার অনুমোদন প্রত্যাহার করল, এবং জিন্না তাঁর পুরাতন পাকিস্তানের দাবিতে ফিরে গেলেন। প্রস্তাবে বলা হল যে কংগ্রেস বর্ণহিন্দুরাজ কায়েম করতে চায়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তারই প্রমাণ দিচ্ছে। অতএব মুসলিম লীগের সামনে বর্ণহিন্দু আধিপত্য ও বৃটিশ দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য পাকিস্তানের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। এই কাউন্সিল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির উপর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব দিচ্ছে। বৃটিশের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের প্রতিবাদ হিসাবে মুসলমানদের

৯। Azad, 154.
১০। Morley L., *Last Days of British Raj*, 27.
১১। Azad, 155-56
১২। *ibid.*, 157-58

যাবতীয় সরকারী বর্জন করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।১৩

৩১শে জুলাই তারিখে জিন্না বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের ২৯শে জুলাই-এর গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা থেকে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আর কোন কথাই ওঠে না। এরপর লর্ড ওয়াভেল ৬ই আগস্ট তারিখে নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন, এবং অপর একটি পত্রে জিন্নাকে বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ওয়ার্ধায়। নেহরুর পূর্বোক্ত বক্তৃতার যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিকারকল্পে ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব নিলেন যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে গৃহীত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাই চূড়ান্ত, এবং ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন।১৪ অবশ্য জিন্না এতে ভোলেন নি। সে যাই হোক, ৮ই আগস্টে ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেসের যোগদান অনুমোদন করলেন এবং নেহরুকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ১২ই আগস্ট তারিখে লর্ড ওয়াভেল সরকারীভাবে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নেহরুকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর নেহরু জিন্নাকে লিখলেন যেন তিনি চোদ্দজন মন্ত্রীর মধ্যে তাঁর মনোনীত পাঁচজনকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে দেন। নেহরুর সঙ্গে জিন্নার এই আলোচনা ভেস্তে যায়। জিন্না মুসলিম লীগের বাইরের কোন মুসলমান সদস্যকে, এমন কি কংগ্রেসেরও বাইরের কোন মুসলমান সদস্যকে, মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে দিতে রাজি হন নি।

২৯শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কথা বলেছিলেন তারই অনুসরণ করে ১৬ই আগস্ট তারিখে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ধার্য করা হয়। মূল পরিকল্পনা ছিল ওই দিন ২৯শে জুলাই তারিখের মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাব বিভিন্ন সভায় ব্যাখ্যা করা হবে। জিন্না বললেন, এতাবৎকাল মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই যা কিছু কাজ করেছে। কিন্তু এখন তারা সেই পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বললেন, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার কালে দুই পক্ষ, বৃটিশ ও কংগ্রেস, হাতে পিস্তল রেখেছিল, একের পিস্তল ছিল কর্তৃত্ব ও অস্ত্রশক্তি, অপরের পিস্তল ছিল

১৩। Gwyer, II, 62.
১৪। Azad, 156.

গণআন্দোলন ও অসহযোগ। 'আজ আমরাও একটি পিস্তল তৈরী করেছি, এবং তা ব্যবহার করার অবস্থায় এসেছি।'১৫

মনে হয় না যে এই কথাগুলির দ্বারা জিন্না ব্যাপক হিন্দু হত্যায় মুসলমানদের প্ররোচিত করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতঃপর দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেসী ধরনের কোন আন্দোলনে তিনি মুসলমান সমাজকে নামাবেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম লীগ সরকার, যা হাসান শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ বুঝেছিল ব্যাপক হিন্দু হত্যা, যার ফলে ১৬ই আগস্ট তারিখে কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ওই দিন সরকারীভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মুসলিম জনতাকে হত্যালীলা ও ধ্বংস কার্যে উৎসাহিত করা হয়, কুখ্যাত গুণ্ডাদের মুক্ত করে দেওয়া হয় পুলিশকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে নারকীয় হত্যালীলা চলে তাতে অন্যূন ৬,০০০ লোক নিহত, ১৫,০০০ লোক আহত এবং ১০০,০০০ লোক গৃহহারা হয়।১৬ পরবর্তী দিনগুলিতেও এই হত্যালীলা অব্যাহত ছিল, কিন্তু তা আর একতরফা ছিল না, এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত কিছুটা শান্তি আসে।

এদিকে যখন কলকাতায় এই ব্যাপক হত্যালীলা ও ধ্বংসকার্য চলছে, তখন ১৭ই আগস্ট তারিখে বড়লাটের সঙ্গে নেহরু সাক্ষাৎ করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য। তদনুযায়ী ২৪শে আগস্ট তারিখে বড়লাট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার তালিকা ঘোষণা করলেন। যাঁদের নিয়ে তা গঠিত হল তাঁরা হচ্ছেন: জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম. আসফ আলী, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু, জন মাথাই, বলদেব সিং, সাফৎ আহমদ খাঁ, জগজীবন রাম, সৈয়দ আলি জাহির, এবং কভেসজি হরমুসজি ভাবা। বাকি দুজন মুসলিম সদস্যের নাম পরে জানানো হবে বলা হল। একই সময় লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগের কাছে একটি করুণ আবেদন করেন যে কোয়ালিশন থেকে তাদের দরজা বন্ধ হয়ে যায় নি, কিন্তু জিন্না সে কথা কানে তোলার দরকার বোধ করলেন না।

এরপরই ওয়াভেল দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় এলেন, এবং কলকাতার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে অন্যত্র না ঘটে, তার জন্য দুই সম্প্রদায়ের একটা সমঝোতা হবার প্রয়োজনীয়তার কথা তুললেন। এই সময় খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁকে

১৫। Menon 284.
১৬। Azad 159; Mosley 11, 38; Menon 296.

জানালেন যে কংগ্রেস যদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে ক্যাবিনেট মিশন প্রদেশগুলির যে শ্রেণীবিভাগ করে দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত (যে পয়েন্টে নেহরুর সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল) তাহলে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ও গণপরিষদে যোগদান করবে। ওয়াভেল তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করলেন ও ২৭শে আগস্ট তারিখে গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে দেখা করলেন। নাজিমুদ্দিনের দেওয়া টোপ ওয়াভেল গান্ধী ও নেহরুকে গেলাতে চেষ্টা করলেন।১৭ কিন্তু তাঁরা রাজি হলেন না। তবে বড়লাটের অনুরোধে নেহরু বিষয়টি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটি জানাল যে প্রদেশগুলির জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারাটির ব্যাখ্যা নিয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে সেক্ষেত্রে ফেডারেল কোর্টের রায় মেনে নিতে কংগ্রেসের আপত্তি নেই। এদিকে বৃটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেলকে নির্দেশ দিলেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণপরিষদে মুসলিম লীগের যোগদানের বিষয় নিয়ে যেন তিনি আর জল ঘোলা না করেন, এবং ঘোষিত ব্যক্তিদের নিয়ে যেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাল-বিলম্ব না করে চালু করা হয়।

তদনুযায়ী ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হল। নতুন সরকারের কার্যভার গ্রহণের মুহূর্তে অন্যতম মন্ত্রী স্যার সাফৎ আহমদ খানের উপর দৈহিক আক্রমণ হল, এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। এবার জিন্না ভীত হলেন। এতাবৎকাল বৃটিশ সরকার তুরুপের তাসটি মুসলিম লীগের হাতেই রেখেছিলেন। জিন্না ভেবেছিলেন মুখে যাই বলা হোক না কেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে না, এবং এই সুযোগে তিনি দর বাড়িয়ে চলছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কার্যভার গ্রহণের পর তিনি প্রমাদ গণলেন, এবং ১৩ই অক্টোবর তারিখে জানালেন যে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানে রাজি আছে, এবং পরদিন ১৪ই অক্টোবর তারিখে তিনি তাঁর মনোনীত সদস্যদের নাম দিলেন। এঁরা হচ্ছেন লিয়াকত আলি খান, আই. আই. চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খান, এবং তফশিলী সম্প্রদায় থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যিনি বাংলাদেশে মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। মুসলমান সদস্যকে মনোনয়নের অধিকারের যে দাবি কংগ্রেস করেছিল, তফশিলী মণ্ডলের মনোনয়নের দ্বারা জিন্না তার জবাব দিলেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রবেশ করে তাকে ভিতর থেকে সাবোটাজ করাই ছিল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য, এবং অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান

১৭। Menon 302; Mosley 42-43.

এই উদ্দেশ্যেই কাজ করছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আসা দূরে থাকুক, অবস্থার আরও অবনতি হয়েছিল। ১৬ই আগস্টের কলকাতা-গণহত্যার পিছনে জিন্নার সায় ছিল কি ছিল না সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে সেদিনের গণহত্যা মুসলিম লীগকে উৎসাহিত করেছিল, এবং পরে ওটাকেই তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগ যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় ব্যাপক হিন্দুনিধন যজ্ঞ শুরু হয়। এবারেও বাংলার লীগ সরকার দাঙ্গাবাজদের পিছনে ছিল, তা আয়ত্তে আনার কোন চেষ্টাই তারা করে নি। দাঙ্গাবাজদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য গান্ধী বহু ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন,১৮ যেখানে খোদ সরকারী স্তর থেকেই হত্যাকারীদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কি করা সম্ভব? গজনফর আলি খান এবং অন্যান্য লীগ নেতারা এই হিন্দুনিধন যজ্ঞ সমর্থন করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী পাকিস্তানের জন্য সর্বভারতীয় যুদ্ধেরই অংশ।১৯ উৎসাহের আধিক্যে এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, যে কোন ক্রিয়ারই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আছে। নোয়াখালির শোধ হিন্দুরা নিয়েছিল বিহারে, তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এটুকু স্বীকার করতে বাধ্য যে বিহারের ব্যাপারে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, যা নোয়াখালির ক্ষেত্রে করা হয় নি।

বড়লাট মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে মুসলিম লীগ তার ২৯শে জুলাই-এর সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বর্জন করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেবে, ও যথারীতি গণপরিষদে যোগদান করবে। কিন্তু জিন্না বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন এবং গণপরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখার জন্য চাপ দিলেন। কিন্তু ভারতসচিব এ বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করলেন, এবং ২০শে নভেম্বর তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই এই মর্মে চিঠি দিলেন যে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন বসবে। এদিকে জিন্না তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে অটল রইলেন, এবং গণপরিষদের মুসলিম লীগের যোগদানের বিষয়টি ঝুলে রইল। কংগ্রেস তখন পাল্টা দাবি করল যে মুসলিম লীগ হয় গণপরিষদে যোগদান করুক, না হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বর্জন করুক।

ভারতসচিব উভয় তরফের মধ্যে আরও একবার সমঝোতা ঘটানোর চেষ্টা

১৮। Bose N. K., *My Days with Gandhi,* 210 ff.
১৯। *IAR* (1946) II, 270; Menon 319.

করলেন, যার ফলে বড়লাটসহ নেহরু, বলদেব সিং, জিন্না ও লিয়াকত আলি ২রা ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনে হাজির হলেন। প্রদেশগুলি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত জোটে থাকবে, না তারা ইচ্ছামত জোটবদ্ধ হতে পারবে, ক্যাবিনেট মিশন বিজ্ঞপ্তির ১৯ নং অনুচ্ছেদের এই ব্যাখ্যাটাই ছিল সবচেয়ে গোলমেলে, মুসলিম লীগ ছিল প্রথমটির সমর্থক এবং কংগ্রেস দ্বিতীয়টির, এবং এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সরকার ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন যে বিতর্কিত ধারাগুলি ফেডারেল কোর্টে উপস্থাপিত করা চলতে পারে এবং সেখানকার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। গণপরিষদ ও সংবিধান সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল যে, যদি এমন কোন সংবিধান গণপরিষদ রচনা করে যাতে জনসাধারণের একটা বড় অংশের বক্তব্যের প্রতিফলন নেই তাহলে সেরকম সংবিধান দেশের অনিচ্ছুক অংশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।২০ এই ঘোষণাটির দ্বারা কার্যত নেহরুর সামনেই জিন্নার হাতে তুরুপের তাসটি তুলে দেওয়া হল। অতঃপর যে কোন অছিলায়, 'জনসাধারণের একটা বড় অংশের', অর্থাৎ মুসলমানদের, বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেনি, এই কথা বলে সংবিধান রচনাকার্যে ভেটো প্রয়োগের অধিকার জিন্নার হাতে এল।

পূর্ব ঘোষিত ৯ই ডিসেম্বর তারিখেই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসল যাতে মুসলিম লীগের সদস্যগণ যোগদান করেন নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং নেহরু প্রস্তাব আনলেন যে এই গণপরিষদ ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে চায়, যা স্বশাসিত ইউনিটসমূহ নিয়ে গঠিত হবে, যেখানে জনসাধারণের সকল অংশকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের গ্যারাণ্টি দেওয়া হবে, এবং সংখ্যালঘু, অনুন্নত জাতি ও অঞ্চলসমূহের পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হবে। অতঃপর ২০শে জানুয়ারী (১৯৪৭) পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়, যাতে মুসলিম লীগে গণপরিষদে যোগদান করতে পারে।

১৯৪৭-এর ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত ৬ই ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি, অর্থাৎ প্রদেশ-গুলির জোটবদ্ধতার ব্যাখ্যা নিয়ে যে সংশয় দেখা গেছে তা নিরসনের জন্য ফেডারেল কোর্টের বক্তব্য অনুসরণ করা, মূলনীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হল, যদিও তাতে বলা হল যে, প্রদেশগুলির উপর সেখানকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।২১

২০শে জানুয়ারী তারিখে যথারীতি পুনরায় গণপরিষদের বৈঠক বসল

২০। Gwyer, II, 660-61.
২১। Menon, 332-33.

এবং তা ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত ছয় দিন চলল। এই দিনগুলিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও সাবকমিটি গঠন করা হল।

৩১শে জানুয়ারী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাদের করাচী বৈঠকে গৃহীত একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে গণপরিষদের গঠন ও কার্যক্রমকে বেআইনী বলে ঘোষণা করল। কার্যত তারা শুধু ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও গণপরিষদকে বর্জনই করল না, সেই সঙ্গে তারা তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিতে ফিরে গেল।২২

৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কংগ্রেস বড়লাটের কাছে দাবি জানাল যে মুসলিম লীগের ওই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যেন তাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে চলে যেতে বলা হয়। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল এই দাবি মানতে অস্বীকার করলেন। এর ফলে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নেহরু ওই একই দাবি জানিয়ে বড়লাটকে একটি কড়া চিঠি দিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বল্লভভাই প্যাটেল ঘোষণা করলেন যে যদি বড়লাট এই দাবিতে রাজি না হন, তাহলে কংগ্রেসই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে বেরিয়ে আসবে। পরিস্থিতি অতঃপর যা দাঁড়াল, তাতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। যে কোন তরফেরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে সরে আসার অর্থই হল সেই তরফের সমর্থকদের সক্রিয় বিক্ষোভ, এবং এবারে হাঙ্গামা শুরু হলে প্রশাসন, সিভিল সার্ভিস ও সৈন্যবাহিনীকেও নিরপেক্ষ রাখা যেত না।২৩

এই দুঃসময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা নিলেন। তিনি বললেন যে, ভারতের ভাগ্য নিয়ে এরকম নাটক চালিয়ে কোন লাভ নেই। কবে ইংরাজ ভারত ত্যাগ করবে সে কথাটা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়া দরকার। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি হাউস অফ কমন্সে ভারতের বিভিন্ন পার্টিকে সমঝোতায় আনার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার উল্লেখ করে এটলী বললেন: অনিশ্চয়তার বর্তমান অবস্থা বিপদের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এবং এ অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে দেওয়া চলে না। সম্রাটের সরকার তাই স্পষ্ট জানাতে চায় যে তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ১৯৪৮-এর জুনের পূর্বেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা। এছাড়া তিনি আরও বললেন যে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা যাতে জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে হস্তান্তর করা যায় সেই

২২। Gwyer, II, 606.
২৩। Menon, 337-38.
২৪। Gwyer II, 667-69.

উদ্দেশ্যে ওয়াভেলের পরিবর্তে অ্যাডমিরাল ভাইকাউণ্ট মাউণ্ট ব্যাটেনকে বড়লাট করে পাঠানো হবে।২৪

এটলীর বক্তব্যে ওয়াভেল খুশি হন নি। তাঁর মতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই উচিত ছিল। ভারত থেকে বৃটিশের প্রত্যাবর্তনের অর্থই হচ্ছে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অশান্তির উৎস উন্মোচন করে দেওয়া। কিন্তু ওয়াভেলের যুক্তিতে এটলী কর্ণপাত করেন নি, ফলে ওয়াভেল পদত্যাগ-পত্র পেশ করলেন।২৫ বৃটিশ পার্লামেণ্টেও রক্ষণশীল দলের সদস্যরা ওয়াভেলের যুক্তির প্রতিধ্বনি করলেন।২৬ চার্চিল কপাল চাপড়ে বললেন যে বড় বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক দলের সদস্যরা জবাবে বললেন যে এছাড়া আরও একটি বিকল্প আছে, সেটা হচ্ছে গায়ের জোরে ভারতকে তাঁবে রাখা, কিন্তু তা বাস্তবে আর সম্ভবপর নয়। যত দেরি হবে ঘটনাচক্র অন্যদিকে মোড় নেবে, শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে আয়ত্তে রাখা বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এটলীর উপরিউক্ত ঘোষণার পর, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের লাইন স্থির করে ফেলল। মরীয়া হয়ে মুসলিম লীগ মুসলমান প্রধান এলাকাগুলিতে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করল। এটলীর ঘোষণায় লীগ খুশি হয় নি, তারা পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করল। আসামে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়েছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি। পাঞ্জাবে মালিক খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বাধীন হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সেখানে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো হল। হিন্দু ও শিখেরাও সেখানে নিরুত্তর রইল না। মুলতান, রাওলপিণ্ডি, অমৃতসর প্রভৃতি শহরের পথে পথে ব্যাপক হত্যালীলা চলল। এবং শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবে গভর্ণরের শাসন প্রবর্তিত হল।২৭

৮ই মার্চ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি বিশেষ প্রস্তাবে জানালো যে ব্যাপক ধ্বংসকার্য ও হত্যালীলার পরিপ্রেক্ষিতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে পাঞ্জাবকে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান দুটি প্রদেশে বিভক্ত না করা ভিন্ন উপায় নেই। এই কথা ঘোষণা করে কংগ্রেস লীগকে আহ্বান জানালো যেন অতঃপর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে যেন লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে। মুসলিম লীগ অবশ্য এই প্রস্তাবে সাড়া দিল না। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে সাংবাদিক সম্মেলনে

২৫। Azad ,177-78.
২৬। Menon 340 ff.
২৭। Khosla G. D., *Stern Reckoning*, 100.

নেহরু ইঙ্গিত দিলেন যে পাঞ্জাবী দাওয়াই বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলতে পারে।২৮

২৪শে মার্চ তারিখে মাউণ্ট ব্যাটেন বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। ৮ই মার্চ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে পাঞ্জাব বিভাগের সুপারিশ গ্রহণ করেছিল তারই সূত্র ধরে এই বাস্তববাদী ভদ্রলোক বল্লভ-ভাই প্যাটেলকে, লিওনার্ড মোজলের ভাষায় যাঁকে তিনি গোড়ায় খুব শক্ত বাদাম মনে করেছিলেন, বোঝালেন যে তাঁর শাসন পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে পাকিস্তান মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল যে তাঁদের সঙ্গে কাজ করা চলে না। এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে মেনে নেওয়া ভাল, যেটা অবিমিশ্র অমঙ্গল নাও হতে পারে। দুই ভাই-এর মধ্যে যেখানে মনের মিল নেই সেখানে প্রাত্যহিক সংঘর্ষ ও ঠোকাঠুকির মধ্যে না গিয়ে, যদি হাঁড়ি আলাদা করে বন্ধুভাবে থাকা যায়, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ১৯৪৫ সালেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিয়েছিল যে দেশের কোন অংশকে তাদের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ভারত ইউনিয়নের মধ্যে ধরে রাখা হবে না। মাউণ্ট ব্যাটেনের বক্তব্য প্যাটেলকে প্রভাবিত করল,২৯ এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নেহরু গোড়ায় পার্টিশনের বিরোধিতা করলেও, প্রথমে প্যাটেলের এবং পরে লর্ড ও লেডী মাউণ্ট ব্যাটেনের প্রভাবে মত বদলে ফেললেন। অবশ্য নেহরুর ১৯৪৬-এর জানুয়ারীতেই ভারত বিভাগের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন, যা আমরা পূর্বে দেখেছি। এ বিষয়ে নেহরুর নিজের বক্তব্য ছিল তাঁরা নিজেরা বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, পুনরপি আন্দোলন ও জেলে যাবার কথা তাঁরা ভাবতে পারছিলেন না, এবং সর্বোপরি পাঞ্জাবের হত্যালীলা তাঁদের চঞ্চল করে তুলেছিল। যে কোন মূল্যেই তাঁরা সুখের চেয়ে স্বস্তি খুঁজছিলেন।৩০

শেষ পর্যন্ত গান্ধীও ঘুরে গেলেন। আজাদকে তিনি বলেছিলেন যে একমাত্র তাঁর মৃতদেহের উপরেই ভারত ভাগ হতে পারে, তিনি জীবিত থাকতে কংগ্রেসকে ভারত ভাগে রাজি হতে দেবেন না। কিন্তু ৩১শে মার্চ তারিখে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি ভিন্ন কথা বলতে শুরু করলেন। ২রা এপ্রিল তারিখে গান্ধী একেবারে প্যাটেলের ভাষায়

২৮। Menon 347.
২৯। Mosley, 98 ff; Panjabi K. L., *The Indomitable Sardar,* 122-26
৩০। Mosley, 248.

আজাদকে জানালেন যে পার্টিশন মেনে না নেওয়া ভিন্ন উপায় কি?৩১ মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে প্যাটেল ও নেহরু, এবং তদনুসারে উপরতলার কংগ্রেস নেতারা যখন পার্টিশন চান, এবং এই মর্মে তাঁদের স্বীকারোক্তিসমূহ যখন তাঁর পকেটে আছে, এই অবস্থায় গান্ধী কি পারবেন তা রোধ করতে? এছাড়াও গান্ধী করুণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁকে জাতির জনক ও মহাত্মা বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও, কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সাবালক পুত্রদের সঙ্গে বৃদ্ধ পিতার মত, এখানে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অভিনয় করা ভিন্ন তাঁর আর কিছু করার নেই। যুক্তি দিয়ে গান্ধী ভারত বিভাগের কথা আগেও ভেবেছিলেন, আসলে এ প্রস্তাব নতুন কিছু নয়, ১৯৪২-এ তিনি নিজেই হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন যে যদি দেশের অধিকাংশ মুসলমান ভারত বিভাগ চায় তাহলে তা করা উচিত, ১৯৪৪ তিনি ভারত বিভাগের ভিত্তিতেই জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, রাজাগোপালাচারীর পাকিস্তান প্রস্তাবের পিছনে গান্ধীর আশীর্বাদ ছিল, তথাপি এ পরিস্থিতির সম্মুখীন যে একদিন হতেই হবে, মনের সঙ্গে এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিভিন্ন প্রার্থনা সভায় গান্ধী পার্টিশনের বিরুদ্ধে এরপরেও সমানে বলে যেতেন।৩২ এই নিয়ে মুসলমান নেতারা অভিযোগও তুলেছিলেন।

উপরিউক্ত কথাগুলি মনে রাখলেই বোঝা যাবে গান্ধী কেন দেশবিভাগ রোখার জন্য তাঁর চরম অস্ত্র অনশন প্রয়োগ করেন নি। তাতে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে হয়ত একটি প্রস্তাবের ঢেঁকি তোলাতে পারতেন, কিন্তু এতদিনের উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার বাস্তব পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করতে পারতেন না। মাউণ্টব্যাটেন রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে উপরতলার কংগ্রেস নেতাদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের কিছুটা অঞ্চল ছেড়ে দিলে, অবশিষ্ট ভারতকে একটি শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা যাবে, দুর্বল কেন্দ্র এরকম একটা পশ্চাৎপদ সমস্যাসংকুল দেশে চলে না,৩৩ এবং নেহরুরও তাই ছিল ধারণা যা আমরা পূর্বে দেখেছি।

জিন্না পুরোপুরিভাবে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ পাকিস্তানের জন্য দাবি করলেন, কিন্তু কংগ্রেস ওই দুটি প্রদেশের হিন্দু প্রধান অঞ্চলসমূহকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাল। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও

৩১। Azad 186-87.
৩২। Allan Campbell Johnson, *Mission with Mountbatten* (1951), 97.
৩৩। Azad, 188.

বাংলাদেশ ভাগাভাগি করা হবে এরকম লক্ষণ দেখা গেল। (শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দী অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি জানালেন।) কিন্তু তাঁদের এই দাবি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন তরফই সমর্থন করল না।

২রা মে তারিখে মাউণ্টব্যাটেন একটি পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডন রওনা হলেন, এবং কিছুটা সংশোধিত আকারে সেই পরিকল্পনা বৃটিশ ক্যাবিনেটকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে ১০ই মে তারিখে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল যে একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, এবং অতঃপর প্রদেশগুলি ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যোগদান করবে। (কিন্তু নেহরু এই পরিকল্পনার দারুণ বিরোধিতা করলেন, এই যুক্তিতে যে, এই পরিকল্পনা গৃহীত হলে ভারতবর্ষ বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।)

দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাব মাউণ্টব্যাটেনকে দিলেন তাঁর সেক্রেটারিয়েটের পদস্থ কর্মচারী ভি. পি. মেনন। এই পরিকল্পনাটি তিনি ওয়াভেলের আমলে তৈরী করেছিলেন এবং স্যার এরিক মেভিলের মারফৎ তা ভারত-সচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা চাপা পড়েই ছিল। এই পরি-কল্পনার মূল বক্তব্য ছিল হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে ভারত ইউনিয়ন এবং মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হোক, পাঞ্জাব ও বাংলা-দেশকে ভাগাভাগি করে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানকে দেওয়া হোক। মেনন এই প্রস্তাব মাউণ্টব্যাটেনের কাছে পেশ করে বললেন যে যতদূর মনে হয় এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগ উভয় তরফই রাজি হবে। মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাবটি নিয়ে কংগ্রেসের নেহরু এবং প্যাটেল, মুসলিম লীগের জিন্না ও লিয়াকত, এবং শিখেদের বলদেব সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন, এবং মেননের প্রত্যাশা অনুযায়ী, সকল তরফই এতে রাজি হল। এই পরিকল্পনাটি নতুনভাবে তৈরী করতে মেননের সময় লেগেছিল তিন ঘণ্টা, এবং বৃটিশ ক্যাবিনেট দিয়ে তা অনুমোদন করাতে মাউণ্টব্যাটেনের সময় লেগেছিল দশ মিনিট।

১৮ই মে তারিখে মাউণ্টব্যাটেন ওই পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডন গেলেন। বৃটিশ ক্যাবিনেট সেটি গ্রহণ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন। তাতে বলা হল যে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান ও মুসলমান অঞ্চলগুলির আইনসভার সদস্যরা পৃথকভাবে বসে ভোটের দ্বারা স্থির করবেন তাঁরা পার্টিশনে রাজি আছেন কিনা। উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই চূড়ান্ত নিয়ামক হবে। সিন্ধুর আইনসভা একটি বিশেষ অধিবেশনে স্থির করবে তার সংবিধান চলতি সংস্থার দ্বারা গঠিত হবে, অথবা নূতন সংস্থা গঠন করা হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তানের ক্ষেত্রে ওই

একই বিষয় নির্ধারিত হবে গণভোট মারফৎ। আসাম হিন্দু প্রধান হলেও, মুসলমান প্রধান শিলেট জেলায় গণভোট হবে, তা আসামে থাকবে না পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গে যাবে এই নিয়ে।৩৪

(৩১শে মে তারিখে মাউণ্টব্যাটেন ভারতে ফিরে এসেই গৃহীত পরিকল্পনাটি নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা এই প্রস্তাব মেনে নেবার পরই, তদ্দণ্ডেই সেই সংবাদ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ৩রা জুন তারিখে হাউস অফ কমন্সে প্রধানমন্ত্রী এটলী পরিকল্পনাটির কথা ঘোষণা করলেন। ওই দিনই মাউণ্টব্যাটেন একটি বেতার ভাষণে বৃটিশ ক্যাবিনেটের বিজ্ঞপ্তির পুরো বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

৩রা জুন তারিখে মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বিশেষ বৈঠকে তা অনুমোদিত হল। যখন গান্ধী তা সমর্থন করলেন খান আবদুল গফর খান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।) সীমান্ত প্রদেশে, মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও, একটি কংগ্রেস সরকার চালু ছিল। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা মেনে নেবার পর কার্যত খান ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের অনুগামী খুদাই খিদমৎগারদের মুসলিম লীগের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হোল, তাঁদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে দেওয়া হল। এতদিনের কংগ্রেস সমর্থনের এই পরিণাম দেখে তাঁর কণ্ঠে হতাশার সুর বেজে উঠল। তাঁর অভিযোগ, ভাগাভাগির প্রস্তাবে রাজি হবার আগে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনটুকুও কংগ্রেস অনুভব করেনি।৩৫ এই মনোভাবের মধ্যে আবেগগত সত্যতা থাকলেও, একটি বিষয়কে খান আবদুল গফর খান এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল যে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা পাকিস্তানে থাকবে কি হিন্দুস্থানে যাবে সেটা গণভোটের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। খান ভ্রাতৃদ্বয় ও খুদাই খিদমৎগারদের যদি সেই রকম জোরই থাকত তাহলে গণভোটের দ্বারা তাঁদের ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে কোন বাধাই ছিল না। সীমান্ত প্রদেশে তাঁদের অবশ্যই যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কিন্তু খান আবদুল গফর খান এটুকু বোঝার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন যে, যদি ভোটদানের বিষয়টা ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদানের প্রসঙ্গ নিয়ে হয়, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীরা, তাদের খান ভ্রাতৃদ্বয় এবং কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেবে। এক্ষেত্রে তারা আগে মুসলমান পরে অন্য কিছু। অবশ্য যদি

৩৪। Menon, 510-15; Gwyer II, 670-75.
৩৫। Azad, 198.

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাখতুনিস্তান রাজ্যের দাবি করা হয় তাহলে তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট না দিয়ে পাখতুনিস্তানের পক্ষেই দেবে। এই প্রস্তাব নিয়ে ডঃ খান সাহেব মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এবং কংগ্রেসও বিষয়টি সমর্থন করেছিল। মাউণ্টব্যাটন বলেছিলেন তাঁদের আগের পরিকল্পনা এই রকমই ছিল যে প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, এবং ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া, অথবা পৃথক থাকা, প্রদেশগুলির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করবে, কিন্তু কংগ্রেস এতে আপত্তি করেছিল এই আশংকায় যে এর ফলে ভারতবর্ষ বহুধা বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে যাবে। এখন একটি প্রদেশকে এই সুযোগ কিভাবে দেওয়া যায়? জিন্না অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের মধ্যেই সীমান্ত প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, কিন্তু তাঁর কথায় বিশ্বাস রাখা নানা কারণেই খান ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁরা এবং তাঁদের অনুগামী খুদাই খিদমৎগাররা গণভোট বর্জন করেছিলেন। গণভোটে অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিরই সমর্থন মিলেছিল।

৪ঠা জুন তারিখে মাউণ্টব্যাটেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮-এর জুনের পরিবর্তে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। ওই দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর গান্ধী তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন যে, দেশ ভাগাভাগির জন্য বৃটিশ সরকার দায়ী নয়, বড়লাটের এ বিষয়ে কোন হাত নেই, বস্তুত তিনিও মনেপ্রাণে পার্টিশনের বিরোধী, কিন্তু যদি উভয় তরফ, হিন্দু ও মুসলমান, ঐক্যবদ্ধ না থাকতে চায়, তাহলে তিনি আর কি করতে পারেন?৩৬

১০ই জুন তারিখে মুসলিম লীগের কাউন্সিল মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এখানে বলা হল যে যদিও পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তা হলেও লীগ প্রদেশদ্বয়ের ভাগাভাগি মেনে নিচ্ছে। তাদের গৃহীত প্রস্তাবে ক্ষমতা হস্তান্তর কার্যকর করার ব্যাপারে যথাকর্তব্য নির্ণয়ের সমস্ত ক্ষমতা জিন্নার হাতে অর্পণ করা হল।৩৭

১২ই জুন তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করল এবং তার ভিত্তিতে ১৪ই ও ১৫ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল। খসড়া প্রস্তাবটিতে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা পুরোদস্তুর গ্রহণ করার কথা ছিল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে গোবিন্দবল্লভ পন্থ বললেন যে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ না করার অর্থই হচ্ছে

৩৬। Campbell Johnson, 110.
৩৭। Menon, 383.

আত্মহত্যা করা। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারসহ ভারত ইউনিয়ন গঠন করতে গেলে অনিচ্ছুক অংশকে বাদ দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। প্রস্তাবটি সমর্থন করে আজাদ বললেন এছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। তিনি বললেন যে তাঁর স্থির বিশ্বাস পাকিস্তান টি'কবে না, কাজেই বিযুক্ত অংশ আবার জোড়া লাগবে। সমর্থন করে আরও বক্তৃতা দিলেন গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল ও কৃপালনী। প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন কয়েকজন। সিন্ধু প্রদেশের কংগ্রেস নেতা চৈতরাম গিদোয়ানী বললেন যে শক্তিশালী কেন্দ্রের চেয়ে ভারতের অখন্ডতা ও ঐক্য অনেক বেশি মূল্যবান। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা মেনে নেবার অর্থই হচ্ছে হিংসা এবং পশুশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ। পুরুষোত্তমদাস টণ্ডন বললেন, প্রস্তাবটি গ্রহণের অর্থ হচ্ছে বৃটিশ ও মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আশা আকাঙ্ক্ষার চেয়ে কোটি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার দাম অনেক বেশি। দেশ বিভাগ কোন সম্প্রদায়েরই মঙ্গল করবে না। পাকিস্তানে হিন্দু ও ভারতে মুসলমানরা ভয়ের মধ্যে কাল কাটাবে। এই একই কথা বললেন মৌলানা হাফিজুর রহমান। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডঃ কিচলু এই প্রস্তাবকে সাম্প্রদায়িকতার নিকট জাতীয়তাবাদের আত্মসমর্পণ বলে উল্লেখ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রস্তাবটি গৃহীত হল, পক্ষে পড়ল ১৫৭টি ভোট, বিপক্ষে ২৯টি, ৩২ জন সদস্য নিরপেক্ষ ছিলেন।৩৮

অন্যান্য দলগুলির মধ্যে হিন্দুমহাসভা ছাড়া আর সকলেই দেশ ভাগাভাগি সমর্থন করেছিল হিন্দুমহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে অখন্ড ভারতের কথা ঘোষণা করে, এবং তার জন্য সংগ্রামের সংকল্প নেয়। ওই অধিবেশনে একটি 'পাকিস্তান বিরোধী দিবস' পালনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।৩৯

৪ঠা জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট হাউস অফ কমনসে গৃহীত হয়, হাউস অফ লর্ডসে তা গৃহীত হয় ১৫ই জুলাই, এবং তা রাজকীয় সম্মতিলাভ করে ১৮ই জুলাই। এই আইনে ১৫ই আগস্ট থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের ভাগাভাগির সূত্র নির্ধারণের জন্য এবং তা কার্যকর করার জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে দুজন কংগ্রেস এবং দুজন লীগ সদস্য নিয়ে একটি বাউণ্ডারী কমিশন গঠিত হয়। চলতি কেন্দ্রীয় আইনসভা ও কাউন্সিল অফ স্টেট বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারত ও

৩৮। *IAR* (1947), I, 122-33; II, 133, 137; Menon, 386.
৩৯। Menon, 382.

পাকিস্তানের গণপরিষদই উভয় রাষ্ট্রে আপাতত কেন্দ্রীয় আইনসভার কাজ চালাবে একথা ঘোষণা করা হয়। ১৪ই জুলাই তারিখে পূর্বেকার গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বসে। এতে যে সকল প্রদেশ পাকিস্তানে পড়েনি সেই সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ সদস্যরা জিন্নার নির্দেশে যোগদান করে এবং ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে।

ঘটনাচক্রের ভীড়, দ্রুত ক্ষমতালাভের তাড়াহুড়োর মধ্যে একটি বিষয় একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল তা হচ্ছে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের কথা। এই ভাগ্যহতদের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাই হয় নি। উভয় রাষ্ট্রে এদের রক্ষার জন্য কোন চুক্তিও হয় নি। নেতারা মোটামুটি ধরে নিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের হিন্দুরা এবং ভারতের মুসলমানরা একে অপরের স্বার্থের জন্য জামিন হিসাবে থাকবে। লিওনার্ড মোজলের হিসাব অনুযায়ী স্বাধীনতার মূল্য দিতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মোট ৬00,000 লোক মারা গিয়েছিল, ১৪,000,000 লোক গৃহহারা হয়েছিল, ১00,000 ধর্ষিতা বা ধর্মান্তরিতা হয়েছিল, এদের মধ্যে অনেককে নীলামে বিক্রয় করা হয়েছিল।৪০ কংগ্রেস ও লীগ দেশ ভাগাভাগিতে রাজি হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলায় ব্যাপক সংখ্যালঘু উৎসাদন শুরু হয়। উভয় স্থানেই কৃষিজমির মালিকানা যথাক্রমে শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। ওদের সরাতে পারলে এগুলি দখল করা যাবে এই আশায় সংখ্যালঘু হত্যা ও বিতাড়ন শুরু হয়েছিল, পাকিস্তানের হবু শাসকেরা এতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে বিষয়টি একতরফা থাকে নি, পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যেমন শিখ ও হিন্দুদের উৎখাত করা হয়েছে পূর্ব পাঞ্জাব থেকেও তেমনই মুসলমানদের উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিষয়টি একতরফা হয়েছিল, তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে হয় নি। এর কারণটা ছিল এই যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান হত্যা করে কোন বৈষয়িক সুবিধার সম্ভাবনা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই ছিল দরিদ্র ও নিঃসম্বল। পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর প্রতিহিংসা হিসাবে কিছু ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা নীতি হিসাবে দাঁড়াতে পারে নি, উত্তেজনার উত্তাপ কমে যেতেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অধিকাংশেরই কিছু না থাকলেও দু'এক বিঘা করে জমি ছিল, এবং হিন্দুদের ওখান থেকে সরাতে পারলে ওটাই ছিল নীট লাভ, কাজেই হিন্দু উৎসাদন ওখান-

৪০। Mosley, 244-46.

কার স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি যুক্তির ভিত্তি পেয়েছিল, যার ফলে স্বাধীনতার পরেও বার বার দফায় দফায় হিন্দু উৎখাত করা হয়েছে, এবং তা সরকারী অনুমোদন পেয়েছে, দুঃখের সঙ্গে এ কথাটা স্বীকার না করে উপায় নেই।

৭ই আগস্ট জিন্না করাচীতে উপস্থিত হলেন, এবং পাকিস্তানের গণ-পরিষদ ১১ই আগস্ট তারিখে তাঁকে তার সভাপতি নির্বাচিত করল। গণপরিষদ তাঁকে কায়েদ-এ-আজম বা মহান নেতা আখ্যা দিল। ১৩ই আগস্ট তারিখে মাউণ্টব্যাটেন করাচী গেলেন এবং পরদিন তিনি সেখানকার গণপরিষদে ভাষণ দিলেন। ১৫ই আগস্ট তারিখে জিন্না পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন লিয়াকত আলি খান।

১৪ই আগস্ট রাত্রে দিল্লীতে গণপরিষদের অধিবেশন বসল, এবং এই গণপরিষদ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করল। অতঃপর নেহরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে তাঁর সরকারী ভবন থেকে নিয়ে এলেন। ১৫ই আগস্ট প্রত্যূষে মাউণ্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন, এবং তারপর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করালেন। অতঃপর গভর্ণর-জেনারেল গণপরিষদে পুনরায় উপস্থিত হলেন, সেখানে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া অভিনন্দন বার্তা পড়ে শোনালেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছে প্রেরিত রাজকীয় অভিনন্দন পাঠ করলেন।

নির্দেশিকা